আনোয়ারা

নজিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন

আনোয়ারা

পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

ওসমানিয়া বুক ডিপো

১৬/১৮, বাবু বাজার, ঢাকা-১

প্রকাশক :
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ওসমানিয়া বুক ডিপো,
১৬।১৮, বাবুবাজার, ঢাকা-১

মুদ্রাকর :
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
কাল্‌চারাল্ প্রেস,
৬৮, বেচারাম দেউড়ি, ঢাকা-১

ত্রিংশ মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৭৭

দাম : ৬.৫০

ANWARA
by Mohammed Najibar Rahman
30th Edition, Price 6.50

নিবেদন

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, অত্র পুস্তকখানির সম্পূর্ণ কপিরাইট এবং যাবতীয় স্বত্ব অতি উচ্চ মূল্যে ইংরাজি ১৯৪৪ সালের ২০শে মে তারিখ এককিত্তা রেজিস্ট্রীকৃত সাফ-কাবলা দলিল দ্বারা অথরের ওয়ারিশানগণ—মোহাম্মদ হায়দার রহমান মিয়া, মোহাম্মদ হবিবর রহমান মিয়া, আমেনা খাতুন, শিরিতন্নেছা, মমতাজ মহল ও খোন্দকার মৌলভী বশির উদ্দিন আহমদ গং ওয়ারিশানদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাহাদের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া স্বীয় ব্যয়ভূষণে ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে আমার বিনা অনুমতিতে যদি কেহ এই পুস্তক ছাপেন বা ছাপান তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি দায়ী হইবেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য—এই পুস্তকে কতকগুলি শব্দার্থ পৃষ্ঠার শেষে লাইন টানিয়া নোট করা ছিল ; তাহাতে পুস্তক পাঠে পাঠকের অসুবিধা হইত। তাই এবার আমি সেই শব্দগুলি অনাবশ্যক ভাবিয়া তুলিয়া দিলাম। আশা করি, ইহাতে পাঠকের পুস্তক পাঠের সুবিধা হইবে।

নূতন সংস্করণ প্রসঙ্গে

ইতিপূর্ব্বে আনোয়ারা ক্রাউন ষোল পৃষ্ঠা আকারে ছাপা হইত। বর্তমান সংস্করণ ডিমাই ষোল পৃষ্ঠা আকারে ছাপা হইল। ইহাতে পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠকবৃন্দ তাহাদের প্রিয় গ্রন্থ আনোয়ারার এই শোভন সংস্করণকে সাদরে গ্রহণ করিলে আমাদের শ্রম স্বার্থক বলিয়া মনে করিব।

পূর্ব্ব সংস্করণে মুদ্রণ-বিভ্রাট হেতু মূল পুস্তেকর সহিত কিছুটা গরমিল দেখা দিয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি পাঠকবর্গ ইহাতে খুশী হইবেন।

বিনীত—

মোহাম্মদ নুরুল ইসল

কৃতজ্ঞতা

সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ—উপনিষদ গ্রন্থাবলী, রাঘব-বিজয় কাব্য, ত্রিদিব-বিজয় কাব্য, প্রশ্ন, বঙ্গদর্পণ, শান্তিশতক, পরবশতক ও মানব-সমাজ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম.এ বি. এল মহাশয় ; শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট সিনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মোজাহেদ আলী বি. এ (আলিগড়) সাহেব ; বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের উজ্জল রত্ন, ভাষা বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম এম. এ. ও বি. এল পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং আরবী পারসী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত জনাব মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ; বাঙ্গালা গদ্যে মুসলমান সুলেখক জনাব মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেব ও "জাতীয় মঙ্গলের" কবি জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ;—তাঁহাদের স্ব স্ব অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যেরূপ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই পুস্তক পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম। রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী জুনিয়ার মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ আনোয়ারার মুদ্রণ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

নিবেদক—

১৯১৪ ইং। ১৮ই মে। মোহাম্মদ নজিবর রহমান

"সতীর সর্বস্ব পতি, সতী শুধু পতিময়,
বিধাতার প্রেমরাজ্যে সতত সতীর জয়।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাদ্রমাসের ভোরবেলা। স্বর্গের ঊষা মর্ত্যে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে; তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগন হেমাভ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের নিম্ন সমতল গ্রামগুলি সোনার জলে ভাসিতেছে; কর্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে; ছোট বড় মহাজনী নৌকাগুলি ধবল-পাখা বিস্তার করিয়া গন্তব্য পথে ঊষা যাত্রা করিয়াছে; পাখীকুল সুমধুর স্বরলহরী তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গল গানে তান ধরিয়াছে; ধর্মশীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মস্‌জিদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, হিন্দু-পল্লীর শঙ্খ-ঘণ্টার রোল থামিয়া গিয়াছে।

এই সময় মধুপুর গ্রামের একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের খিড়কী-দ্বারে বসিয়া বন্যার জলে ওজু করিতেছিল। তাহার মুখ, হস্তদ্বয়ের অর্দ্ধ ও পদদ্বয়ের গুল্‌ফমাত্র অনাবৃত এবং সমস্ত দেহ কাল ইঞ্চিপেড়ে ধুতি কাপড়ে আবৃত। গায়ে লালফুলের কাল ডোরাছিটের কোর্তা। দুই হাতে ছয় গাছি চুড়ি। অযত্ন বিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি আলুগাভাবে খোপা বাঁধা; বালিকার মুখমণ্ডল বিষাদে-ভরা!

বালিকা যে স্থানে বসিয়া ওজু করিতেছিল, তাহার সম্মুখ দিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা অনতিবিস্তৃত খাল, দক্ষিণমুখে ঢালু, বারি-রাশি দুকূল প্লাবিত করিয়া স্রোত-বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পুর্বপারে একখানি পান্‌সী নৌকা পাট ক্রয়ের নিমিত্ত উত্তর-দক্ষিণ মুখে লাগান রহিয়াছে। একজন যুবক সেই নৌকার ছৈ-মধ্যে বসিয়া স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে কোরান শরীফ পাঠ করিতেছেন। নৌকায় তিনজন মাঝি, একজন যাচনদার, একটি পাচক ও যুবক স্বয়ং ছিলেন। যুবকের আদেশে যাচনদার মাঝিগণ সহ পাটের সন্ধানে ভোরেই পাড়ার উপর নামিয়া পড়িয়াছে।

যুবক নৌকায় বসিয়া কোরান পাঠ করিতেছেন। যুবকের দেহের বর্ণ ও গঠন সুন্দর; নবোদ্ভিন্ন ঘনকৃষ্ণ-গুম্ফ-শ্মশ্রু তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যুবকের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর। মাথায় রুমীটুপী, গায়ে সাদাশার্ট ও পরিধানে রেঙ্গুনের লুঙ্গী। এই সাধারণ পরিচ্ছদেও তাহাকে কোন আমিরের বংশধর বলিয়া মনে হইতেছে।

বালিকা ওজু করিতেছে; কিন্তু সদ্য-ঘটনা-পরম্পরার যুগপৎ ঘাত-প্রতিঘাতে

তরঙ্গায়িত হৃদয়ের ভাব যেন তাহার মুখে ক্রীড়া করিতেছে। আবার এই অবস্থায়ও গাঢ় অন্ধকারময় রজনীতে নিবিড় জলদ-জাল-মধ্যবর্ত্তী ক্ষণপ্রভা বিকাশবৎ আশার একটি ক্ষীণোজ্জলরেখা বালিকাকে যেন কোন্ এক সুধাময় শান্তি-রাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

বালিকা নৌকার উপর কোরান শরীফ পাঠ শুনিয়া মস্তকোত্তোলন করিল। সে মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কোরাণের মত উত্তম জিনিস আর কিছুই নাই, উহা যে পড়ে বা শুনে তাহার জন্য বেহেস্তের দ্বার উন্মুক্ত। বালিকার দাদিমাও সদা সর্ব্দা বলেন, কোরাণ শরীফ-রূপ শরাবন তহুরা পাঠে ও শ্রবণে মানুষের অন্তর্নিহিত অশান্তি-আগুন নিভিয়া যায়। বালিকা জননী ও দাদিমার উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতিদিন প্রাতে কোরাণ শরীফ পাঠ করে; আজও তজ্জন্য ওজু করিতে বসিয়াছে। কিন্তু নৌকার মধুবর্ষী স্বরে কোরাণ পাঠ বালিকাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। সে ওজু ভুলিয়া গিয়া অনন্যচিত্তে কোরাণ শরীফ পাঠ শুনিতে লাগিল।

যুবক কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া দুইহাত তুলিয়া নিমীলিত-নেত্রে মোনাজাত করিতে লাগিলেন—

"দয়াময়! তোমার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। তুমি ধৈর্য্য ও ক্ষমার আধার, তুমি অসীম করুণার উৎস। তুমি কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও ত্রাতা। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই তোমার দয়ায় মায়ের বুকে তাহার আহারের বন্দোবস্ত হইতেছে। করুণাময়! অগাধ সাগরের তলে, কঠিন পাথরের মধ্যে থাকিয়াও অতি ক্ষুদ্রকীট-সকল তোমার কৃপায় আহার পাইয়া সানন্দে বিহার করিতেছে। তাই বলিতেছি, হে প্রভো! তোমা অপেক্ষা আর বড় কে? তোমার চেয়ে আর দয়ালু কে? বিভো! তুমি যে কি তাহা তুমিই জান, তোমাকে জানে বা বুঝে, তোমার অনন্ত বিশ্বে এমন কে আছে? তা নাথ! তুমি যত বড়—যেমনটি হওনা কেন, আমাকে তুমি অবহেলা করিতে পার না, আমি তোমার আঠার হাজার আলমের শ্রেষ্ঠতম জীবমধ্যে একজন। আমার গ্রাসাচ্ছাদন তোমাকে যোগাইতে হইবে। আমার আকাঙ্খার বিষয়ও তোমাকে শুনিতে হইবে।

"দীননাথ। দীনের প্রার্থনা, আমাদের ভব-সমুদ্রের কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যিনি তোমারই একত্বের পূর্ণপ্রচারক এবং তাঁহার বংশধর মহাপুরুষেরা সমস্ত

মানবজাতির জ্ঞানবর্ত্তিকা। অতএব, সর্বাগ্রে তাহাদের পবিত্র আত্মার উপরে তোমার শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হউক। সমস্ত মুসলমান নর-নারীর সুখ-শান্তির নিমিত্ত তোমার বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। তোমার দাসগণ ঈমান-ধন হারাইয়া দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে যাইতেছে, তুমি দয়া করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে গুণবান কর। ভ্রাতৃভাবে প্রীতির পবিত্র সূত্রে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে মতি দাও, স্বর্গীয় শোভায় মর্ত্য উদ্ভাসিত হউক।

"অনাথনাথ! কৈশোরে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি, এই যৌবনে পিতৃশোকে সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। প্রভো! তুমি সকলই জান, দাস অকৃতদার, যদি গোলামকে সংসারী কর, তবে যেন প্রেমের পথে তোমাকে লাভ করিতে পারি। আমিন।"

যুবক বহির্জগৎ ভুলিয়া একাগ্রমনে মোনাজাত করিতেছিলেন। তন্ময়চিত্ততায় তাহার পবিত্র হৃদয়োদ্ভূত ভক্তিবারি নয়নপ্রান্তে বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল।

বালিকা কোরাণ শরীফ, মেফ্‌তাহুলজান্নাত, রাহেনাজাত, পান্দেনামা গোলেস্তাঁ প্রভৃতি আরবী, পারসী ও উর্দ্দু কেতাব তাহার দাদিমার নিকট শিক্ষা করিতেছিল। মোনাজাত আরবী মিশ্রিত উর্দ্দুতে উচ্চারিত হইতেছিল, সুতরাং সে তাহার অর্থ অনেকাংশে বুঝিতে পারিতেছিল। বুঝিয়া শুনিয়া বালিকার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অসহ্য মনোবেদনা ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "আহা আজ কি শুনিলাম। এমন খোশ্‌এল্‌হানে কোরাণ শরীফ পাঠ ত' কখনও শুনি নাই, এমন মধুর উচ্চারণও ত' কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। কি মধুমাখা মোনাজাত। এমন সুন্দর মোনাজাত ত' কখনও শুনি নাই। বুঝি বা কোন ফেরেস্তা মানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মধুপুরে আসিয়াছেন, নচেৎ এমন বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত কি মানবমুখে উচ্চারিত হইতে পারে? মোনাজাতে যেন হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন, "দাস অকৃতদার, যদি গোলামকে সংসারী কর, তবে যেন প্রেমের পথে তোমাকে লাভ করিতে পারি।"—যুবকের মোনাজাতের এই শেষ কথা কয়টি বালিকার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সহসা অলক্ষিতে তাহার গোলাপ-গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, স্বেদ-বারিবিন্দু মুখমণ্ডলে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পাঠক, সোনার গাছে মুক্তাফল বুঝি এইরূপেই ফলে। বালিকা এক্ষণি সেই দূর ভবিষ্যৎ আশার আলোকে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে ইনিই কি—তিনি?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক মোনাজাত অন্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া সযত্নে যুজদানে কোরাণ শরীফ বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিতে নৌকার ভিতরের দিকে আরো সরিয়া গেলেন। বালিকার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল না। আত্মহারা বালিকাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। এই সময় বালিকার পশ্চাদ্দিক হইতে—"সই তুমি এখানে?" বলিয়া আর একটি বালিকা প্রথমা বালিকার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আগন্তুক বালিকার বয়স প্রথমা বালিকা অপেক্ষা দুই বৎসরের বেশী হইবে। পরিধানে সাদা সেমিজের উপর নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে সোনার বালা করাঙ্গুলিতে প্রেমের নিদর্শন স্বর্ণাঙ্গুরী, সুতরাং অলঙ্কার পরিচ্ছদের তুলনায় প্রথমাটিকে দ্বিতীয়াটির সহিত তুলনা সম্ভবেনা কিন্তু দেহের বর্ণ ও গঠন বদল করিলে কাহারও ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সখিত্ব-সম্বন্ধে উভয়ের মনের বিনিময় পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। 'সই' শব্দ শুনিয়া যুবক নৌকার ভিতর থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র জানালার ছিদ্রপথ দিয়া একটু তাকাইলেন। দেখিলেন, দুইটি জীবন্ত-কুসুম পশ্চিম পাড়ে খিড়কীর দ্বার আলো করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমটি বিকাশোন্মুখ গোলাপ, দ্বিতীয়টি পূর্ণবিকশিত শতদলস্বরূপ। 'সই' শব্দে প্রথমা বালিকার সুখের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বকথিত যাতনার চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে দ্বিতীয়া বালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। দ্বিতীয়া বালিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময় দুঃখে কহিল, "সই, তোমার মুখের চেহারা এরূপ হইয়াছে কেন? এমন ত' কখনও দেখি নাই? রাত্রে কি ঘুমাও নাই?" প্রথমা বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "গত রাত্রে মা আবার অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে, তাই জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে; সই, আর বরদাস্ত হয় না।" বলিতে বলিতে কথিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দ্বি-বা। কেন গালি দিয়াছিল?

প্র-বা। মগরেবের বাদ হজরতের জীবনচরিত পড়িতেছিলাম, তাই রান্নাঘরে যাইয়া ভাত খাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া বালিকা বুদ্ধিমতী ও চতুরা। শিক্ষিত স্বামীসহবাসে, সংসারের অনেক

বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। সে একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "সই, তোমার মা ত' দিনরাতই তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাতে তোমাকে কেবল কাঁদিতে দেখি, কিন্তু তোমার চোখ-মুখের এমন অবস্থা ত' কখনও দেখি নাই। অবশ্যই তোমার মনের কোন বিশেষ ভাবান্তর ঘটিয়াছে? প্রথমা বালিকার বিষাদপূর্ণ মুখে একটু বিজলীর আভা স্ফুরিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না। দ্বিতীয়া বালিকা নৌকার দিকে চাহিয়া কহিল, "ওপারে একখানি সুন্দর ছৈ ঘেরা পান্‌সী নৌকা দেখিতেছি, কোথা হইতে আসিয়াছে?" প্রথমা বালিকা সরল মনে কহিল, "জানি না, কিন্তু ঐ নৌকার ভিতরে কে যেন কোরাণ শরীফ পড়িতেছিলেন, এমন সুমধুর রবে কোরাণ শরীফ পড়া আর কখনও শুনি নাই। এতক্ষণ তাই শুনিতেছিলাম।" দ্বিতীয়া বালিকা পুনরায় নৌকার দিকে চাহিয়া কহিল, "কৈ সই, নৌকায় ত কাহারও সাড়া শব্দ নাই।" প্রথমা বালিকাও নৌকার দিকে চাহিল নৌকা নীরব। যুবক এই সময় পাটের জমাখরচ মিলাইতেছিলেন, তিনি বালিকাদ্বয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

দ্বিতীয়া বালিকা কহিল, "যাক, কাল বিকালে তোমরা যখন স্কুল হইতে চলিয়া আস, তারপর ডাক পিয়ন বাবজানকে একখানি মনিঅর্ডার দিয়া যায়। সেই সঙ্গে আমিও কলিকাতার আর একখানি চিঠি পাই। চিঠি লইয়া আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া পড়িতেছিলাম। একটু পরে বাবজান বাড়ীর মধ্যে আসিয়া মাকে বলিলেন, "এই ধর, ১৮টি টাকা, আলাহিদা করিয়া রাখিয়া দাও। ইহা আনোয়ারার বৃত্তির টাকা। এই টাকা আর তাহার পিতার হাতে দিব না। সে কাপড়ে-চোপড়ে, পুঁথি পুস্তকে মেয়েটিকে যে কষ্ট দেয়, আমি মনে করিয়াছি এই টাকা দিয়া তাহর সে কষ্ট দূর করিব। মা কহিলেন, "ও সব কষ্ট ত' কিছুই না। মেয়েটাকে তার মায়ে দিনরাত যে ভাবে খাটায় আর তিরস্কার করে, তা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। সৎ-মা অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এমন অসৎ সৎ-মা বুঝি ত্রিভুবনে আর নাই। আবার মেয়েটির মত ভাল মেয়েও দেখা যায় না।"

প্র-বা। সই, ওসব কথা থাক্, চল বাড়ীর ভিতরে যাই, বড় মাথা ধরিয়াছে।

দ্বি-বা। সই তোমার এক ভয়ানক খবর আছে; তা এখানেই নির্জ্জনে বলি। বাবাজান আর মা, কাল বিকালে তোমার সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন— সবই বলিতেছি।

প্র-বা। (উদ্বিগ্নচিত্তে) কি খবর সই ?

দ্বি-বা। "মা বলিলেন অত বড় সেয়ানা মেয়ে, তথাপি সে তার সৎমার অত্যাচার নীরবে সহিয়া তারই আদেশ উপদেশ মত চলে, চুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে না, ভুলিয়াও সৎমার নিন্দা করে না ; বরং কেহ নিন্দাবাদ করিলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। ধন্নি মেয়ে।"

প্র-বা। সই, আসল কথা কি তাই বল ?

দ্বি-বা। আমি দুই কানে যা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

এই বলিয়া দ্বিতীয়া বালিকা আবার বলিতে লাগিল, "বাবজান কহিলেন, মেয়েটি দেখিতে যেমন সুন্দর, তার স্বভাবটিও তেমনিই মনোহর, আবার পড়াশুনায় আরোও উত্তম। আনোয়ারার স্মরণশক্তি অসাধারণ ; স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোলপাঠ ভারতের ইতিহাস আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। চারুপাঠ, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্যপাঠ প্রভৃতি সাহিত্য পুস্তক সুন্দররূপে বুঝাইয়া লিখিতে পারে, হাতের লেখা চমৎকার। জামা-সেলাই—নীলাম্বরী কাপড়ে ফুলতোলা দেখিয়া সেদিন ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাহাকে যে ১০ টাকা পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন তাহা ত' বোধ হয় জান ? মেয়ে পড়ার বই ছাড়া, ২০।২৫ খানি স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক— আমি যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, তাহা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। মেয়ের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। ইহার মধ্যে আবার আমাকে হজরত ওমরের জীবন চরিত আনিতে টাকা দিয়াছে। আনোয়ারার কোরাণ পাঠ শুনিলে আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না।'

"মা কহিলেন, 'তা যেন হইল মেয়ে যে বড় হইয়া গেল তাহার কি হইবে ? তাহার বাপ ত' এ বিষয়ে লক্ষ্যই করিতেছে না।' শেষে মা বাবাজানকে, তোমার সয়ার মত নিগুর্ণ কদাকার একটা বরের হাতে তোমাকে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই বলিয়া সে একটু মুচকিয়া হাসিল, তারপর কহিল, 'বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'যেমন মেয়ে তেমন উপযুক্ত পাত্র না হইলে সবই বিফল হইবে। বাবাজান শুনিয়া বিশেষ দুঃখের সহিত বলিলেন, 'বিফল হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে।' তখন মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'সেকি। বাবাজান কহিলেন, 'তিন হাজার টাকার কাবিন, পনর শত টাকার গহনা এবং পনর শত টাকা নগদ লইয়া জাফর বিশ্বাসের নাতির সহিত ভূঞা সাহেব মেয়ে বিবাহ দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—শুনিলাম। মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন' 'তুমি বল কি ?

জাফর বিশ্বাস ডাকাত ছিল, শেষবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। ভূঞা সাহেব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া রূপে মজিয়া জাফর চোরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়াই কি আনোয়ারার মত বেহেস্তের হুরকে তাহাদেরই ঘরে বিবাহ দিবেন ? আমার হামিদা আনোয়ারার সহিত 'সই' বন্ধন করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভাব, তাহাতে এ সম্বন্ধ যাবজ্জীবন অচ্ছেদ্য। আনোয়ারার বিবাহ চোরের ঘরে হইলে, হামিদা যে সরমে মরিয়া যাইবে, আমরা যে কোথাও মুখ পাইব না ? বিশেষতঃ আনোয়ারা সেয়ানা মেয়ে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝিয়া উঠিয়াছে, সে শুনিলে যে কি ভাবিবে বলিতেই পারি না।

"বাবজান কহিলেন, 'যার মেয়ে সে যদি বিবাহ দেয়, আমরা কি করিব ?" মা কহিলেন, 'এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সেজন্য তোমরা দশজনে মিলিয়া শক্ত করিয়া বাধা দাও।' বাবজান কহিলেন, 'আজিমুল্লা (জাফর বিশ্বাসের পুত্র) এই বিবাহের জন্য আবুল কাশেম তালুকদার, নুরউদ্দিন মুন্সি, মীর ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি প্রধানদিগকে একশত টাকা করিয়া ঘুষ দিয়াছে, সুতরাং এ বিবাহ আর নিবারণ করা চলিবে না। এখন খোদাতায়ালার ইচ্ছা, আর মেয়ের কপাল।' এই বলিয়া বাবজান বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন ; মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হামি' তোর সইয়ের বিবাহের কথা শুনিয়াছিস ? আমি ত' গোপনে তাহাদের কথাবার্তা সবই শুনিয়াছি, তবু মার মুখের দিকে তাকাইলাম। আমি কাল বিকালেই তোমাকে বলিতে আসিতাম, কিন্তু কলিকাতার পত্রের উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, আর ভাবিলাম, এ সংবাদ শুনিলে রাত্রে তোমার ঘুম হইবে না, তাই আসি নাই ; কিন্তু তোমার মুখের চেহারায় বুঝিতেছি যে এ সংবাদ তোমার কানে আগেই গিয়াছে।"

আনোয়ারা কহিল, "না সই তোমার মুখে এই প্রথম শুনিলাম।" হামিদা আনোয়ারার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল—তাহার রুক্ষ মুখ অধিকতর রুক্ষ হইয়াছে। ডাগর চক্ষু দুইটি নীহার-সিক্ত ফুটন্ত জবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে হামিদার কথার আর কোন উত্তর করিল না, কেবল মৃদুস্বরে কহিল, "সই বড় মাথা ধরিয়াছে, চল—বাড়ীর ভিতরে যাই" এই বলিয়া আনোয়ারা উঠিয়া দাঁড়াইল, হামিদাও তাহার সঙ্গে অন্দরমুখী হইল।

এই সময়ে নৌকা হইতে প্রয়োজনবশতঃ অবতরণকালে যুবক পেটকাটা ছৈ মধ্যে দাঁড়াইয়া কাশিয়া উঠিল। হামিদা ফিরিয়া তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল এবং

ব্যাকুলভাবে ঘোম্‌টা টানিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আনোয়ারাও ফিরিয়া চাহিল, চারি চক্ষের মিলন হইল। কিন্তু কল্পিত স্বপ্নদৃষ্ট হৃদয়ের সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিলে লোকে যেমন আশ্চর্যবোধে চমকিয়া উঠে, যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র বালিকা সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল। যুবকও কি যেন ভাবিয়া হর্ষ-বিষাদ পরিমিশ্রিত প্রশান্ত-সৌম্য-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বালিকার আয়ত আঁখি লজ্জায় মুকুলিত হইল। পরন্তু সে ভাবিল ইনিই বুঝি নৌকার ভিতর মধুকণ্ঠে কোরাণ শরীফ পাঠ ও মোনাজাত করিয়াছেন। ঝঞ্ঝাবাত সমুত্থানে তটিনীর বক্ষ যেরূপ প্রবল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে সুখ দুঃখের সংমিশ্রিত ভাবাবেগে তাহার সুকোমল ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তখন সেইরূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তাহার মাথার বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিল। সে ধীরপদে অন্দরে প্রবেশ করিল। কেবল অস্ফুটস্বরে কহিল, "তবে ইনিই কি তিনি? মা তোমার কথা যেন সত্য হয়, আমি একমাস নফল রোজা রাখিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে হামিদা বরাবর তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ভোলার মার খোঁজ করিত। ভোলার মা প্রৌঢ়া বিধবা; ভোলা তাহার যুবক পুত্র। মা নিজে পুঁজিপাটা সর্ব্বস্ব বেচিয়া বাছিয়া বাছিয়া ভোলাকে এক সুন্দরী বউ আনিয়া দিয়াছে। বউ ২।৩ বছরে যুবতী হইয়া উঠিলে, ভোলা সেই মনোমোহিনীর সৎ-পরামর্শে গৃহস্থালীর ব্যয় লাঘবের জন্য মাতাকে গৃহতাড়িত করিয়া দিয়াছে। ভোলার মা এক্ষণে হামিদাদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম করিয়া খায়। ভোলার মা একান্ত সরলা বুদ্ধিশুদ্ধি মন্দ নয়, দোষের মধ্যে কানে একটু কম শুনে। সে হামিদাকে খুব ভালবাসে এবং দশ কাজ ফেলিয়া তাহার হুকুম তামিল করে। হামিদা খুঁজিয়া ভোলার মাকে তাহাদের কূপের নিকট পাইল এবং অপরে না শুনে এমন ভাবে কহিল, "ভোলার মা, আমার সইদিগের খিড়কীর ঘাটে সোজা পূর্ব্বপারে একখানি পান্‌সী নৌকা লাগান আছে, সেই নৌকায় ঠিক তোমাদের দুলামিঞার মত কে যেন দাঁড়াইয়া আছেন—দেখিয়া আসিলাম; তুমি গোপনে যাইয়া তত্ত্ব জানিয়া আইস, তিনিই কিনা?

ভোলার মা আদেশ পালনে রওয়ানা হইল।

এদিকে হামিদা তাহার পাঠাগারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—কাল কলিকাতা হইতে দু'বেলা তাহার দু'খানি চিঠি পাইলাম, আজ তিনি এখানে তাহাও কি হয়? বোধহয় তাঁহার মত অন্য কোন লোককে দেখিয়াছি। আবার ভাবিল,—তিনি এবার কলিকাতা যাইবার সময় বলিয়াছেন, যে সকল বিবাহিতা যুবতী আদরে সোহাগে অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে থাকে, তাহারা স্বাধীন-প্রকৃতি হইয়া বে-পর্দায় চলাফেরা করে। দেখিও, তুমি যেন সেরূপ না হও; কারণ আমি কলিকাতা গেলেই তুমি মধুপুরে পার হইবে।' আমি তখন চোখ রাঙ্গাইয়া গর্ব্বভরে বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমাকে কি মনে কর? আমি আর মধুপুরে যাইব না, এখানেও থাকিব না, কলিকাতায় যাইব।' তিনি দমিয়া গিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, 'না, না; তুমি মধুপুরে যাইও, না যাইলে আম্মাজান ভাত-পানি ছাড়িবেন। আমি আর তোমাকে এমন কথা বলিব না।"

আমার প্রেমগর্ব তখনি পানি হইল। বোধহয় তিনি আমার প্রেমাভিমানের সত্যতা পরীক্ষার নিমিত্ত চালাকি করিয়া কলিকাতা হইতে চিঠি লিখিয়া তৎপূর্বে এইখানে আসিয়াছেন। পরীক্ষা তো এইরূপ পাইলেন, আমি অনাবৃত মস্তকে লোকচক্ষুর দর্শনীয় স্থানে বসিয়া সইয়ের সহিত গল্প করিতেছি, তিনি নৌকার ভিতর চুপ করিয়া থাকিয়া আমার বেপর্দাভাব স্বচক্ষে দেখিলেন। এখন উপায়? তাঁহার কাছে মুখ দেখাইব কিরূপে? যদি এই দোষে তিনি আমাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করেন, তবে কি করিব?

হামিদা আবার ভাবিল,—তিনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন,—এই বলিয়া ট্রাঙ্কহইতে বৈকালের প্রাপ্ত চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, "সুখ-শান্তির আধার প্রাণের হামি", এইটুকু পড়িতেই তাহার চোখের জল টস্ টস করিয়া চিঠিতে পড়িতে লাগিল। সে অতি কষ্টে অঞ্চলে চোখ মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিল, "আমাদের ল-ক্লাস বন্ধ হইতে আর তিন সপ্তাহ বাকী, কিন্তু এই তিন সপ্তাহ তিন বৎসর বলিয়া মনে হইতেছে। ছুটির দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তোমাকে দেখিবার আকাঙ্খা ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।" এ পর্য্যন্ত পড়িয়া আর পড়িতে পারিল না। প্রেমাশ্রু অনিবার্য-বেগে তাহার বক্ষবসন সিক্ত করিতে লাগিল। হামিদা পত্রহস্তে বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বৃষ্টির পর আকাশ যেমন লঘু ও পরিস্কার হয়, ক্রন্দনেও সেইরূপ দুঃখ লাঘব হয়। তাহা না হইলে সংসার চলিত না। হামিদার দুঃখের তাপ কমিয়া আসিলে সে পুনরায় গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল,—যিনি তাঁহার দাসীকে এত ভালবাসেন তাহার মনে কি দাসীর প্রতি সন্দেহ হইতে পারে? কখনই নয়। চেহারার মত চেহারা কি নাই? আমি তাহার মূর্তিতে নিশ্চয়ই অন্য লোককে দেখিয়াছি। এইরূপ বিতর্ক করিয়া হামিদা কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইল এবং আগ্রহের সহিত ভোলার মার প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

ভোলার মা একখানি ডিঙ্গি নৌকায় খাল পার হইয়া দুলা-মিয়াকে দেখিবার জন্য পান্‌সী নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিল, নৌকার সম্মুখভাগে একহারা আধাবয়সী লোক চা'র পানি গরম করিবার নিমিত্ত উনুন ধরাইতেছে। এইটি যুবকের পাচক। বাঘ-মহিষের যুদ্ধের ন্যায় উনুন মধ্যে ভাদুরে খড়ি ও আগুন পরস্পর যুদ্ধ বাধাইয়া তীব্র ধুমপুঞ্জে পাচকবরকে ত্যক্ত-বিরক্ত ও অন্ধীভূত

করিয়া তুলিতেছিল। এই সময় ভোলার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?" পাচক ক্রোধভরে কহিল, "কেন? আমরা বেলগাঁও হইতে আসিয়াছি।" ভোলার মা শুনিল, 'আমরা বেল্‌তা হইতে আসিয়াছি।' বেল্‌তা হামিদার শ্বশুর-বাড়ী। পাচকের ক্রোধের প্রতি ভোলার মার ভ্রূক্ষেপও নাই। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "নায়ে চড়নদার কে?" পাচক বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভোলার মা নাছোড়বান্দা হওয়ায় সে ষোল আনা ক্রোধ জাগাইয়া এবার কহিল "তোমাদের দুলা মিঞা আছে।" পাচক ভাবিল—মাগীকে শক্ত গালি দিয়াছি। মাগী ভাবিল—চড়নদার দুলা মিঞা বটে!

এই সময় দুলা-মিঞা নৌকার ভিতর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িতভাবে "রোমিও জুলিয়ট" হাতে করিয়া বালিকাদ্বয়ের কথোপকথনের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন বিবাহিতার মুখে অবিবাহিতার গুণের পরিচয় পাইলাম, পরন্তু স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহাতে এতকাল ধরিয়া যেমনটির জন্য প্রাণ লালায়িত হইয়া আছে, এইটি সর্বাংশে তদুপযুক্তই বটে, কিন্তু হায়! তাহার বিবাহের যে প্রস্তাব শুনিলাম তাহাতে বাসনা-সিদ্ধির আশা কোথায়? হায়, হায়, এমন রত্নও নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে?

এদিকে ভোলার মা ফিরিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে হামিদাকে কহিল, "নৌকায় চড়নদার বেল্‌তার দুলা-মিঞা। তাহাকে বাড়ীর উপর আনিতে মা-জানকে খবর দেইগে।" ভোলার মা হামিদার মাকে মা-জান বলিয়া ডাকিত। হামিদা কহিল, "তাঁহার আসার সংবাদ কাহাকেও বলিও না, নিজ কাজে যাও।" ভোলার মা মলিন মুখে কূপের ধারে চলিয়া গেল। হামিদা ঘরের দরজা ঠেলিয়া দিয়া, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এক প্রহর বেলা অতীত হইল। হামিদার মা হামিদাকে উঠানে চলাফেরা করিতে না দেখিয়া এবং এত বেলায়ও বালিকা স্নানাহার করিতেছে না বলিয়া, তিনি তাহার পড়ার ঘরে খোঁজ করিলেন। দেখিলেন, বালিকা নিতান্ত মলিন মুখে চৌকিতে শুইয়া আছে। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মা, অসুখ করিয়াছে কি?" হামিদা আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া সলজ্জে কহিল, "না" মা কহিলেন, "তবে অসময় শুইয়া আছ কেন? বেলা হইয়া গেল, গোসল করিয়া খাইতে আইস।" হামিদা কহিল, "যাও আসি।" মা চলিয়া গেলে, হামিদা পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তথাপি হামিদা ঘর

হইতে বাহির হইল না ; মা মেয়েকে না দেখিয়া পুনরায় ডাকিতে আসিলেন, এবার বালিকা বলিল, "আমার ক্ষিদে পায় নাই। এখন খাইবনা, তুমি খাওগে। মার মুখ ভার হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'মেয়ে কাল উপর্যুপরি কলিকাতার দুইখানি চিঠি পাইয়াছে, বুঝি বা জামাতার কোন অমঙ্গল-সংবাদ আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলেও মেয়ে কিছু বলিবে না। যত কথা তার সই-এর নিকট ব্যক্ত করে আজ প্রাতেও সেখানে অনেকক্ষণ ছিল, আচ্ছা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।' এই ভাবিয়া তিনি আনোয়ারাদিগের আঙ্গিনায় গেলেন।

এদিকে আনোয়ারা শিরঃপিড়ায় কাতর হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি সে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছে—ইনিই কি তিনি? চেহারা ঠিক সেইরূপ; কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ এরূপ ছিল না। তাঁহাকে মূল্যবান আচ্‌কান পায়জামা পরিহিত দেখিয়াছি মনে হইতেছে, সুতরাং ইনি তিনি নন।' আবার ভাবিল, ইঁহাকে যেন সই-এর স্বামী বলিয়া মনে হইল, তাঁহার চেহারা ঠিক এইরূপ।' পর মুহূর্তে মনে হইল, 'তিনি ত' এমন সুন্দর কোরান শরীফ পড়িতেন না! বিশেষতঃ সই কাল কলিকাতা হইতে তাহার চিঠি পাইয়াছে, আজ তিনি এখানে আসিবেন কিরূপে? সুতরাং ইনি সই-এর স্বামীও হইতে পারেন না। তবে ইনি কে?'—এইরূপ নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে বালিকার কোমল হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল; ধমনীর রক্ত উধ্বগামী হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিল, চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শরীর গরম হইয়া জ্বর আসিল। জ্বরোত্তাপে বালিকা ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হামিদার মা তথায় আসিলেন। তিনি আনোয়ারার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "ইস্! গা যে আগুনের মত গরম হইয়াছে, হঠাৎ এরূপ জ্বর হওয়ার কারণ কি?" মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়ের চোখ যে জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, সমস্ত রক্ত যেন একযোগে মাথায় উঠিয়া গিয়াছে।"

আনোয়ারার দাদিমা কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "কি জানি মা, কিসে যে কি হইল কে বলিবে? বৌয়ের দিনরাত কথার খোঁচায় বাছার আমার কলেজা ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে ভাত খাইতে দেরী হওয়ায়, বৌ মেয়েকে অকারণে যেরূপ ঘেন্না দিয়া কথা বলিয়াছে, তাহা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়। গালাগালির ঘেন্নায় বাছা আমার উপোসে রাত কাটাইয়াছে, মনের কষ্টে

শেষ রাতে বাছা 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মা, দুঃখের কথা কত বলিব, রূপসী বৌ ঘরে আনিয়া খোরশেদ আমার সব খোয়াইতে বসিয়াছে।"

আনোয়ারার পিতার নাম খোরশেদ আলী ভূঞা। ইনি দ্বিতীয়বার জামতাড়া গ্রামের জাফর বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আনোয়ারার দাদিমা হামিদার মাকে কহিলেন, "মা! পাট, ধান, কলাই যে খন্দের যা বাড়ীতে আসে তাহার আধাআধি জামতাড়া যায়। তাহাছাড়া বৌ কত জিনিস চুরি করিয়া বিক্রি করে, তাহার সীমা নাই। ভাল কাপড়-চোপড় ঘটি-বাটি পর্য্যন্ত বৌ চুপে চুপে বাপের বাড়ী পার করিয়াছে। সেদিন খোরশেদ বেরামপুর হইতে বৌ-এর ফরমাইস মত বাদশার জন্য ছাতি, জুতা, কোট আনিয়াছে। (বাদশা বৌ-এর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র) সেই সঙ্গে এই ছুঁড়িটার জন্যও একটা কোর্তা আনিয়াছিল। বৌ কোর্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা কার জন্য? প্রশ্ন শুনিয়াই খোরশেদের মুখ শুকাইয়া গেল। শেষে বাধ্য হইয়া কহিল, 'মেয়েটাকে কিছু দেওয়া হয় না, এটা তাহারই জন্য আনিয়াছি।' মা, লজ্জার কথা, বৌ খোরশেদকে যে কতরকম খারাপভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল, তা বলা যায় না। মেয়েটা শুনিয়া তখনই কোর্তা বৌ এর ঘরে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। ইহাতে খোরশেদ টু" শব্দটি করিল না। কয়েকদিন পরে জানা গেল কোর্তা জামতাড়ায় আজিমুল্লার মেয়ে তছিরনের গায়ে উঠিয়াছে। মা, আমি দু'কথা বুঝাইয়া বলিলে, খোরশেদ শুনিয়াও শুনে না। বৌ যা বলে অপরাধী লোকের ন্যায় সে তাহাই করে। আমার সোনার চাঁদ খোরশেদ নেকাহ করিয়া যে এমন বৌ-বশ হইবে তা আমি মনেও করি নাই। আমার মালুম হয় বৌ ছেলেকে যাদু করিয়াছে।" এই সময় আনোয়ারা চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদি, মাথা গেল—পানি—ইনিই কি তিনি?" হামিদার মা পানি দিলেন।

হামিদার মা কহিলেন, "আমিও আনোয়ারার বাপের মতিগতি দেখিয়া বাড়ীতে বলিয়াছিলাম, 'বাদশার মা ভূঞা সাহেবকে যাদু করিয়াছে।' হামিদার বাপ এ কথা শুনিয়া কহিলেন, 'ওসব কিছু না; রূপজমোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে মানুষের মতিগতি এইরূপই হয়।' এখন বাদশার মা ভূঞা সাহেবকে দুপোর রাত্রে পচা পুকুরে ডুব দিতে বলিলেও সে আপত্তি করিবে না। কিন্তু এর শেষ ফল বড়ই ভয়ানক; তখন চৈতন্য হইলেও নিস্তার নাই।" এই সময়

আনোয়ারা পুনরায় চীৎকার করিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল এবং অস্ফুটে কহিল, 'আমার ওস্তাদের কথা।" দাদিমা মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "বুবুরে কি বকিতেছিস্? আনোয়ারা পুনরায়—"দাদি—মাথা—তিনি—উঃ—ফাটিয়া গেল" একটু পরে আবার—"মোনাজাত—কোরান—কি সুন্দর—ইনিই—কি—তিনি।" হামিদার মা কহিলেন, "মেয়ে জরের প্রকোপে পুস্তকের কথা আওড়াইতেছে; আপনারা সত্বর ডাক্তার দেখান।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বাড়ীতে আসিলেন। যাহা জানিতে বা বলিতে গিয়াছিলেন, আনোয়ারার অবস্থা দেখিয়া তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এদিকে হামিদা তাহার পাঠাগারের দ্বারে উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছিল, তাঁর আসার সংবাদ মার নিকট বলিতে ভোলার মাকে নিষেধ করিয়া ভাল করি নাই। তিনি আসিলে পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতাম।' আবার ভাবিল, আর কিছুক্ষণ দেখি যদি তিনি সেচ্ছায় না আসেন, তবে তখন বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করিব। এই সময় তাহার মা আসিয়া তথায় দাঁড়াইলেন; আনোয়ারার জর বিকারের কথা মেয়েকে জানাইলেন না। স্নানাহারের জন্য তাহাকে রান্নাঘরের আঙ্গিনার দিকে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মধুপুর প্রাচীন গ্রাম। বাঁশ, আম, তেঁতুল, গাব, বট, দেবদারু প্রভৃতি সমুচ্চ বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ। গ্রামখানি নিম্ন সমতল। আষাঢ়ে পানি আসে, —আশ্বিনে শুকায়। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে প্রচুর পাট জন্মে। গ্রামের অধিবাসী সকলেই মুসলমান। মধুপুর হইতে তিন গ্রাম উত্তরে জামতাড়া; এ-গ্রামের অধিবাসী বার আনা হিন্দু। বেলতা গ্রাম মধুপুর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে একটি অনতি-প্রশস্ত স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের ৩।৪টি ভদ্রবংশীয় উচ্চশিক্ষিত মুসলমান গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন। বেলগাঁও প্রসিদ্ধ বন্দর; মধুপুর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্রোতস্বতী নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। পাট ও অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় ২।৩টি জুট কোম্পানী এখানে ব্যবসায়ের অনুরোধে বড় বড় গুদাম ও কলকারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

পূর্বকথিত খোরশেদ আলী ভূঞা সাহেব মধুপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। পৈত্রিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, ভূ-সম্পত্তিও মন্দ ছিল না, এখনও মধ্যবিত্ত অবস্থা। দেড়শত বিঘা জমি, সাতখানা হাল, নয়জন চাকর, এক পাল গরু। কেবল পাট বিক্রয় করিয়া বৎসরে ৭।৮ শত টাকা পান। বাড়ীর ঘর করগেটেড টিনের। ভূঞা সাহেবের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। বর্ণ গৌর, আকৃতি দোহারা, মুখের চেহারা নিতান্ত মন্দ নয়। কৃপণ স্বভাব ও অর্থগৃধ্নু। পিতা-মাতার প্রথম ও আদরের ছেলে ছিলেন বলিয়া অর্ধশিক্ষিত। তাঁহার বর্তমান অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নহেন, আর্থিক উন্নতি বিধানে সর্বদা চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত। ভূঞা সাহেব নিজ গ্রাম হইতে ৭ ক্রোশ দূরে রসুলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করেন। বহু পুণ্যফলে তিনি ফাতেমা জোহরার ন্যায় ধৈর্য্যশীলা রূপবতী পত্নী লাভ করেন। ইঁহার গর্ভে ভূঞা সাহেবের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদ্বয় অকালে কাল-কবলে পতিত হয়; কন্যা জীবিত আছে। কন্যার ১২ বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোকগমন করেন; কিন্তু ভূঞা সাহেবের ধর্মশীলা বুদ্ধিমতি জননী এই ১২ বৎসরের কন্যাকে যেভাবে গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

কথিত আছে জাফর বিশ্বাস ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। শেষ জীবনে পুলিশের চেষ্টায় ধরা পড়িয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৮ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত থাকে। পুত্রের নাম আজিমুল্লা। সুখের বিষয় যে, পিতার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া অনেকাংশে সে আত্মসংযমপূর্বক সংসার করিতেছে। কন্যার নাম গোলাপজান। গোলাপজান ভুবনমোহিনী সুন্দরী ; ছোটলোকের ঘরে ঈদৃশী সুন্দরী মেয়ের জন্মলাভ খুব কম দেখা যায়।

জামতাড়া হইতে ৫ মাইল পূর্বে বসন্তবিশুষ্ক বর্ষ প্লাবিত একটি নদীর পশ্চিম তটে আদমদীঘি গ্রামে কাসেম শেখের পুত্র মেহের আলীর সহিত ১০।১১ বৎসর বয়সের সময় এ হেন রূপসী গোলাপজানের বিবাহ হয়। কিন্তু জানি না কেন বিবাহের পর হইতে সে স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তাহার শ্বশুর ও স্বামী এজন্য তাহাকে বিধিমত শাসনাদি করিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাহার পলায়ন-অভ্যাস দূর হয় না। একবার শ্রাবণের নিশিতে ভরা নদী সাঁতরাইয়া সে বাপের বাড়ী পলাইয়া আসে। সকলে মেয়ের সাহস দেখিয়া অবাক! মেহের আলী অনন্যোপায়ে তালাক দিল। গোলাপজান প্রসিদ্ধ সুন্দরী ; সুতরাং এদ্দতকাল অতীতের পূর্বেই নিজ গ্রামের নবীবক্সের সহিত তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। নির্দিষ্ট দিনের শেষে নবীবক্স গোলাপজানের পাণিগ্রহণ করিল। নবীবক্সের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। আজিমুল্লা ও তাহার মায়ের শাসনে গোলাপজান এবার শ্বশুরালয় হইতে আর পলাইল না, কিন্তু এ সংসারে আসিয়া তাহার একটি গুণের বিকাশ পাইতে লাগিল।

নবীবক্স গোলাপজানের রূপের মোহে তাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতে লাগিল। সংসারে বৃদ্ধা শাশুড়ী মাত্র বর্ত্তমান, সুতরাং আদর-সোহাগে গোলাপজান সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া উঠিল। সে এক্ষণে এক একটি করিয়া গোপনে গোপনে নবীবক্সের শ্রমার্জিত ঘটী-বাটী কাপড়-চোপড় ধান চা'ল তেল-তামাক পর্যন্ত অনেক দ্রব্যই ভ্রাতা আজিমুল্লার বাটীতে প্রেরণ করিতে লাগিল। আজিমুল্লা তাহাতে আন্তরিক খুশী ছিল। কিছুদিন পর গোলাপজান এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। প্রিয়তমা প্রেয়সীর গর্ভে পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া নবীবক্স গোলাপজানকে মাথায় তুলিল, এবং বাছিয়া বাছিয়া পুত্রের নাম রাখিল—বাদশা। সুখে-সন্তোষে এইরূপে চারি-পাঁচ বৎসর কাটিল ; কিন্তু দিন কাহারও একভাবে যায়

না, নবীবক্স কার্তিক মাসের কলেরায় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল। তিন দিন পর তাহার বৃদ্ধা মাতাও পুত্রের পথানুসরণ করিল। গোলাপজান এখন সংসারে একাকিনী। শিশু পুত্র লইয়া কেমন করিয়া সংসারে থাকিবে? সুতরাং ভ্রাতা আজিমউল্লা তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেল এবং দুই এক করিয়া নবীবক্সের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নিজ সংসারে মিশাইয়া নিজ গৃহস্থালী বড় করিয়া তুলিল। শিশু বাদশা মাতৃসহ মাতুলালয়ে মহাদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে আনোয়ারার বার বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতা পরলোকগমন করেন। খোরশেদ আলী ভুঞা সাহেব বিপত্নীক হইয়া দারান্তর গ্রহণের অভিলাষী হন। জামতাড়া গ্রামের আজিমুল্লা সম্প্রতি অবস্থাপন্ন লোক। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া কিছু শিক্ষিতও হইয়াছিল। অবস্থা ভাল হইলে এবং তৎসঙ্গে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে নানা দিক দিয়া লোকের খেয়াল উচ্চ হয়। আজিমুল্লা নিচ বংশের সন্তান হইলেও কৌলিক মর্য্যাদা লাভের আশা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে। সে ভুঞা সাহেবকে বিপত্নীক দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত বিধবা ভগ্নী গোলাপজানের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিল। ভূঞা সাহেব ডাকের সুন্দরী গোলাপজানকে পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে সাধা বিবাহের প্রস্তাবে উল্লসিত হইলেন; কিন্তু কুলের দোহাই দিয়া কহিলেন, "নজরানা না পাইয়া কি করিয়া কার্য হয়? আজিমুল্লা তিনশত টাকা সেলামী দিতে স্বীকার করিল।

এই বিবাহে ভুঞা সাহেবের মাতা "নাম যাইবে, জাতি যাইবে, কুলে কলঙ্ক রটিবে" বলিয়া অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। ভূঞা সাহেব গোলাপজানের রূপের মোহে মাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গ্রামের পাঁচজনকে দিয়া মাতাকে বুঝাইলেন, অবশেষে বিবাহ হইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে প্রাণাধিক পুত্র বাদশাকে সঙ্গে করিয়া গোলাপজান তৃতীয় স্বামী ভূঞা সাহেবের ভবনে পদার্পণ করিল। বাদশা এখানে আসিয়া রামনগর মাইনর স্কুলে পড়িতে লাগিল। বাদশাকে বাদশাযাদার মতই সুন্দর দেখাইত! ভূঞা সাহেব আনন্দে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

গোলাপজানের রূপে কি যেন এক মাদকতাশক্তি ছিল। ভূঞা সাহেব কিছুদিন মধ্যেই সেই রূপে কায়মনপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। আনোয়ারার মা বাঁচিয়া থাকিতে ভূঞা সাহেবের মা সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাহার

আদেশ উপদেশানুসারে আনোয়ারার মা সংসারের সমুদয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন ; শাশুড়ীকে মায়ের অধিক ভক্তি করিতেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁহার স্নানাহারের তত্ত্ব লইতেন। আনোয়ারা তখন হামিদাদিগের আঙ্গিনায় তাহার সহিত বালিকা-স্কুলে পড়িত। ৪টি চাকরাণী বাহিরের কাজ-কর্ম নিরুত্তরে সম্পন্ন করিত। স্বামী-সোহাগ-গর্বিণী গোলাপজান অল্প দিনেই এ বন্দোবস্ত উল্টাইয়া নিজ হস্তে সংসারের ভার লইল। এরূপ করিবার তাহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; প্রথম উদ্দেশ্য সংসারের ভার নিজ হাতে থাকিলে ইচ্ছামত জিনিসপত্র মা-ভাইয়ের বাড়ী পাঠান যাইবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আরও মারাত্মক!

বিধবা হইবার পর ভ্রাতার বাড়ী অবস্থানকালে গোলাপজান যখন সীমন্তিনী-সোহাগ তৈলে সুগন্ধীকৃত তাহার দীর্ঘ কেশপাশ বিচিত্ররূপে খোঁপা বাঁধিয়া কুন্দদন্ত মঞ্জন রচিত করিয়া আয়ত অাঁখি শোভিত করিয়া প্রতিবাসিগণের বাটীতে ভ্রমণে বহির্গত হইত তখন অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহার ভুবন-ভুলান রূপ দেখিয়া অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া থাকিত। কোন কোন মুখরা সরলা মুখ ফুটিয়া বলিত—"বাদশার মায়ের যেমন রূপ এমন আর কোথাও দেখি না।" বাদশার মা তখন মনে করিত তার মত সুন্দরী আর বুঝি নাই।' কিন্তু যখন সে তৃতীয় স্বামী ভূঞা সাহেবের বাটীতে পদার্পণ করিয়া বার বৎসরের মেয়ে আনোয়ারাকে দর্শন করিল তখন তাহার রূপের গর্ব্ব একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক বালারুণ-রাগরঞ্জিত বিকাশোন্মুখ পদ্মিনীর সহিত যেমন কীটগর্ভ শ্লথদল-দলিত জবার তুলনা সম্ভবে না, সেইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সরলা বালা আনোয়ারার সহিত যৌবনোত্তীর্ণা বিকৃতসুন্দরী গোলাপজানের উপমাই হয় না। কিন্তু না হইলেও গোলাপজান নিজ রূপের সহিত সতীন-কন্যার রূপের তুলনা করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। স্বামী সোহাগে সে এক্ষণে গৃহের কর্ত্রী; সুতরাং সে নানা প্রকারে তাহার এই বিজাতীয় বিদ্বেষবিষে আনোয়ারাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সে প্রথমে আনোয়ারার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিল এবং নানা ছলনায় অশ্রাব্য অকথ্য কটুক্তির সহিত তাহাকে দাসীগণের কার্য্যে সহায়তা করিতে বাধ্য করিল। বালিকা ভয়ে ভয়ে বিমাতার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল, ইহাতে তাহার নিয়মিত রূপে স্কুলে পড়া আর চলিল না। আনোয়ারার দাদীমা বিদুষী রমণী ছিলেন। নাতিনীর পড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। পরন্তু তিনি মেয়েকে দাসীর কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি গোলাপজানকে কহিলেন, "বৌ, তুমি সংসারের কর্ত্রী হইয়াছ, তাহাতে আমি খুসী হইয়াছি ; কিন্তু তোমার একি ব্যবহার ? মেয়ে আজন্ম নিজ হাতে যাহা কখনও করে নাই, আমরা দাসীর দ্বারা যে সকল কাজ করাইয়া থাকি তুমি কোন্ আক্কেলে সেই সব কাজ আমার সোহাগের নাতনী দ্বারা করাইতেছ ! তোমার জুলুমে নাতনীর আমার পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক ইহার পর তুমি আমার নাতনীকে যে-সে সাংসারিক কাজে কখনও ফরমাইস করিতে পারিবেনা। আমি কাল হইতে তাহাকে পড়িতে পাঠাইব।" বৃদ্ধার কথায় গোলাপজানের হৃদয়ে হিংসানল অনিবার্য বেগে জ্বলিয়া উঠিল ; সে বাড়ীময় তোলপাড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে নানাবিধ অকথ্য বাক্যে পঞ্চমুখে দাদী-নাতনী উভয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আহারান্তে ভূঞা সাহেব তাঁহার দক্ষিণদ্বারী শয়ন-গৃহে খাটে বসিয়া পৈত্রিক রৌপ্য-ফরসীতে চিন্তিতমনে তামাক সেবন করিতে করিতে স্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ, আজ সকালে তুমি যে কেলেঙ্কারী করিয়াছ, তাহাতে আমার কোন স্থানে মুখ দেখাইবার উপায় নাই।" গোলাপজান শুনিবামাত্র ক্রোধ-কটাক্ষে গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিল, "কি করিয়াছি ?" ভূঞা সাহেব যতটুকু বিরক্ত হইয়া কথাটি পাড়িয়াছিলেন, গোলাপজানের ক্রোধ-কটাক্ষ দর্শনে ততটুকু থামিয়া গেলেন। একটু সুর নরম করিয়া কহিলেন, "মা ও মেয়েকে বাপান্ত করিয়া গালা-গালি করিয়াছ কেন ?" গোলাপজান গর্বভরে নিঃসঙ্কোচে কহিল, "বেশ করিয়াছি, আরও করিব।" ভূঞা সাহেব দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "কথা বলিলেই তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠ, তোমাকে আর কি বলিব ?"

গো-জান। সাধে কি জ্বলিয়া উঠিতে হয়।

ভূ-সা। মা ও মেয়ে তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিল।

গো-জান। না, তাহারা আর অন্যায় করিবে কি ? তাহারা পীর-মোরশেদের মত শুইয়া-বসিয়া খাইলে কোন দোষ নাই ? আর আমি রাত-দিন আগুনের তাতে চুলার গোড়ে বসিয়া বাঁদী-দাসীর মত খাটুনী খাটিয়া তাহা-দিগকে দু'একটা কাজের কথা বলিলেই যত দোষ।

ভূ-সা। কাজের কথা ছোট গলায় আদরের সহিত বলিলে দোষ হয় না। কিন্তু বাজারে-স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পাড়া মাথায় করিয়া অকথ্য-বাক্যে গালাগালি করিলে জাত-মান থাকে না। আমাদের ঘরে বৌ-ঝি অমন করিয়া গলাবাজী ও

ইতরামী করিলে সমাজের নিকট আমাদের মুখ দেখান ভার হয়।

গো-জান। (ক্রোধ-কম্পিত আননে) হাঁ, আমি বাজারে-স্ত্রীলোক—আমি ইতর। এই বলিয়া অতি রোসে ঝট্‌কা দিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভূঞা সাহেব ভাবিলেন, যদি এ সময় ঘর হইতে চলিয়া যায় তবে মহাবিভ্রাট ঘটাইবে। হয় রাতারাতি জামতাড়া চলিয়া যাইবে, না হয় কুস্থানে রাত কাটাইয়া আমার মুখে চুন-কালি দিবে। এ নিমিত্ত তিনি হুকার নল ফেলিয়া থাবা দিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোলাপজানের সক্রোধ বল প্রকাশে তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল। ভূঞা সাহেব দেখিলেন, গোলাপজানের দুধে-আলতা-মাখান দেহলাবণ্য ভিত্তিগাত্র-সংলগ্ন সুশুভ্র কাচ কাঞ্চনরশ্মি-প্রভায় জুলেখার সৌন্দর্যকে পরাভূত করিয়াছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যসন্দর্শনে ভূঞা সাহেবের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল; তিনি গোলাপ-জানের হাত ধরিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমার অভাবে যে আমি দশ দিক অন্ধকার দেখি। রাগের মাথায় দু'কথা বলিয়াছি বলিয়াই কি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয়? এঘর-সংসার, গরু-বাছুর, চাকর-চাকরাণী সবই যে তোমার, সকলকেই যে তোমার হুকুম মত চলিতেই হইবে।" স্বামী এই সামান্য ঘটনায় অমন ভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে, অতি দুর্জ্জন স্ত্রীলোকের মনও অনেকটা কোমল হইয়া আসে। গোলাপজানের মনও নরম হইল, সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আমি কি তোমার গৃহস্থালীর লোকসান দেখিতে পারি? তোমারই সংসারের আয়-উন্নতির মিমিত্ত শরীর মাটি করিতেছি। আর তোমার কলাগাছের মত মেয়ে কেবল ফুলের সাজি হইয়া শুইয়া-বসিয়া কাল কাটাইবে তাহাকে তোমারই সংসারের কাজে এক-আধটুকু ফরমাইস করিলে তোমার মা মুখে যা আসে তাই বলিয়া আমাকে গালিগালাজ করে, পারে ত' ধরিয়া মারে। এমনভাবে আমি আর তোমার সংসার করিতে চাই না। তুমি আমাকে আমার ভাইয়ের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও, সুন্দরী বিবি আনিয়া সংসার কর।" ভূঞা সাহেব দেখিলেন, তাঁহার প্রেয়সীর নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে; মনও খুব কোমল হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি প্রিয়তমার হস্ত ত্যাগ করিয়া তাহার স্খলিত অঞ্চল-যোগে গলিত-নয়নবারি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "প্রাণাধিকে! আর রাগ করিও না। তোমার ইচ্ছামত সংসার চালাও, আমি আর কিছুই বলিব না।"

এই বলিয়া তিনি আদর পূর্বক তাহাকে খাটে তুলিলেন। সে রাত্রির পালা এইরূপেই শেষ হইল।

ভূঞা সাহেব গোলাপজানকে বিবাহ করিয়া শেষ জীবনে এইরূপ অভিনয় আরও অনেকবার দেখইয়াছেন এবং "দেহ পদপল্লবমুদারম্ বলিয়া পটক্ষেপ করিয়াছেন।

এস্থলে আমি মধুপুরের আর একটি ভদ্র পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধৈর্যশীল প্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়া আরব্ধ পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

এই ভদ্র পরিবারের অভিভাবকের নাম—ফরহাদ হোসেন তালুকদার। ইনি আমাদের হামিদার পিতা ও বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর সহিত সংলগ্ন পশ্চিমাংশে ইহার বাটী। নিজ বাটীতেই বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে পর্দ্দার সুন্দর বন্দোবস্ত। বিবাহিতা অবিবাহিতা অনেক মেয়ে এই স্কুলে অধ্যয়ন করে। মধুপুরে তালুকদার সাহেবেরা বনিয়াদী ঘর। কালচক্রে তালুকের অনেকাংশে পরহস্তগত হইয়াছে ; অবশিষ্ট তালুকের বার্ষিক আয় তিন শত টাকা মাত্র। তালুকদার সাহেবের খামারে তিন খাদা জমি। জমি বর্গা বা আধি দিয়া যে শস্যাদি প্রাপ্ত হন, তদ্দারা তাঁহার সংসার-খরচ চলিয়া যায়। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, কন্যা, এক শিশুপুত্র এক চাকরাণী ও একটি রাখাল চাকর। তালুকদার সাহেবের স্ত্রী শিক্ষিতা ; কন্যা হামিদাকে তাঁহারা নিজ হাতে শিক্ষা দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বেলতা গ্রামে একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। হামিদার স্বামী বি-এ পাশ করিয়া এক্ষণে কলিকাতার ল-ক্লাশে পড়িতেছেন। ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেবের ন্যায় আত্মপ্রসাদী সুখী লোক অতি বিরল। ভূঞা সাহেবের সহিত তালুকদার সাহেবের বংশগত কোন আত্মীয়তা নাই ; কিন্তু বহুকাল একত্র একস্থানে বাস করিয়া উভয় পরিবারে আত্মীয়তা অপেক্ষাও অধিকতর ঘনিষ্টতা জন্মিয়া গিয়াছে। ভূঞা সাহেব অপেক্ষা তালুকদার সাহেব বয়সে বড়, জ্ঞানে প্রবীন, স্বভাবে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মে উন্নত। ভূঞা সাহেব সংসারের গুরুতর বিষয় তালুকদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সম্পন্ন করেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আনোয়ারা যে দুর্বিষহ শিরঃপীড়ায় ও জ্বরাতিশয্যে শয্যা-শায়িনী হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল, আমরা আনুষঙ্গিক কথা-প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্ব লই নাই : এক্ষণে আসুন, আমরা ভূঞা সাহেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একবার সেইপর্দ্দানশীন আনোয়ারাকে দেখিয়া আসি। ঐ শুনুন, "মাথা গেল—মাথা গেল!" বলিয়া বালিকা চিৎকার করিতেছে স্নেহশীলা দাদী-মা তাহার পিঠের কাছে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।

এমনসময় ভূঞা সাহেব একবার ঘরের দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিয়া কহিলেন "মা, রাত্রিতে মেয়ের কি কোন অসুখ করিয়াছিল, হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কি?" জননী চোখের পানি মুছিয়া কহিলেন, "কি জানি বাছা, রাত্রিতে মেয়ের ভাত খাইতে যাওয়ায় একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া বৌ তাহাকে বাপান্ত করিয়া গালাগালি করিয়াছিল, তাই বাছা আমার, ঘেন্নায় ভাত-পানি ত্যাগ করিয়া ঘরে আসিয়া শোয়। শেষ রাত্রিতে যখন আমি তাহাজ্জদের নামাজ পড়িতে উঠি, তখন মেয়ে ঘুমের ঘোরে দুই-তিন বার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে শেষে 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। ভোরে হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়াই তাহার এ দশা হইয়াছে। নাক-চোখ-মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, গা দিয়া আগুন ছুটিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া প্রলাপ বকিতেছে। হামিদার মা দেখিয়া কহিল, "মেয়ের অবস্থা ভাল নয়। সত্বর ডাক্তার দেখান।

ভূঞা সাহেব তখন ঘরে উঠিয়া স্বচক্ষে মেয়ের পীড়ার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, 'এখন কি করা যায়? ভাল ডাক্তার নিকটে নাই, টাকা-পয়সাও হাতে নাই, পাটগুলি খরিদ্দার অভাবে বিক্রয় হইতেছে না, এখন উপায় কি?"—এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। ছেলের কথা শুনিয়া মা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই সময় দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া গোলাপজান মাতা পুত্রের কথাবার্তা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। ভূঞা সাহেব প্রাঙ্গণে পর্দার্পন করিবামাত্র সে কুপিতা-বাঘিনীর মত গর্জিয়া উঠিল, কহিল "আমার গালির চোটে তোমাদের সোনার কমল শুকাইতে বসিয়াছে, এখন আর

াক, পালের বড় গরুটা বেচিয়া তাহার জন্য ডাক্তার আনা হউক। তা যাহাই করা হোক, ফয়েজ (আজিমুল্লার পুত্র) কাল টাকার জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের খুব ঠেকা। আমি বলিয়া দিয়াছি, পাট বিক্রয় হইলেই তোমাদের টাকা দেওয়াইব। আমি ভাল মুখে বলিতেছি, আমার ভাইয়ের বিনা সুদের হাওলাতি টাকা শোধ করিয়া, যাহা মনে চায়, তাহাই যেন করা হয়।" এই বলিয়া গোলাপজান ঘৃণার সহিত মুখ নাড়া দিয়া সবেগে রান্নাঘরের আঙ্গিনার দিকে চলিয়া গেল। ভূঞা সাহেব অপরাধী মানুষের মত চুপটি করিয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। এই সময়ে আনোয়ারা পুনরায় প্রলাপ বকিয়া উঠিল, "মাগো, আমাকে কাছে লইয়া যাও, আমি আর এখানে থাকিব না"

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে; একখানি পান্‌সী ভূঞা সাহেবের বাহির বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পশ্চিম মুখে চলিয়া যাইতেছিল। নৌকার মাঝি ভূঞা সাহেবকে দেখিয়া কহিল, আপনাদের পাড়ায় পাট পাওয়া যাইবে।" ভূঞা সাহেব কহিলেন, "হাঁ, আমার বাড়ী এবং আরও অনেক বাড়ীতে পাট মজুত আছে।" মাঝি নৌকার গতিরোধ করিয়া তাঁহার ঘাটে নৌকা বাঁধিল। একটি ভদ্রলোকও তাঁহার পিছনে পিছনে আর একটি লোক পাট দেখিবার নিমিত্ত ভূঞা সাহেবের বাড়ীর উপর নামিলেন। ভূঞা সাহেব ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া কেমন যেন এক ধাঁধায় পড়িয়া অনেকক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নৌকা কোথাকার।" সঙ্গীয় লোকটি বলিল, "বেলুগাঁও জুট কোম্পানীর।" ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ইনিই সেই কোম্পানীর বড়বাবু।" ভূঞা সাহেবের ধাঁধা কাটিয়া গেল। বেলুগাঁও বন্দরে সকলেই ভদ্রলোকটিকে 'বড়বাবু' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বড়বাবু কোম্পানীর আদেশে পাটের অবস্থা দেখিয়া যান এবং নমুনাস্বরূপ ২।৪ নৌকা বোঝাই করিয়া পাট লইয়া থাকেন। এবারও তিনি সেই উদ্দেশ্যেই মফঃস্বলে আসিয়াছেন।

ভূঞা সাহেব বড় বাবুকে সম্মানের সহিত নিজের বৈঠকখানায় বসিতে দিলেন। তাঁহার একজন চাকর একতাড়া পাট আনিয়া বড়বাবুর সম্মুখে রাখিল। সঙ্গীয় লোকটি পাট খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় তালুকদার সাহেবও পাট বিক্রয় মানসে তথায় আসিলেন। তিনিও প্রথমে বড়বাবুকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আবার এই সময় আমাদের ভোলার মা কার্য্যোপলক্ষে বহির্বাটিতে আসিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে যাইয়া, হামিদার মাকে কহিল,

"মা-জান, মজার কাণ্ড—দুলামিয়া যে পাটের বেপারী।" হামিদার মা কহিলেন, "তুমি বল কি ?" ভোলার মা কহিলেন, "আমার চোখের কসম, সত্যি বলিতেছি দুলামিয়া ভূঞা সাহেবের বৈঠকখানায় বসিয়া পাট কিনিতেছেন।" হামিদার মা কহিলেন, "উনি কোথায় গেলেন ?" ভোলার মা কহিল, "তিনি দুলামিয়ার কাছে গিয়াছেন।" হামিদার মা তখন ভোলার মা'কে কহিলেন, "তুমি এখন যাও, তাঁহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আন।" ভোলার মা পুনরায় বহির্বাটীর দিকে চলিল। এবার মা ও মেয়ে উভয়ে সন্দেহের দোলায় ঘুরপাক খাইতে লাগিলেন।

এদিকে বহির্বাটীতে পাটের দর-দস্তর চলিতেছে ; এমন সময় ভূঞা সাহেবের অন্তঃপুরে অস্ফুটস্বরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তালুকদার সাহেব কহিলেন, "বাটীর ভিতরে কাঁদে কে ?"

ভূ-সা। বোধ হয় মা।

তালু। কেন ! কি হইয়াছে ?

ভূ-সা। মেয়েটি ভয়ানক কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

তালুকদার সাহেব "বল কি !" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া ভূঞা সাহেব কহিলেন, "তোমার মত নির্দ্দয় লোক ত আর দেখা যায় না। তুমি আসন্নমৃতা কন্যাকে ঘরে রাখিয়া পাট বিক্রয় করিতেছ ! সত্বর ডাক্তার ডাক।"

এই সময় বড়বাবুর সঙ্গীয় লোকটি আড়ালে যাইয়া তামাক খাইতেছিল। সে বাবুর সাক্ষাতে তামাক খায় না। এ ব্যক্তি পাটের যাচনদার, বড়বাবুর সঙ্গে থাকে। যাচনদার পীড়ার কথা শুনিয়া ভূঞা সাহেবকে ছোট ছোট করিয়া কহিল, "আমাদের বড়বাবু খুব ভাল ডাক্তার, বাক্সভরা ঔষধপত্র ইঁহার নৌকায় আছে। ইঁহার মত জনহিতৈষী লোক আমরা দেখি না। পীড়িতের প্রাণরক্ষার জন্য ইনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এমন কি চিকিৎসার জন্য কাহারও নিকট টাকা-পয়সা লন না। আপনি ইহার দ্বারা আপনার কন্যার চিকিৎসা করাইতে পারেন।" কৃপণস্বভাব ভূঞা সাহেব বিনা টাকায় চিকিৎসা হইতে পারিবে মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন ; কিন্তু কন্যা বয়স্থা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদার সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় তিনি বলিলেন "যে অবস্থা, তাহাতে পর্দ্দার সম্মান রক্ষা অপেক্ষা এক্ষণে চেষ্টা করিয়া মেয়ের প্রাণ রক্ষা করাই সুসঙ্গত মনে করি ; আমাদের হাদিসেও এইরূপ বিধান আছে।

ভূঞা সাহেব তখন আর দ্বিধাবোধ না করিয়া বড়বাবুকে যাইয়া কহিলেন, "জনাব! শুনিলাম আপনি একজন ভাল চিকিৎসক। আমার একটি কন্যা প্রাণসংশয়াপন্ন কাতর ; আপনি মেহেরবাণীপূর্বক তাহার চিকিৎসা করিলে সুখী হইতাম।" বড়বাবু কহিলেন, 'আমি চিকিৎসক নহি, তবে নিজের প্রয়োজনবশতঃ ঔষধপত্র সঙ্গে রাখি, সময় ও অবস্থাবিশেষে অন্যকেও দিয়া থাকি।' ভূঞা সাহেব কহিলেন, "তা যাহাই হউক, এই আসন্ন বিপদে আমার উপকার করিতেই হইবে।" বড়বাবু তখন পীড়ার অবস্থা শুনিয়া শিষ্টাচার জানাইয়া কহিলেন, "তবে একবার দেখা আবশ্যক।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যমুনার কৃশাঙ্গী তনয়াদ্বয় প্রকৃতির বিধানে যেস্থানে মিলিত হইয়া কোলে গা-ঢালিয়া দিয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের দক্ষিণতীরে রতনদিয়া গ্রাম। নীচজাতীয় কয়েক ঘর হিন্দু ব্যতিত গ্রামের অধিবাসী সবই মুসলমান। মুসলমানদিগের মধ্যে আমির-উল-এস্‌লাম নামের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস। তিনি গ্রাম হইতে একমাইল দূরে নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিতেন। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহ জেলায় হাজী সফীউদ্দিন নামক জনৈক পরম ধার্মিক মহাত্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই শুভ প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ আমির-উল-এস্‌লাম সাহেব একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পিতার নিজ নামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—নুরুল এস্‌লাম। নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিতেন বলিয়া আমির-উল-এস্‌লাম সাহেবের বংশ দেশের সর্বত্র দেওয়ান আখ্যায় পরিচিত।

সাধারণতঃ নীলকুঠির প্রভু ও ভৃত্যগণের মধ্যে যেরূপ উৎকোচ-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেওয়ান আমির-উল-এস্‌লাম সাহেবের আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু তিনি ধর্মশীলা পত্নীর সংসর্গে ধর্মসাধনে যেরূপ উন্নত হইয়াছিলেন, আর্থিক উন্নতি বিষয়ে সেরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি ন্যায়-পথে থাকিয়া যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাতে মিতব্যয়শীলা পত্নীর গুণে সংসারের অভাব পূর্ণ হইয়া কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত। শেষে তিনি তদ্দ্বারা বার্ষিক পাঁচশত টাকা আয়ের একটি ক্ষুদ্র তালুক খরিদ করেন।

নুরুল এসলামের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার পিতা সমধিক মনোযোগী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে নুরল এসলাম স্থানীয় নবপ্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তিলাভ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বৎসর তাঁহার জননী তাঁহাকে ও তাঁহার দুইটি শিশু ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করেন। আমির-উল-এস্‌লাম সাহেব পত্নীবিয়োগে সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন বটে, তথাপি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন না। সময় মত তিনি পুত্রকে তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে সংসার অচল হইলেও গুণবতি প্রিয়তমা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া,

দেওয়ান সাহেব দুই বৎসর যাবৎ বিবাহ করিলেন না। শেষে দেশস্থ নানা লোকের প্ররোচনা ও পরামর্শে নিজ গ্রামের দক্ষিণে গোপীনপুর গ্রামে মহোচ্চ বংশে আলতাফ হোসেন নামক এক ব্যক্তির বয়স্কা রূপবতী কনিষ্ঠা ভগিনীকে তালুকের অর্ধেক কাবিন দিয়া বিবাহ করিলেন। কালক্রমে এই পক্ষে দেওয়ান সাহেবের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। এই কন্যা জন্মগ্রহণের পর নুরল এসলামের অপ্রাপ্ত-বয়স্কা ভগিনীদ্বয়ের আর এ সংসারে তিষ্ঠান দায় হইল। পত্নীর বিদ্বেষ-ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া দেওয়ান সাহেব কন্যাদ্বয়কেও তাহাদের স্নেহময়ী মাতামহীর নিকট ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিলেন। নুরল এসলাম ছুটির সময় মাতুলালয় হইতে বাড়ীতে আসিতেন; কিন্তু বিমাতার ব্যবহারে শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্কুল খুলিবার পূর্বেই ময়মনসিংহে চলিয়া যাইতেন। স্নেহশীল পিতা পুত্রের মানসিক কষ্ট অনুভব করিয়া নীরবে, নির্জনে অশ্রুমোচন করিতেন এবং নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে পুত্রের চিত্তবিনোদন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

নুরল এসলাম চারি বৎসরে বৃত্তিসহ এসট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। তাঁহার পিতা তাহাকে মাসে মাসে বৃত্তির উপর ২০।২৫ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইতে লাগিলেন। খোদার ফজলে নুরল এসলাম দুই বৎসরেই প্রশংসার সহিত এফ-এ পাশ করিয়া বি এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বৎসরের শেষে অকস্মাৎ নিদারুণ সান্নিপাতিক জ্বরে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটায় নুরল এসলাম পরমারাধ্য পিতার অভাবে সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বিমাতার চক্রান্তে ভূসম্পত্তি ও গৃহস্থালী বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, অগত্যা তিনি সে সকলের ভার নিজ হাতে লইলেন। সুতরাং বি-এ পাশ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।

প্রতিভাবলে পঠিত বিদ্যায় নুরল এসলাম যেরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তৎসঙ্গে ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞানও কম লাভ করিয়াছিলেন না। তিনি দেখিয়া-ছিলেন, চাকরীজীবীর শারীরিক ও মানসিক সমুদয় ইন্দ্রিয় সর্বক্ষণ প্রভুর মনোরঞ্জন সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত রাখিতে হয়, স্বাধীন ভাবে মানব-জীবনের মহতুদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে না; এ নিমিত্ত চাকরীকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বি-এ পাশ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের স্থির সঙ্কল্প ছিল।

কিন্তু পিতার মৃত্যুতে হঠাৎ তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। তথাপি তিনি অভীপ্সিত সঙ্কল্পের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপাততঃ বাড়ী হইতে ছয় মাইল পূর্বে

বেলগাঁও বন্দরে জুট-কোম্পানীর অফিসে ৩৫_ টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করিলেন। সপ্তাহে ২।১ বার আসিয়া বাড়ী-ঘরের তত্ত্বাবধান লইতে লাগিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় অনেক ভাল ঘর হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল ; কিন্তু তিনি বি-এ পাশ করিয়া উপার্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিবেন না প্রকাশ করায় তাঁহার পিতা সমস্ত সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত ভার তাহাকে নিজ স্কন্ধে লইতে হইল, তিনি উপার্জনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিমাতা তাহাকে এক দুরাশার ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। বিমাতার বিবাহযোগ্যা এক পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। তিনি ভাবিলেন, পতির অর্ধেক সম্পত্তি কাবিন-স্বত্বে তাহার প্রাপ্য হইয়াছে ; এক্ষণে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরল এসলামের সহিত বিবাহ করাইয়া অপরার্ধ সম্পত্তি সেই কন্যার নামে লিখাইয়া লইবেন, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সমস্ত সম্পত্তি তাহারই আয়ত্তে আসিবে, তিনি সংসারের কর্ত্রী হইয়া সুখে কাল কাটাইবেন। এইরূপ দুরাশায় প্রলুব্ধ হইয়া তিনি অগোণে নুরল এসলামের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। নুরল এসলাম এ প্রস্তাব শুনিয়া জনৈক প্রবীণ আত্মীয়ের দ্বারা বিনয়সহকারে মাতাকে জানাইলেন, "আমি আপাততঃ বিবাহ করিব না, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অন্যত্র সৎপাত্রে বিবাহ দিউন।" পিতা যে বংশে কাবিন দিয়া নগদ অজস্র অর্থাদি ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, মুরুব্বিহীন নুরল এসলাম সেই উচ্চকুলোদ্ভবা সুরূপা পাত্রীকে বিবাহ করিতে অসঙ্কোচে অম্লান বদনে অস্বীকার করিলেন। ব্যাপার সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগের অনুমান হইতেছে, এই প্রত্যাখ্যানের জন্য নুরল এসলামকে মর্মঘাতী ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, অশান্তির দাবানলে হয়ত তাহার জীবনের প্রথম ভাগ দগ্ধীভূত হইবে। যাহা হউক, তজ্জন্য আমরা নুরল এসলামকে এক্ষণে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না। কারণ, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে বলিতে পারে ? ভবিষ্যৎ বড়ই দুর্গম। মানুষ মানুষের পেটের কথা টানিয়া বাহির করে, বিজ্ঞানবলে তড়িৎ ধরে, আকাশে উড়ে, সাগরে ভাসে, পাতালে প্রবেশ করে, আবার মরা মানুষ জীবিত করিতে চায় ; কিন্তু প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে যবনিকা আছে তাহা ভেদ করিবার কথা ধারণায় আনিতেও অক্ষম। নুরল এসলাম ত নগণ্য যুবক।

নুরল এসলাম বুঝিয়াছিলেন, সংসার জীবনের সুখের মূল ধর্ম, অর্থকাম মোক্ষের সহায়। পারিবারিক ধর্মভাব ও প্রীতি-পবিত্রতা, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক সংসর্গে

পাইবার আশা, মরুভূমিতে নন্দনকাননের সুখসৌন্দর্য ভোগের আশার ন্যায় দুরাশামাত্র। আমরা বাহিরের অবস্থায় যত লোককে ধনী, মানী, গুণী জানিয়া সুখী মনে করিয়া থাকি, ভিতরের অবস্থায় তাঁহাদের অধিকাংশ লোক প্রকৃতপক্ষে সুখী নয়, বরং নিরয়-নিবাসী; পরন্তু তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী—অশিক্ষিতা সহধর্মিণী-গণই যে এই নিরয়-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী তাহাও সুনিশ্চিত। এই নিমিত্ত অশিক্ষিতা রমণীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, এদেশে যাহারা উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আরবী-ফারসী বিদ্যা শিক্ষায় একরূপ উদাসীন, অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষা-লাভে সবিশেষ মনোযোগী নহেন; পরন্তু কেবল কুলের দোহাই দিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। পারিবারিক স্বর্গীয়-পবিত্রতা ইঁহাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। ইঁহাদের ২।৪ জন আবার একাধিক বিবাহ করিয়া, সেই সুখ-শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন এবং নিজে সেই আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবন্মৃতভাবে কাল কর্তন করেন। এইরূপ দেখিয়া ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। তিনি নিজ পরিবারেই সংসার ধর্মের দ্বিবিধ অবস্থা সন্দর্শ করেন। প্রথমে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহার জননী জীবিতকাল পর্যন্ত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সর্বাগ্রে তাহার পিতার প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন করিয়া দিতেন, পরে তিনি নিজে অজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িতেন। শেষে এক ঘণ্টা কোর-আন শরীফ পাঠ করিয়া গৃহস্থালীর কার্যে মনোযোগীণী হইতেন এবং তাহা পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া পিতার স্নানাহারের আয়োজন করতঃ পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি নীল-কুঠি হইতে পরিশ্রান্ত-দেহে ঘরে ফিরিলে, মা তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেন। অনন্তর স্বহস্তে তাঁহাকে স্নানাহার করাইয়া শেষে চাকর-চাকরাণীদিগের আহারের তত্ব লইতেন, পরে নিজে আহারে যাইতেন। পিতার স্নানাহারের পূর্বে দিন কাটিয়া গেলেও মা আহার করিতেন না।

পিতার পীড়ার সময় মায়ের অবস্থায় দেখা যাইত পীড়া যেন তাঁহারই হইয়াছে। জননীর জীবিতকাল পর্যন্ত নুরল এসলাম সংসারের অভাব-অশান্তি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। আবার তাঁহার জননীর মৃত্যুর পরও বিমাতা যখন গৃহস্থালীর কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি দেখিতে লাগিলেন,—পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য ডাক পড়িলে কেবল চাকরাণীরাই তাঁহার সন্নিহিত হইত; বিমাতা কেবল সময় সময় অভাব-অভিযোগের কথা লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইতেন। তাঁহার

গর্ভজাত কন্যা ও নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়া তিনি আর অন্য কোনদিকে নজর করিবার বড় অবসর পাইতেন না। মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ও সুগন্ধি তৈলাদির জন্য তিনি পিতাকে অহরহঃ ত্যক্ত-বিরক্ত করিতেন। তাঁহার গতি-বিধিতে, তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাঁহার প্রতি নিঃশ্বাসে কেবল আভিজাত্যের অভিমানই প্রকাশ পাইত। এই খেয়ালের বশে তিনি পিতাকে আন্তরিক ভক্তি করিতে পারিতেন না। প্রবীন পিতা বিমাতার এই ভাব সবই বুঝিতেন এবং বুঝিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। পিতা ১৪ দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন ; এই ১৪ দিন নুরল এসলাম ও তাহার ফুফুআম্মা দিনরাত খাটিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। এই সময় বিমাতা যে তাঁহার পরিচর্যা করেন নাই, তাহা নহে ; কিন্তু তাঁহার পরিচর্যায় আন্তরিক অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে পিতার যখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল ফুফু-আম্মা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বিমাতাও পতিশোকে শোকাকুলিতা হইলেন বটে ; কিন্তু তদ্‌সঙ্গে লোহার সিন্দুকের চাবিটিও হস্তগত করিতে ভুলিলেন না। বিমাতার ব্যবহারে নুরল এসলামের করুণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল।

এই সমস্ত কারণে বিমাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করিলে, নুরল এসলাম ভাবিলেন, 'যে ঘরে এহেন বিমাতা, সেই ঘরে বিবাহের সম্বন্ধ বিশেষতঃ পাত্রি সুন্দরী হইলেও অশিক্ষিতা।' তাই তিনি অসঙ্কোচে বিমাতার প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, বিবাহ যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ ! মানবজীবনের সুখ-দুঃখ অধিকাংশকাল এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে ; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া মনের মত শিক্ষিতা পাত্রী পাইলে বিবাহ করিবেন, নচেৎ করিবেন না,— এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠক অবগত আছেন আনোয়ারার পীড়ার কথা প্রসঙ্গে বড়বাবু কহিলেন, "একবার দেখা আবশ্যক।" ভূঞা সাহেব কহিলেন, "তবে মেহেরবাণী করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলুন।" তখন বড়বাবু ভূঞা সাহেব ও তালুকদার সাহেবের সহিত আনোয়ারার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। বালিকার দাদিমা তৎপূর্বেই তাহাকে মশারি দ্বারা পরদায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরে যে লোকজন প্রবেশ করিয়াছে, বালিকা তাহা টের পায় নাই ; সে দুর্বিষহ শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া এই সময় মশারি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দাদিমা, "পোড়া-মুখী সব ফেলিয়া দিল" বলিয়া পুনরায় তাহাকে পর্দাবৃত করিতে চেষ্টা করিলেন। বড়বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই পীড়ার অবস্থা বুঝিতে পারিব।" এই বলিয়া তিনি বালিকার মুখের দিকে তাকাইলেন। দৃষ্টিমাত্র বিস্ময়ে তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল ; কিন্তু প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত পৃথিবীর গতি যেমন অনুভব করা যায় না, সেইরূপ বাহিরের অবস্থায় বড়বাবুর ভাবান্তর অন্য কেহ টের পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন. এই বালিকাই শেষে খিড়কীরদ্বার হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময় বালিকা একবার চক্ষুউন্মীলন করিল। তাহার রক্তচক্ষু দেখিয়া বড়বাবু একান্ত বিমর্ষ হইলেন ; এবং সত্বর মাথায় জলপট্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া কাঁচি ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড চাহিলেন। ভূঞা সাহেব তাহা আনিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। বড়বাবু থার্মোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জ্বর ১০৫ ডিগ্রী। তিনি ব্যাকুলভাবে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন সান্নিপাতিক জ্বর, বড়বাবু হতাশচিত্তে পুনরায় বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন এবং অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "দয়াময়! তুমি ইহাকে রক্ষা কর।" এই সময় আনোয়ারা জ্ঞানশূন্যভাবে পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল এবং প্রলাপের বাক্যে কহিল, "ইনি কি তিনি?"

ভূঞা সাহেব কাঁচি ও বস্ত্রখণ্ড লইয়া পুনরায় তথায় আসিলেন। বড়বাবু তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি রোগিনীর ঠিক মাথার মাঝখানের একগোছা চুল কাটিয়া দিন" ভূঞা সাহেব কহিলেন, "আমার কাটা ঠিক হইবে না, আপনি

কাটুন।” বড়বাবু তখন বালিকার মাথার একগোছা চুল কাটিয়া ফেলিলেন। কর্তিত কেশগুলি এত চিক্কণ ও দীর্ঘ যে, তিনি ঐরূপ কেশ আর কখনও দেখেন নাই। ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আর চুল কাটিলেন না। কর্তিত স্থানের আশে-পাশের চুল সরাইয়া মাথায় জলপটী বসাইয়া দিলেন। এই প্রক্রিয়ায় বালিকার অসহ্য শিরঃপীড়া অল্প সময়ে অনেকটা উপশমিত হইল। ভূঞা সাহেব বড়বাবুকে বিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া জ্ঞান করিলেন। বড়বাবু সকলের অজ্ঞানে ক্ষিপ্রহস্তে কর্তিত কেশগুলি অঙ্গুলিতে জড়াইয়া নিজ পকেটস্থ করিলেন।

অতঃপর সকলে উঠিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। বড়বাবু নৌকা হইতে ঔষধের বাক্স আনাইয়া দুই প্রকার দুই শিশি ঔষধ দিলেন। ক্ষুধা পাইলে দুধ-বার্লি পথ্যের কথা বলিয়া দিলেন। পাটের দর-দস্তর করিতে আর কথা খরচ কোন পক্ষেই হইল না। ভূঞা সাহেব ১৩০ মণ ও তালুকদার সাহেব ২৭ মণ পাট ৫ টাকা দরে বিক্রয় করিলেন। পাটের মূল্য মিটাইয়া দিয়া নৌকায় উঠিবার সময় ভূঞা সাহেব পাঁচটি টাকা দর্শনী স্বরূপ বড়বাবুকে দিতে উদ্যত হইলেন। বড়বাবু কহিলেন, “আমি টাকা লইয়া চিকিৎসা করি না, যেভাবে যতটুকু পারা যায়, মানুষই মানুষের উপকার করিবে, এই মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকি।” এই বলিয়া তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন না। যাইবার সময় আরও বলিয়া গেলেন, “আমি স্থানান্তরে পাট দেখিয়া অপরাহ্ণ ৩।৪ টার সময় পুনরায় আপনার কন্যাকে দেখিয়া যাইব। আপনারা সাবধানে পর্যায়ক্রমে ঔষধ সেবন করাইবেন।” বেলা তখন প্রায় ১২টা।

তালুকদার সাহেব পাট বিক্রয় করিয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে হামিদার মা কহিলেন, “তুমি এতক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আসিলে? আমার যে উৎকণ্ঠায় প্রাণ বাহির হইবার মত হইয়াছে?”

তা-সা। কেন, কি হইয়াছে?

হা-মা। দামাদ মিঞা (জামাতা) কোথায়?

তা-সা। সে-কি! এমন সংবাদ তোমাকে কে দিল?

হা মা। তবে কি মিথ্যা কথা? ভোলার মা শশব্যস্তে আসিয়া আমাকে বলিল, ‘দুলামিয়া ভূঞা সাহেবের বাড়ীতে পাট কিনিতেছেন।’ আমি ত শুনিয়া অবাক!

তালুকদার সাহেব হাসিতে লাগিলেন। এই সময় ভোলার মা তথায়

আসিয়া তালুকদার সাহেবকে কহিল, "বাবজান, কৈ দুলামিঞাকে বাড়ীর মধ্যে আনিলেন না?" তালুকদার সাহেব তখন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং পরিহাস করিয়া ভোলার মাকে কহিল, "দামাদ মিঞাকে তুমি ডাকিয়া না আনিলে, তিনি আসিবেন না বলিয়াছেন।" ভোলার মা কহিল, "তবে আমি যাই, তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া আসি। এই বলিয়া বৃদ্ধা গমনোদ্যত হইল। রহস্য বুঝিয়া তখন হাসির চোটে তালুকদার সাহেবের পেটে ব্যথা ধরিল। হামিদার মা স্বামীর হাসির ভাবে বুঝিলেন, ভোলার মা অন্য লোককে দামাদ মিঞার মত মনে করিয়াছে। তাই তিনি মুচকি হাসিয়া ভোলার মাকে কহিলেন, "দূর হতভাগী চোখের মাথা কি একেবারেই খাইয়া বসিয়াছ? ভোলার মার তখন কতকটা জ্ঞান হইল। সে কহিল, "তবে কি বুবুজানও খাইয়া বসিয়াছেন?" ভোলার মা হামিদাকে বুবুজান বলিয়া থাকে।

হামি-মা। ওমা! সে কি কথা? তাই বুঝি মেয়ে আমার ভাত-পানি ছাড়িয়া বসিয়াছে?

হা-পি। সে দেখিল কিরূপে?

ভো-মা। বুবুজানই ত' তার সইদিগের আঙ্গিনা হইতে দেখিয়া আসিয়া পহেলা আমাকে বলিয়াছেন।

তালুকদার সাহেব ঘটনার রহস্য আদ্যন্ত বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। হামিদা কক্ষান্তরে থাকিয়া সরমে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল।

অতঃপর, হামিদার পিতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমি এ বয়সে এমন এক চেহারার দুইজন লোক কোথাও কখন দেখি নাই। যিনি পাট কিনিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দামাদ মিঞাকে বদল করা চলে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দামাদ মিঞা বলিয়া প্রথমে আমারই ভ্রম হইয়াছিল।" পিতার মুখে প্রকৃত অবস্থা শুনিয়া হামিদা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলা বাহুল্য আমাদের প্রাতঃকালে দৃষ্ট নৌকাস্থ যুবক, হামিদার ভ্রম-কল্পিত স্বামী, ভোলার মা'র দুলামিঞা, যাচনদারের বড়বাবু, আনোয়ারার চিকিৎসক ও আমাদের পূর্ববর্ণিত নুরল এসলাম একই ব্যক্তি। অতঃপর আমরা ইহাকে নাম ধরিয়া ডাকিব।

নুরল এসলাম অপরাহ্ণ চারটায় ফিরিয়া আসিয়া ভূঞা সাহেবের সহিত তাঁহার রোগীণীকে পুনরায় দেখিলেন। জ্বর কমিয়া ১০২ ডিগ্রীতে নামিয়াছে,

চক্ষের লালিমা অনেকটা কমিয়াছে। তিনি ঔষধ বদলাইয়া দিয়া সে রাত্রি ভূঞা সাহেবের বাড়ীর ঘাটেই নৌকা বাঁধিয়া অবস্থান করিলেন। মঙ্গলমত রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় তিনি রোগীণীকে দেখিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, স্ফুটনোম্মুখ গোলাপ-কলিকা যেমন ম ধ্যাহ্নিক রবিকরতাপে বিবর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া যায়, নিদারুণ জ্বরোত্তাপে বালিকা সেইরূপ মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয় তাহার জ্বর ও চক্ষুর রক্তাভ ভাব ছুটিয়া গিয়াছে। নুরল এসলাম বহির্বাটীতে আসিয়া রোগীণীর জ্বর-প্রতিষেধক বলকারক ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "আমি পাটের অবস্থা দেখিতে কিছুদিন এ অঞ্চলে আছি, ২।৩ দিন পরে আবার আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া যাইব।" ভূঞা সাহেব নুরল এসলামের ব্যবহারে ও মহত্ত্বে একান্ত মুগ্ধ হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলামের চিকিৎসায়; আল্লার ফজলে, আনোয়ারার জ্বর বন্ধ হইয়াছে, শিরঃপীড়া আরোগ্য হইয়াছে,সেএখন স্বেচ্ছায় উঠা-বসা চলা-ফেরা করিতে পারে, তথাপি নুরল এসলামের ব্যবস্থানুসারে শরীরের বলধারণেরজন্য এখনও সে নিয়মিত-রূপে ঔষধ সেবন করিতেছে। হামিদা অহঃরহ তাহার কাছে আসে, বসে, প্রাণ খুলিয়া কত কথা বলে; আনোয়ারা কিন্তু অল্প কথায় সই-এর উত্তর দেয়। তাহার স্বভাব-সুলভ সরলতায় গাম্ভীর্য্য প্রবেশ করিয়াছে, যোগাভ্যস্তা তাপসবালার ন্যায় সে অধিকতর স্থিরা, ধীরা ও সংযতভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে,দূর-ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের চিন্তায় সে যেন সর্বদা আত্মহারা হইয়াছে; সে এক্ষণে কেবল নির্জনতা চায়, নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসে। সুখের সংসারে চিরসোহাগে পালিতা অনূঢ়া কুমারী, তাহার আবার নির্জন চিন্তা কি? চিন্তা—নৌকার সেই মুখখানি! সেই সুঠাম সুন্দর প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি। সেই প্রেম-পীযুষ বর্ষিণী অনাবিল করুণদৃষ্টি! তেমন সুন্দর মুখ, তেমন প্রেম-মাখান—জ্যোতিঃজড়ান শান্তিপ্রদ মুখের চাহনি সে এ পর্যন্ত কখনও দেখে নাই; তাই নির্জনে দেখিয়া সাধ পূর্ণ করিতে চায়, তাই তাহার নির্জনতার এত প্রয়োজন। যখন সে নৌকার কথা মনেকরে, তখনই সেই মুখখানি তাহার চোখেরসামনে ভাসিয়া উঠে; বালিকা তখন লজ্জায় অবনত আখি হয়। যখন সে ভাবে, তাঁহাকে দেখিতে এত সাধ কেন, আনন্দই বা হয় কেন? বালিকা ফাপরে পড়িয়া আবার ভাবে ভালবাসিলে কি পাপহয়? লায়লী, শিরি, দময়ন্তী, সাবিত্রী ইহারাও ত, সতীকুলোত্তমা। বালিকা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আবার ভাবে আহা কি সুন্দর কোরাণ পাঠ, কি মোহন উচ্চারণ! তেমন সুমধুর স্বরে কোরাণ পাঠ বুঝি আর শুনিতে পাইব না;--ভাবিতে ভাবিতে যুবকের পবিত্র-মূর্তি বালিকার মানসপটে প্রকট মূর্তিতে প্রকাশিত হয়, মোনাজাতের বিশ্বজনীন মহত্ত্বে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া যায়। তখন সে যুবকের মোনাজাত-ভক্তিতে ভক্তি মিশাইয়া নির্জনে চোখের জলে বুক ভাসাইতে থাকে, আর ভাবে জগৎ-মঙ্গলবিধায়ক, এমন ধর্মভাবে পূর্ণ,এমনউদারতার চরম অভিব্যক্তি মোনাজাত,কেবল ফেরেস্তাগণের মুখে শোভাপায়, খোদার প্রতি এমন স্তুতি-ভক্তি কেবল ফেরেস্তারাই করিয়া থাকেন।

বালিকা কথনও ভাবে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে এজীবন রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারই চরণতলে প্রাণ উৎসর্গ করিলাম ; কিন্তু অযোগ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিলে যে মরমে মরিয়া যাইব। আবার ভাবে—উৎসর্গের বস্তু হেয় হইলে ত' কেবল ফেলিয়া দেয় না ; কিন্তু ফেলিয়া না দিলেও যদি মনঃপুত না হয় তবে, দিয়া লাভ কি ? না না, উৎসর্গ করাই ত' স্ত্রীলোকের ধর্ম, লাভ চাহিব কেন ?

ক্রমশঃ মন এইরূপে বালিকাকে স্বর্গীয় প্রেমের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। একদিন জোহরের নামাজ বাদ আনোয়ারা শিশি হইতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া সেবন করিল। শিশির গায়ে লেবেলে লেখা আছে, "প্রাতে,মধ্যাহ্নে ও বৈকালে এক এক দাগ সেবনীয়।" লেখা দেখিয়া আনোয়ারা ভাবিতে লাগিল, 'এ লেখা নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ হাতের, না হইলে এমন সুন্দর লেখা আর কাহার হইবে ? জগতে যাহা কিছু সুন্দর তাহা তাঁহারই।' আনোয়ারা আত্মহারা হইয়া তখন সেই পবিত্র মূর্তির ধ্যান করিতে লাগিল, হাতের শিশি হাতেই রহিয়া গেল। এই সময় একখানি কেতাব হাতে করিয়া হামিদা আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। আনোয়ারার বহির্জগত তখন বিলুপ্ত—সেপার্শ্বে দণ্ডায়মান হামিদাকে দেখিতে পাইল না। হামিদা পূর্বেই রকম-সকমে বুঝিয়াছিল, সই ডাক্তার সাহেবের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে আত্মহারাভাবে দেখিয়া কহিল, "সই, ঘরের ভিতরেওকি নৌকা প্রবেশ করিয়াছে ?" আনোয়ারার তখন চমক ভাঙ্গিল। সে হামিদাকে পার্শে দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া হৃদয়ের ভাব চাপা দেওয়ার জন্য কহিল, "সই, হাতে ওখানা কি বই ?" হামিদা হাসিয়া কহিল,'বইয়ের কথা পরে কই, কার ভাবনা ভাবছ সই ?" প্রেম-প্রফুল্ল আনোয়ারা তখন লজ্জা দূরে সরাইয়া উত্তর করিল, "কতক্ষণে আসবে সই,—ধ্যান করছি বসে তাই।"হামিদা কহিল. ":অনেকক্ষণ ত' এসেছি সই, তবে কেন সাড়া নেই ?" আনোয়রা কহিল—আর চাপিয়া গেলে চলিবে না, তাই সে সইয়ের নিকট দেলের কথা আভাসে জানাইল। হামিদা শুনিয়া কহিল,"সই অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী লোককে ভালবাসিলে কেন ? তাঁহার সহিত তোমার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়।" দর্পনে হাঁই দিলে তাহা যেমন সজল ও মলিন হইয়া উঠে, হামিদার কথায় আনোয়ারার মুখের অবস্থা সেইরূপ হইল, তাহার ইন্দ্রবর-নিন্দিত আয়তআঁখি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, সে কোনো উত্তর করিল না। হামিদা দেখিল, সই একেবারে মজিয়া গিয়াছে, পুষ্প ঘাতও বুঝি আর সহ্য হইবে না, তাই তাহার ভাবান্তর উৎপাদন

জন্য বইখানি হাতে দিয়া কহিল, "এখানা তুমিই বাবাজানকে আনিতে দিয়াছিলে ? আনোয়ারা বই খুলিয়া দেখিল, 'ওমর চরিত' 'মুখে কহিল,—'হঁা।'"

অনন্তর হামিদা কহিল, "সই, মানুষের মত যে মানুষ থাকে, আগে তাহা জানিতাম না। তোমার ডাক্তার সাহেবকে তোমার সয়া মনে করিয়া সেদিন খিড়কীর দ্বার হইতে দৌড়িয়া বাড়ী আসি, মনে নানারূপ সন্দেহ হওয়ায় সঠিক খবর জানিবার নিমিত্ত ভোলার মাকে তখনই নৌকার কাছে পাঠাইয়া দেই। পোড়ামুখী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'নৌকার আরোহী বেলতার দুলামিয়া। কথা শুনিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল।' আনোয়ারা সইয়ের মুখে নিজের প্রিয়তমের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া এতক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া স্তব্ধনিঃশ্বাসে চুপ করিয়াছিল। সইএর এত কথার পর আর কথা না বলিলে সে অসন্তুষ্ট হইতে পারে, তাই পরিহাসচ্ছলে কহিল, "সই, উল্টা কথা কহিলে, স্বামীর আগমন-সংবাদে উড়া প্রাণ ত' আবাসে বসিবার কথা।"

হামিদা। তা ঠিক, কিন্তু এবার তাঁহার কলিকাতা যাইবার সময় ঝগড়া করিয়াছিলাম।

আনো। (স্মিতমুখে) লাইলীর সহিত মজনুর বিবাদ। কেন—কি লইয়া ?

হামিদা বেপর্দায় বেড়ান লইয়া স্বামীর সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, খুলিয়া বলিল। আনোয়ারা শুনিয়া বলিল, "জয় ত তোমারই, তবে ভয়ের কারণ কি ? হামিদা কহিল, "আমি তোমার ডাক্তার সাহেবকে স্বামী মনে করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া সে জিভ কাটিল। কিন্তু কথাটি সইকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে বলিয়া কহিল, "তিনি যখন আমাদের খিড়কী-দ্বারে অনাবৃত মস্তকে তোমার সাথে কথা বলিতে দেখিলেন, তখন ভয় না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ বেপর্দায় বেড়াই না বলিয়া বিবাহের দিন তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছি, এমতাবস্থায় বেপর্দায় দেখিয়া তিনি নিশ্চয় আমাকে অবিশ্বাস করিবেন, তাই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।"

আনোয়ারা স্মিতমুখে কহিল, এদিকে বেপর্দায় চলিয়া—ওদিকে চলি না বলিয়া স্বামীর বিশ্বাস জন্মান কি প্রবঞ্চনা নয় ?

হামিদা। যদি প্রবঞ্চনা হয়, তবে তুমিও এ প্রবঞ্চনার জন্য দায়ী।

আনো। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ?

হামিদা। তোমাকে এক দণ্ড না দেখিলে, তোমার সহিত কথা না বলিতে

পারিলে আমি যে থাকিতে পারি না। সেদিন ভোরে যখন তোমাকে তোমাদের বাড়ীতে পাইলাম না তখন খুঁজিতে খুঁজিতে তোমাদের খিড়কীর ঘাটে উপস্থিত হই। তখন হইতেই এ অসুখ, এ অশান্তি।

আনো। এরূপ স্থলে তোমার প্রবঞ্চনা-পাপের অংশভাগিনী হইতে রাজী আছি। কিন্তু সই! বিধির বিধান সেরূপ নয়; তাহা হইলে দস্যু নিজাম আউলিয়া হইতে পারিতেন না।

হামিদা। নিজাম আউলিয়ার কথা কিরূপ?

আনো। তোমার পিতা একদিন আমাদিগকে উক্ত মহাত্মার বিবরণ শুনাইয়াছিলেন। নিজাম প্রথমে ভীষণ দস্যু ছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, রোজ একটি করিয়া খুন না করিয়া পানি স্পর্শ করিবেন না। একদিন তিনি শাহ ফরিদকে খুন করিতে উদ্যত হন। তাপসশ্রেষ্ঠ ফরিদ নিজামকে বলেন, 'তুমি নরহত্যা করিয়া যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া থাক, তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা তোমার এই মহাপাপের ভাগী হইবে কি না? এমন কথা নিজাম জীবনে কখনও শুনেন নাই। হঠাৎ তার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি দ্রুতপদে যাইয়া পরিজনদিগকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা কহিল, একজনের পাপের জন্য অন্যের কি শাস্তি হয়? এই কথায় নিজামের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। অতঃপর তিনি সৎসঙ্গে থাকিয়া অশেষবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

হামিদা। তবে সই, আমার এই প্রবঞ্চনা-পাপের প্রায়চিত্ত কিরূপে হইবে?

আনো। তুমি সয়ার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া বা মিথ্যা না বলিয়া সব খুলিয়া বলিবে।

হামিদা। তাহাতেই কি আমার দোষের প্রায়চিত্ত হইবে?

আনো। হাঁ, তাহাই যথেষ্ট।

হামিদা। তিনি যদি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, বা আমার সহিত কথা না বলেন?

স্বামীর অবহেলা কল্পনা করিয়া মুগ্ধা হামিদার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

আনো। তুমি ত' এমন দোষ কর নাই—যাহাতে তিনি তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন বা তোমার সহিত কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন।

তথাপি তিনি যদি অবস্থা বুঝিয়া ঐরূপ কোন ভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তুমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবে,আর তাঁহার নিকট যাইবে না, কথাও বলিবে না। কিন্তু দূরে থাকিয়া যতদূর পার তাঁহার স্নান, আহার, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি করিবে না। এইরূপ করিলে সয়া যখন নির্জনে বসিয়া তোমার অভাব মনে করিবেন, তখন বিবেক তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবে। সামান্য কারণে নিদারুণ উপেক্ষার জন্য অনুতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে কশাঘাত করিতে থাকিবে। তখন উল্‌টা-পালা আরম্ভ হইবে।

এই বলিয়া আনোয়ারা হাসিতে লাগিল।

হামিদা। লোকে কথায় বলে—'কারো সর্বনাশ, কারো মনে মনে হাস।' সই, তোমার দেখিতেছি তাই।

আনো। উল্‌টা পালার ফল মনে ভাবিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিনা।

হামিদা। সই, উল্‌টা পালা কেমন?

আনো। অর্থাৎ—তখন তোমার মান ভাঙ্গাইতে সয়ার যে আমার প্রাণান্ত উপস্থিত হইবে!

হামিদা। আমি মান চাই না। তিনি সরল মনে দাসীর সহিত কথা বলিলে হাতে স্বর্গ পাইব।

আনো। তর্কস্থলে ঘটনা যতদূর দাঁড়াইল, আসলে ততদূর গড়ান সম্ভব নয়। কারণ, তোমার প্রবঞ্চনা ত' হৃদয়ের নহে, বাহিরের ঘটনার জন্য। আর বেপর্দা ভাবও ত' তেমন কিছু হয় নাই। প্রয়োজনবশতঃ আমরা অনেক সময় খিরকীর দ্বারে আসিয়া থাকি। তবে তিনি (ডাক্তার সাহেব) যে আমাদিগকে কিছু অসাবধানভাবে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাই দোষের কথা হইয়াছে। যাহা হউক, সয়া যদি তোমাকে এ-পর্যন্ত না চিনিয়া থাকেন, তবে তোমাদের উভয়েরই পোড়াকপাল বলিতে হইবে।

হামিদা আনোয়ারার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "সই, তোমার ত' বিবাহ হয় নাই, তবে তুমি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে এত কথা কি করিয়া জান?"

আনো। দাদিমার মুখে গল্প শুনিয়া, আর আমার মা ও মামানীদিগের ব্যবহার দেখিয়া।

এই সময় আনোয়ারার দাদিমা তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কথোপ-কথনের স্রোত প্রতিহত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েক দিবস পর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় নুরল এসলাম আনোয়ারাকে পুনরায় দেখিতে আসিলেন। এই সময়ে পুরুষ মানুষ কেহই তাহাদের বাড়ীতে ছিল না। বাদশা রামনগর স্কুল হইতে এখনও ফিরে নাই, চাকরাণীরা ঢেঁকি-শালে। গতকল্য আজিমুল্লাহ আসিয়া তাহার ভগিনী গোলাপজানকে লইয়া গিয়াছে। এখন কেবল আনোয়ারা ও তাহার দাদিমা উপস্থিত। ভূঞা সাহেব কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। আমরা কিন্তু জানি,—পরম স্ত্রৈণ ভূয়া সাহেব আজিমুল্লার বাড়ীতে গিয়াছেন। আনোয়ারার সহিত যাহাতে আজিমুল্লার পুত্রের বিবাহ হয়, তাহার পাকাপাকি বন্দোবস্তের নিমিত্ত চতুর আজিমুল্লা ভগিনীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে, ভূঞা সাহেবও তথায় উপস্থিত। আজিমুল্লা ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নানাবিধ সুখ-সুবিধার প্রলোভনে বশীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

নুরল এসলাম বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভূঞা সাহেব বাড়ী আছেন?" আনোয়ারার দাদিমা বৈঠকখানা ঘরের আড়ালে থাকিয়া কহিলেন, "আপনি বসুন, খোরশেদ সকাল বেলায় কোথায় গিয়াছে। যাইবার কালে বলিয়া গিয়াছে, আজ ডাক্তার সাহেব আসিতে পারেন। তিনি আসিলে নৌকার লোকজনসহ তাঁহাকে জিয়াফৎ করিবেন, আমি সত্বর বাড়ী ফিরিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আবার কহিলেন, "আমার অনুরোধ আপনি মেহেরবাণী করিয়া নৌকার লোকজনসহ গরীবখানায় বৈকালে জিয়াফত কবুল করুন।" ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "জিয়াফতের আবশ্যক কি? আগে আপনার নাতিনীর কুশল সংবাদ বলুন।" বৃদ্ধা কহিলেন, "আপনার চিকিৎসার গুণে, আল্লার ফজলে নাতিণী আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা আনোয়ারার ঘরের সম্মুখে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আনোয়ারা দাদিমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'ডাকিলেন কেন?"

বৃদ্ধা। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন, তাঁহাকে বৈকালে জিয়াফৎ করিলাম, এখন পাকের যোগাড়ে যাও আজ তোমাকেই রান্না করিতে হইবে।

শিশির-মুক্তাখচিত নববিকশিত প্রভাতকমল বলাবাকিরণোদ্ভিন্ন হইলে যেমন সুন্দর দেখায়, আনোয়ারার মুখ-পদ্ম এই সময় তদ্রূপ দেখাইতেছিল।

প্রবীণা দাদিমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইলে আনোয়ারাকেই পাক করিতে হইত। সে এক্ষণে পাকের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রান্না করিব?"

বৃদ্ধা। ঘরে পোলাওয়ের চাল আছে, ঘি-মশলা সবই আছে।

আনো। তরকারি কি দিয়া হইবে?

বৃদ্ধা নাতিনীর মন বুঝিবার জন্য কহিলেন, "তোর টগর-জবা দুইটা দে। তোর বাপ বাড়ী আসিলে কিছু দাম লইয়া দিব।" টগর ও জবা আনোয়ারার স্নেহপালিত দুইটি খাসি মোরগের নাম। আনোয়ারা স্মিতমুখে কহিল, "দাম যদি দাও তবে পঁচিশ টাকার কম লইব না।" বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া কহিলেন, "যিনি বিনামূল্যে প্রাণ রক্ষা করিলেন, তাঁহারই জন্য মোরগ চাহিলাম, সেই মোরগের দাম অত টাকা চাহিলি? এই বুঝি লেখাপড়া শিক্ষার ফল? উপকারীর উপকার স্বীকার করা বুঝি এইরূপেই শিখিয়াছিস? আনোয়ারা কহিল, তুমিই ত প্রথম দাম দিতে চাহিয়াছ। নচেৎ দুই-দশ মোরগ কেন, উপকারীর প্রত্যুপকারে জান দিতে পারি।" আনোয়ারা নবানুরাগে আত্মহারা হইয়া এই প্রথম অসাবধানে কথা কহিল। বৃদ্ধা কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি, এখন পাকের যোগাড়ে যাও।" আনোয়ারার তখন চৈতন্যোদয় হইল, সে দাঁতে জিভ কাটিয়া সরমে মরমর হইয়া গেল। দাদি-নাতনীর কথা-বার্তা অনুচ্চরবে হইতেছিল—তথাপি নুরল এসলাম তাহা শুনিতে পাইলেন। আনোয়ারার শেষ কথা তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থল অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব সুখরস সিঞ্চনে বিভোর হইয়া ধীরে ধীরে নৌকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে ভূইয়া সাহেব বাড়ী আসিলেন। আনোয়ারার মোরগদ্বয় জবেহ করিয়া পোলাওয়ের আয়োজন হইল; তালুকদার সাহেবকেও দাওয়াত করা হইল। রাত্রিতে নৌকার লোকজনসহ নুরল এসলাম ভূইয়া সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। তৃপ্তির সহিত সকলের ভোজন ক্রিয়া শেষ হইল। আহারান্তে গল্পগুজব চলিল। তালুকদার সাহেব ও নুরল এসলামের পরস্পর বাক্যালাপে আনোয়ারার দাদিমা বাড়ীর মধ্য হইতে নুরল এসলামের যাবতীয় পরিচয় ও

অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং জানিয়া তিনি যেন এক ভবিষ্যৎ আশার আলোক সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

আহারান্তে নুরল এসলাম নৌকায় আসিলেন। পাচক নৌকায় যাইয়া কহিল, "পাকের বড়াই আর করিব না এমন পোলাও-কোর্মা জন্মেও খাই নাই। আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম; আজ তাহা পেটে গেল।" খানসামা কহিল, "খুব বড় আমীর ওমরাহ লোকের বাড়ীতেও এমন পাক সম্ভবে না।" নুরল এসলাম কহিলেন, "তোমাদের কথা অতিরঞ্জিত বলে বোধ হয় না; পাক বাস্তবিকই অনুপম হইয়াছিল।"

প্রাতে নামাজ ও কোরান পাঠ শেষ করিয়া নুরল এসলাম বিদায়ের জন্য ভূইঞা সাহেবের বাড়ীর উপরে আসিলেন। ভূইঞা সাহেব ১০টি টাকা তাহার হাতে দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন; "আপনার চিকিৎসার মূল্য দেওয়া আমার অসাধ্য। কিন্তু ঔষধের মূল্যবাবদ এই সামান্য কিছু গ্রহণ করুন।" নুরল এসলাম কহিলেন, "আমি চিকিৎসা করিয়া টাকা লই না, পূর্বেই বলিয়াছি।" ভূইঞা সাহেব কহিলেন, "ইহা না লইলে মনে করিব অযোগ্যজ্ঞানে গ্রহণ করিলেন না। তাহা হইলে আমার অসুখের সীমা থাকিবে না। নুরল এসলাম কহিলেন, "আপনি টাকা দিলে আমি শতগুণে অসন্তুষ্ট হইব।" ভূইঞা সাহেব অগত্যা নিরস্ত হইলেন। ভূইঞা সাহেব ও তাঁহার মাতাকে সালাম জানাইয়া নুরল এসলাম বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় তালুকদার সাহেবকেও সালাম করিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে আনোয়ারা অনেক সময় নির্জনে অশ্রুমোচন করিয়া অনিদ্রায় কাল কাটাইতে লাগিল। ফলতঃ জলন্ত অগ্নির উত্তাপে নববিকশিত কদলিপত্র যেরূপ বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়, সৌন্দর্য প্রতিমা বালিকা সেইরূপ নবীভূত ভাবান্তরে কৃশ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল। হামিদা সইয়ের মনের ভাব বুঝিয়া আশ্চর্য হইল, নির্জনে তাহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিল। আনোয়ারার দাদিমাও পৌত্রীর ভাবান্তর উপলব্ধি করিলেন। তিনি এক সময় পরিহাসচ্ছলে কহিলেন "কি লো! ডাক্তারের বিচ্ছেদে পাগল হইবি নাকি?" আনোয়ারা মলিন মুখে নিরুত্তর রহিল।

আনোয়ারার পিতামহ আরবী-ফারসী বিদ্যায় প্রসিদ্ধ মুন্সী ছিলেন। বর্তমান সময়ে মৌলভী নামধারী সাহেবেরা জ্ঞান-গরিমায় বিদ্যা-বুদ্ধিতে সে-সময়ের মুন্সী সাহেবানদের শিষ্যগণের তুল্য-মূল্যও অনেকে বহন করেন না। যাহা হউক, আনোয়ারার দাদিমা, আনোয়ারার বয়সেই মুন্সী সাহেবকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের বিবাহ পরস্পর পবিত্র প্রণয়সূত্রে সংঘটিত হয়। তাঁহাদের এই বৈবাহিক জীবন যেরূপ সুখের হইয়াছিল, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। স্বামীর গুণে আনোয়ারার দাদিমা আরবী-ফারসী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হন। সুতরাং বিদ্যার অমৃত আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন। সংসারের অবস্থাও তাহাদের খুব স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু চির-সুখ-সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। বৃদ্ধার অর্ধেক বয়সে তাঁহার স্বামী এবং দুই পুত্র ও দুই কন্যা কালের কবলে পতিত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রবধু (আনোয়ারার মাতা) লোকান্তরে গমন করেন। কেবল মাত্র পুত্র খোরশেদ আলী ও পৌত্রী আনোয়ারা বৃদ্ধার শেষ জীবনের অবলম্বন হয়। বৃদ্ধা স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধুর অসহ্য শোক শান্তির জন্য আনোয়ারাকেই অন্ধের যষ্টির ন্যায় বোধ করেন এবং স্বকীয় উন্নত হৃদয়ের স্নেহরাশি পৌত্রীতে ঢালিয়া দিয়া সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী হন। ফলতঃ তাহাকে বৃদ্ধার অদেয় কিছুই ছিল না।

একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া বৃদ্ধা ডাক্তার সাহেবের প্রতি নাতনীর অনুরাগ

প্রকৃত কিনা, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, "আনার শুনিলাম—তোর বাপ ফয়েজ উল্লার সহিত তোর বিবাহ বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমি ঐ বিবাহ ভালই মনে করি। দুই তিন হাজার টাকার সম্পত্তি, পনর শত টাকার গহনা ও নগদ পনর শত টাকা পাবি, ফয়েজ উল্লাও তোর যোগ্য পাত্র হইবে।" আনোয়ারা শুনিয়া কোন উত্তর করিল না, বিরক্তির সহিত পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

বৃদ্ধা। কি লো। বিয়ের কথা শুনিয়া যে মুখ ফিরালি?

আনোয়ারা দেখিল, তাহার সহিত, কথা না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন; তাই সে কহিল, "ও কথা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি।"

বৃদ্ধা। কবে, কার কাছে শুনিয়াছিস্?

আনো। যেদিন আমি ব্যারামে পড়ি সেইদিন সইয়ের নিকট শুনিয়াছি।

বৃদ্ধা। তাই শুনিয়াই বুঝি মরিতে বসিয়াছিলি? এতদিন বলিস নাই কেন?

আনো। বলিবার কথা হইলে বলিতাম।

বৃদ্ধা। ও বিবাহে তবে তোর মত নাই?

আনোয়ারা নিরুত্তর। বৃদ্ধা আবার কহিলেন, "আচ্ছা তোর বাপ ত' ঐ বিবাহ দেওয়াই ঠিক করিয়াছে। এখন তুই কি করিবি?"

আনোয়ারার কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, সে অনেক কষ্টে ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল," তুমি বাধা দিবে না?"

বৃদ্ধা। তোর বাপ ত, আমার কথা শুনে না। বাদশার মা যা বলে তাই সে করে।

আনোয়ারা কহিল, "আর একজন ঠেকাইবে।"

বৃদ্ধা। কে সে?

আনোয়ারা। আমরা ওজু করিয়া এক্ষণে যার নাম করিলাম।

দাদি-নাতনী এবার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। পুণ্যশীলা বৃদ্ধা আনোয়ারাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আনার, আজ তোর কথায় আমার দেল ঠাণ্ডা হইল। যার নাম করিয়াছিস্ বলিলি, তাঁর প্রতি চিরদিন যেন তোর এরূপ ভক্তি থাকে; সময়ে অসময়ে সকল অবস্থায় তিনিই তোকে রক্ষা করিবেন; তিনিই তোর সহায় হইবেন, তিনিই তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।

এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ডাক্তার সাহেবের সহিত তোর বিবাহের প্রস্তাব করিলে কেমন হয় ?"

আনোয়ারা ইহাতেও কোন উত্তর করিল না, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের নামে তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। আরাধ্য প্রিয়জন প্রতি অকৃত্রিম-প্রেম-প্রযুক্ত তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল; কণ্ঠনালী জড়ীভূত হইয়া আসিল; তাহার গোলাপ গণ্ডদ্বয়ে ও ইন্দ্রবর-নিন্দিত নয়নদ্বয় লজ্জার আভা প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল। অস্পষ্ট দীপালোকে বৃদ্ধা নাতিনীর এই দিব্যলাবণ্যময়ী মূর্তি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার সঘন নিশ্বাস ত্যাগে ও জড়সড় ভাবে বুঝিতে পারিলেন, ডাক্তার সাহেবের নামে মেয়ের হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি পরিহাস করিয়া কহিলেন, "কি লো, ডাক্তার সাহেবের নাম শুনিয়াই যে দশা ধরিল। কথা বলিস্ না কেন ?

আনোয়ারা জড়িতকণ্ঠে কহিল, "কি বলিব ?"

বৃদ্ধা। ডাক্তারের সহিত বিবাহ দিলে তুই সুখী হইবি ?

আনোয়ারা বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাদিমা, দেখ, জানালার পাশে কি সুন্দর চাঁদের আলো আসিয়াছে।" ঐ সময় সওয়ালের চাঁদের কিরণে রাত্রি দিনের মত দেখাইতেছিল। প্রবীণা বৃদ্ধা পৌত্রীর চতুরতা বুঝিয়া কহিলেন, "আ-লো ! চাঁদের আলো যদি ডাক্তার হইত, তাহা হইলে বুঝি হাত ধরিয়া ঘরে তুলিতি। আনোয়ারা মৃদুহাস্যে বৃদ্ধার গা টিপিয়া দিল। এইরূপ রসালাপ-প্রসঙ্গে বৃদ্ধা তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। আনোয়ারাও নিদ্রিত হইল।

বৃদ্ধা, নুরল এস্‌লামকে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে এবং নাতিনী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে বুঝিয়া ভাবিলেন, 'এইরূপ অবস্থায় পাত্র বিবাহ স্বীকার করিলে, এই বিবাহে নাতিনী আমার চিরসুখী হইতে পারিবে।' এ নিমিত্ত তিনি এই বিবাহ সংঘটনমানসে অতঃপর বিধিমত চেষ্টায় উদ্যোগী হইলেন।

বিবাহ-পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ ২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। আনোয়ারাকে দেখিবার ও তাহার বিবাহের লগ্নপত্রাদি স্থির করিবার জন্য আবুল কাসেম তালুকদার, জব্বার আলি খাঁ প্রমুখ ২০।২৫ জন ভদ্রলোক লইয়া আজিমুল্লা ভূইঞা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে লোকজন আসিয়াছে, তাই গোলাপ জান আজ পরমানন্দে তাহাদের নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত। এই সময় তাহার আদেশে একজন দাসী কুপের পারে পানি আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু পুর্ণ কলসী উত্তোলন কালে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া তাহা কুপ মধ্যে ডুবিয়া গেল, দাসী অপ্রতিভ হইয়া কুপের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এ ঘটনা অল্প সময়েই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এই বিবাহে আনোয়ারার দাদিমার সম্পূর্ণ অমত পূর্ব হইতেই ছিল। অর্থ লোলুপ ভুইঞা সাহেব জননীর পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার মত গ্রহণের চেষ্টা করেন ; শেষে অসমর্থ হইয়া বলেন, মা, তুমি এ বিবাহে মত না দিলে আমাকে আর মধুপুরে দেখিতে পাইবে না।" একমাত্র পুত্র, তাই মায়ের প্রাণ পুত্রের কথায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, পুত্র হয় আত্ম হত্যা করিবে,না হয় দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। পুত্রস্নেহাকর্ষণে তখন বৃদ্ধার পৌত্রী বাৎসল্য শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এই বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা-বিঘ্ন না দিয়া ম্রিয়মানা হইয়া রহিলেন। এক্ষণে উপস্থিত দুর্ঘটনায় পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "খোরসেদ! শুভক্ষণে কুয়ার কলসী ডুবিল, সুতরাং এ বিবাহে আর কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। এখনও বলিতেছি, এই বিবাহদানে নিরস্ত হও।" মায়ের কথায় পুত্রের মনে অমঙ্গলের ছায়া পড়িল বটে ; কিন্তু তিনি স্ত্রী ও সম্বন্ধীর মনস্তুষ্টির জন্য ও অর্থলোভে কহিলেন, "মা, তোমাদের ও-সব মেয়েলী কথার কোন মূল্য নাই। দড়ি ছিঁড়িয়া কুপে কি আর কখনও কলসী ডুবে না ?" মা একান্ত ক্ষুদ্ধ হইয়া আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না।

এদিকে ষোড়শোপচারে পাত্রপক্ষকে নাশতা খাওয়ান হইল। আহারান্তে তাহারা পান-তামাক ধ্বংস ও নানাবিধ গল্প-গুজবে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহ

সম্বন্ধে কথাবার্তাও ২।১ জন ফুসফাস ইশারা-ইঙ্গিতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে কহিতে লাগিলেন। কিন্তু কাল কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, তাহার অপরিবর্তিত নিয়মে সূর্য মধ্যগগন ত্যাগ করিয়া ক্রমে পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িল। এই সময় ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল, তৎসংঙ্গে গগনের বিশাল বক্ষ হইতে গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি হইতে লাগিল, বাতাস অল্পে অল্পে বহিয়া ক্রমশঃ প্রবলবেগ ধারন করিল, শেষে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়া দিল। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল ; কিন্তু গর্জন যেরূপ হইল বর্ষণ সেরূপ হইল না। ঝঞ্ঝাবাতে সুযোগ পাইয়া লঘু সুক্ষ্ম বারিধারা আছড়াইয়া আছড়াইয়া দিগন্তে ছড়াইতে লাগিল। সঘন-বিকশিত বিদ্যুৎ-বিভায় লোক-লোচনের অশান্তি ঘটাইয়া তুলিল। দুর্বিসহ যন্ত্রনায় নারকীয় চিৎকারের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া চড় চড় কড় কড় শব্দ হইতে লাগিল। লোকে মনে করিল এইবার বুঝি মাথায় বাজ পড়ে। দুর্যোগ থামিল না ; বৃষ্টি, বায়ু ও বিদ্যুৎ মিলিয়া মিশিয়া প্রকৃতিকে ক্রমশঃ অস্থির করিয়া তুলিল। গাছ-পালা তরণী-আরহী প্রভৃতি উলট পালট খাইতে লাগিল। সহসা একটা বজ্র ভুইঞা সাহেবের বাড়ীর উপর পড়িল। ভীষণ অশনিপাতে বাটীস্থ সকলের কানে তালা লাগিল। আনোয়ারা তাহার দাদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভূইঞা সাহেবের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল ; তিনি সভয়ে তথাপি সকলকে কহিলেন, "ভয় নাই।" পরক্ষণে দেখা গেল, তাঁহার গো-শালার চালে আগুন ধরিয়াছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আগুন নিভাইতে যাইয়া দেখিলেন, ভূইঞা সাহেবের পালের প্রধান গরুটি মরিয়া গিয়াছে, পাশের আরও ২।৩টি গরু ও একটি ছোট রাখাল বালক আধপোড়া হইয়া মৃতবৎ অজ্ঞান রহিয়াছে। এই রাখাল-বালকটি বৃষ্টির প্রারম্ভ গো-শালায় গরু দিয়া বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় সেখানেই বসিয়াছিল। পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল, ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরের আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন। সকলে বালকটিকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বহু কষ্টে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টি হওয়ায় ভূঞা সাহেবের অন্যান্য ঘরগুলি আগুনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল।

শুভ বিবাহের প্রস্তাবদিনে উপর্যুপরি দুইটি অশুভজনক ঘটনা ঘটিল দেখিয়া ভূইঞা সাহেব কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, বিবাহ দেওয়ার দৃঢ়সংকল্প শিথিল হইয়া আসিল ; সন্দেহের গাঢ় ছায়ায় তাঁহার অর্থলুব্ধ হৃদয় সমাছন্ন হইল। তিনি একান্ত বিমর্ষ-চিত্তে মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে দেখিয়া মা কহিলেন,

"খোরশেদ! তুমি আমার কথা শুনিতেছ না, এ বিবাহে তোমার সর্বনাশ হইবে।" ভূঞা সাহেব কহিলেন, "মা সর্বনাশের আর বাকী কি? আমার দারগা (গরুর নাম) মরায় আমি দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি। সেই গোধনই আমার ঘরে বরকত আনিয়াছিল।" এই বলিয়া ভূইঞা সাহেব বালকের ন্যায় চোখের পানি মুছিতে লাগিলেন। মা নিজ অঞ্চলে পুত্রের চোখ মুছিয়া দিয়া কহিলেন, 'বাবা, সাবধান হও, তোমার পিতা বলিতেন—'নীচ বংশে কন্যা আনিলে যত দোষ না হয়, নীচ ঘরে মেয়ে বিবাহ দেওয়ায় তাহা অপেক্ষা বেশী দোষ।' তোমার পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া চল; বিবাহের কথা আর মুখেও আনিও না, আমি দেখিয়া শুনিয়া সত্বরই ভাল ঘরে ভাল বরে—আমার আনারকে সমর্পণ করিতেছি। ভূঞা সাহেব মাতার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে প্রকৃতি শান্ত হইল। পাত্রপক্ষকে কোন প্রকারে আহার করান হইল। তাঁহারা ভুইঞা সাহেবের বিমর্ষভাব দেখিয়া ও আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তখন যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকারান্তরে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল, ভুইঞা সাহেব হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আনোয়ারার দাদিমা বিবাহভঙ্গে উপস্থিত বিপদেও খোদাতায়ালার নিকট শোকর-গোজারী করিতে লাগিলেন। গোলাপজান বড় আশায় নিরাশ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে হামিদা একখানা চিঠি হাতে করিয়া আনোয়ারার নিকট আসিয়া বসিল এবং কহিল, "সই হাদিসের একটি উপদেশ বাবাজানের মুখে শুনিয়াছিলাম 'আল্লা যখন যাহা করেন, সবই নর নারীর মঙ্গলের নিমিত্তই করিয়া থাকেন।' তোমার বিবাহভঙ্গ এই মহতী বাণীর এক জলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাজ পড়িল, ঘর পুড়িল, গো-শালায় গরু মরিল, কূপে কলসী ডুবিল, ইহা তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে চাচাজানের যেরূপ মতিগতি তাহাতে কালই তোমাকে দোজখে নিক্ষেপের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতেন। দেখ তোমার সয়া কি লিখিয়াছেন।" এই বলিয়া হামিদা চিঠিখানির উপরের ৪ লাইন ও নীচের ৩ লাইন ভাঁজ করিয়া নীচে ফেলিয়া মধ্যাংশ সইকে পাঠ করিতে দিল। আনোয়ারা হাসিয়া কহিল, "যদি সমস্ত চিঠি আমাকে পড়িতে না দাও তবে আমি উহা পড়িব না।" সরল প্রকৃতির সই যে এমন প্যাঁচের কথা বলিবে, হামিদা মোটেই চিন্তা করে নাই, তাই হঠাৎ ফাঁপরে পড়িল। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "যদি তুমি ভাঁজ করা নীচের অংশদ্বয় মনে মনে পড়িয়া অবশিষ্ট অংশ বড় করিয়া পাঠ কর, তবে সব চিঠি তোমাকে পড়িতে বলি।" আনোয়ারা তথাস্তু বলিয়া চিঠিখানি হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। উপরের ৪ লাইনে লেখা ছিল, "প্রাণের হামি, তোমার ১৬ই ভাদ্রের পত্র পাইয়াছি। আমার বাড়ী পৌঁছিবার ৩।৪ দিন পূর্বে বোধ হয় তুমি বেল্‌তা আসিবে। যাহা হউক, তোমার সহিত সম্মিলন সুখের আশায় হৃদয়ে যে উল্লাসলহরী খেলিতেছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতে ভাষা পাইলাম না।" উপরের এই অংশ আনোয়ারা মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিয়া মুখ ফুটিয়া পড়িয়া ফেলিল। তাহার পরের অংশ আবার বড় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াই মনে মনে পড়িতে লাগিল। হামিদা কহিল, "সই, ও কি? পরের বেলায় উচ্চভাষে, নিজের বেলায় চুপটি আসে। মনে মনে পড়িলে ছাড়িব না, বড় করিয়া পড়িয়া যাও।" আনোয়ারা বাধ্য হইয়া পড়িতে লাগিল, "যাহা হউক, প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে তোমার সইয়ের ভাল ঘরে ভাল বরে বিবাহ দিবার অনুরোধ করিয়া আসিতেছ ; আমিও এক-

প্রাণে তাঁহার যোগ্য বর খুজিতেছি ; কিন্তু তোমার অস্বকার পত্রে তাঁহার বিবা-হের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। যদি চাচাজান অর্থলোভে এ বিবাহ দেন, তবে একটি বেহেস্তের হুরকে দোজখে ডুবান হইবে। অতএব এ বিবাহ যাহাতে না হয়, তোমরা বাবাজানকে (শ্বশুরকে) বলিয়া তাহা করিবে। আমি বাড়ী পৌঁছিয়া মধুপুরে যাইয়া সব গোল মিটাইয়া দিব এবং খোদাতায়ালা সালামতে রাখিলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—যেরূপে পারি তোমার সইয়ের—" এই পর্যন্ত পড়িয়া আনোয়ারা উঠিবার চেষ্টা করিল, হামিদা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাও কোথা ? পত্রের সকল কথা পড়িয়া শুনাইতে হইবে।" আনোয়ারা লজ্জিতাননে ছোট গলায় পড়িল, 'প্রাণচোরা' পুরুষ-বর আনিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হাজির করিব। তুমি লিখিয়াছ তোমার সইয়ের হৃদয়-দেবতা ঠিক এই গরীব বেচারার চেহারাবিশিষ্ট! এইরূপ হইলে তোমার প্রাণ উড়িবার কথাই বটে! আমার ভয় হইতেছে, যদি তোমার উড়া-প্রাণপাখী আবাসে না ফিরিয়া সইয়ের প্রাণ-চোরার হৃদয়ে বাসা লয়, তবে যে আমি নিরুপায়—পথের কাঙ্গাল! যাহা হউক, আমার নিকটে তোমার প্রবঞ্চনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু সই তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে—" আবার আনোয়ারার মুখ বন্ধ হইয়া আসিল, হামিদা কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে বলিল, "সব পত্র পড়িবে কথা দিয়াছ, অঙ্গীকার ভঙ্গের গোনার ভয় নাই ?" আনোয়ারা অত্যন্ত লজ্জার সহিত ভাঙ্গা গলায় পড়িতে লাগিল, "সাধারণ মানবকন্যা বলিয়া মনে হয় না ; কোন সুরবালা ভ্রমক্রমে মর্ত্যে নামিয়া মধুপুর আলোকিত করিয়াছে। তুমি বহু পুণ্যফলে তাঁহাকে সখীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার সহিত আমিও ধন্য হইয়াছি তাঁহাকে আমার হাজার হাজার সালাম জানাইবে।" এই পর্যন্ত পড়া হইলে হামিদা "ভোলার মাকে একটি কথা বলিয়া আসি" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে আনোয়ারা তাহার অঁাচল চাপিয়া ধরিয়া বড় গলায় পড়িতে লাগিল, "জীবন্ময়ী —আর একটি কথা, আগামী রবিবার অপরাহ্নে ৪টার সময় বাড়ী পৌঁছিব। যাইয়া যেন তোমাকে তোমার ফুলবাগানে উপস্থিত পাই। মনে রাখিও, এবার পুষ্পোৎসবের পালা আমার।

—তোমারই

আমজাদ

পত্রপাঠ শেষ করিয়া আনোয়ারা কহিল, "সই, তুমি বড়ই দুষ্টামি করিয়াছ। এখানকার সব কথা না লিখিলে কি চলিত না ?"

হামিদা। সই, আমি দুই কানে যাহা শুনি, দুই চোখে যাহা দেখি, তাহা তাঁহাকে না জানাইয়া থাকিতে পারি না। কাছে থাকিলে মুখে বলি, দূরে গেলে পত্রে লিখি।

আনোয়ারা। আচ্ছা, তোমাদের পুষ্পোৎসবের পালা কিরূপ?

হামিদার তখন নবনীত-কমল হরিদ্রাভ গণ্ডস্থলে হিঙ্গুলের দাগ পড়িল। আনোয়ারা তাহা লক্ষ করিয়া কথাটি জানার জন্য সইকে বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিল। হামিদা সইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে সলজ্জভাবে কহিতে লাগিল, "গত বাসন্তি পুর্ণিমায় আমার বিবাহের ৩ বৎসর পুর্ণ হইয়াছে, এই সময় মধ্যে আমি স্বামী চিনিয়াছি। তিনি বড়ই পুষ্পপ্রিয়। তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমাদের শয়ন-ঘরের দক্ষিণে খিড়কীর সম্মুখে, আমি নিজ হাতে গাছ পুতিয়া একটি ফুলের বাগান রচনা করিয়াছি। ঐ দিন বাসন্তি চন্দ্রালোকে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে; বাগানে বেল, যুঁই কামিনী, মল্লিকা, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া সৌরভে দিক মাতাইয়া তুলিয়াছে, তিনি ও আমি বাগানমধ্যে সামনা-সামনি দুইখানা চেয়ারে বসিয়া আছি। তিনি আমাকে হজরত রসুলের প্রতি বিবি খোদেজা ও বিবি আয়শার প্রেম-ভক্তির প্রভেদ বুঝাইতেছিলেন; সহসা আমার মগজে খেয়াল আসিল, হায়! এই সুখের বাসন্তী পুর্ণিমায় এমন স্বর্গীয় প্রেম-ভক্তির কথা পতিমুখে আর শুনিতে পাইব কি না কে জানে? তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া ক্রতহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া একটি ফুলের মুকুট ও এক ছড়া মালা তৈয়ার করিলাম। তাঁহাকে বাতাস করিবার নিমিত্ত ফুলের পাখা পূর্বেই তৈয়ার করিয়াছিলাম, ঘর হইতে তাহা আনিলাম। অনন্তর ধীরে ধীরে মুকুটটি তাঁহার মাথায় দিয়া, মালা ছড়া তাঁহার গলায় দিয়া, ফুলের পাখায় তাঁহাকে বাতাস করিলাম। নীরবে স্মিতমুখে তিনি আমার কার্য দেখিতে লাগিলেন। পরে আমি পাখা রাখিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম এবং পাঁচবার পদচুম্বন করিয়া উর্ধ্বহস্তে দাঁড়াইয়া কহিলাম, হে আমার দয়াময় আল্লাহতায়ালা! আজ দাসীর বাসনা পুর্ণ হইল। করযোরে প্রার্থনা করিলাম—প্রভো! আমার ফুলের সম্রাট পতিদেবকে দীর্ঘজীবী কর। আমি যেন প্রতি বৎসর, এই সময় এইরূপে তাঁহার পদসেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি।' সই, ইহাই আমার পুষ্পোৎসব।"

আনোয়ারা হামিদার স্বামী-ভক্তির কথা শুনিয়া তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিল। হামিদা পত্র হস্তে বাড়ী ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামী বাড়ী পৌঁছিবার তিনদিন পূর্বে, হামিদা শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। পূর্বোল্লিখিত পত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট রবিবার বৈকালে, সে খিড়কীর ফুলবাগানে উপস্থিত ছিল। একটু পায়চারি করিয়া নিজ হাতে সে বাগান পরিষ্কার করিতে লাগিল। শরতের ফুটন্ত ফুলগুলি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কটাক্ষে হাসিতে লাগিল। হামিদা রাগ করিয়া তাহাদের কতকগুলিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া অাঁচলে পুরিল। শেষে কামিনী-তলায় বসিয়া তাহাদিগকে নানাভাবে বিন্যাস করিয়া সুন্দর এক খানি পাখা ও একগাছি মোহনমালা রচনা করিল। আশা, পথশ্রান্ত পতিকে পাখার বাতাস করিবে, প্রণয়োপহার স্বরূপ মোহনমালা তাঁহার গলায় ঝুলাইবে। পুষ্পগন্ধে অলিকুল গুন গুন ভন্ ভন্ করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ফুলের পাখায় কেহ বা মোহনমালায় উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিতে লাগিল। হামিদা তখন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময় হঠাৎ তাহার মাথার উপর দিয়া একটি দাঁড়কাক কা—কা—খা—খা—করিতে করিতে উড়িয়া গেল। অমঙ্গলাশঙ্কায় সহসা হামিদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, ‘‘হায়, মন এত উতলা হইতেছে কেন, এমন ত কখনও হয় নাই?’ তাহার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেলা ডুবিল। সাঁজের আলো নিভিয়া গেল; অন্ধকার ঘনাইয়া চোরের ন্যায় বাগানে প্রবেশ করিল। হামিদা তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষন্ন মনে ঘরে প্রবেশ করিল এবং মনের শান্তির জন্য ও প্রোষিত পতির মঙ্গল-কামনায় অজু করিয়া নামাজ পড়িতে বসিল।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় আমজাদ হোসেনের বাড়ী পৌঁছিবার কথা; কিন্তু এতক্ষণে আসিলেন না কেন? হামিদার উদ্বেগ ক্রমশঃ বাড়ীয়া উঠিল, মনের ভাব কাহাকেও খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। যুবতীর এই অবস্থা বড়ই ক্লেশজনক। কিছুক্ষণ পরে হামিদার বড় জা তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “কি লো আছরে ঘরে ঢুকিয়াছিস্ নগরেব অতীত প্রায়, তবু যে বাহির হইতেছিস্ না? ওলো বুঝিয়াছি—

নাগর না আসায় উতলা মন—
রন্ধন ভোজনে কিবা প্রয়োজন?”

হামিদা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিল, 'বুবু, সত্যি আমার মন বড় উতলা হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় নাই। পথে বুঝি কোন বিপদ ঘটিয়াছে?" বড় জা কহিলেন, "মিছে ভাবনায় মন খারাপ করিস না, এখনও আসার সময় যায় নাই, একান্ত যদি আজ না আসে, কাল আসিবে; চল বাহিরে চল।" এই বলিয়া তিনি হামিদার হাত ধরিয়া রান্নাঘরের আঙ্গিনায় লইয়া গেলেন।

রাত্রি দেড় প্রহর, তথাপি আমজাদ আসিলেন না, বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইলেন। হামিদার উৎকণ্ঠা চরমে উঠিল। তাহার মাথার উপর তাহার কানের কাছে—কা—কা—খা—খা—শব্দ হইতে লাগিল। পতির অমঙ্গল ভাবনায় তাহার মনে চিন্তার তুফান ছুটিল, থাকিয়া থাকিয়া গা ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। কেবল প্রকৃতির শাসনে সে নীরব—নির্বাক। বড় জা'র অনেক সাধাসাধি সত্ত্বেও সে অনাহারে শাশুড়ীর নিকট যাইয়া শয়ন করিল; কিন্তু শয্যা কণ্টকময় হওয়ায়, সারারাত্রি তাহার অনিদ্রায় অতিবাহিত হইল। পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় টেলিগ্রাম আসিল, "আমজাদ বেলগাঁও থানার অন্তর্গত রতনদিয়া গ্রামে—নুরল এসলামের বাড়ীতে কলেরায় কাতর। আপনাদের আসা আবশ্যক।" সংবাদ শুনিয়া বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল, হামিদার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ শনিবার অপরাহ্ণ। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। অফিস আদালত, স্কুল-কলেজ, মহাজনী আড়ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে। উকিল-মোক্তার, ছাত্র-শিক্ষক, হাকিম-মুনসেফ, কেরাণী-চাপরাশী প্রভৃতি নানা-শ্রেণীর লোক গৃহে ফিরিবার জন্য প্লাটফরমে উপস্থিত। প্রায় সকল লোকের সহিত ছোট বড় নানা সাইজের নানাবর্ণের ষ্টিলট্রাঙ্ক, ব্যাগ ইত্যাদি। পিতা-মাতা ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্বন্ধী-স্ত্রী, শ্যালিকা, তৎস্য নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের জন্য যথাযোগ্য উপহার দ্রব্যে ট্রাঙ্কাদি পরিপূর্ণ।

আজ টিকিট করা যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যকে বুঝান দায়। আবার রেলগাড়ীতে উঠা তদপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। গাড়ীর বেঞ্চে আজ স্থানের অভাব। কেহ বেঞ্চের নীচে, কেহ ঝুলান বেঞ্চের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ব্যতীত অন্য দুই শ্রেণীর কোন প্রভেদ রহিলনা—তথাপি স্থানের অভাব, তথাপি ঘরমুখো বাঙ্গালী গাড়ীতে উঠিয়া হাসিখুশী গল্পগুজবে মত্ত। ড্রাইভারের ইঙ্গিতে কলের গাড়ী গুরুতর লোকারণ্যবোঝা বুকে করিয়া যথাসময়ে গোসাপের ন্যায় ফোঁস ফোঁস হুস্ হুস্ করিতে করিতে গন্তব্যপথে প্রস্থান করিল।

ইণ্টার ক্লাশ গাড়ীর একটি কামরায় এক বেঞ্চে পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষিভাবে দুইটি যুবক উপবিষ্ট। উভয়ের মাথায় তুর্কী টুপী ; কিন্তু একজন কালো কোট-প্যাণ্ট-ধারী, অন্যজন কালো আচকান ও সাদা পায়জামা পরিহিত। কামরার অধিকাংশ আরোহীর দৃষ্টি উভয় যুবকের উপর পতিত। একজন হিন্দু ভদ্রলোক মুখ ফুটিয়া কহিলেন, 'আপনারা কি যমজ ?" যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, "না"।

হিন্দু। আপনাদের যেরূপ একাকৃতি, উভয়কে বদল দেওয়া চলে ; এমন দুইটি কখনও দেখি নাই।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান কহিলেন, "সব খোদাতায়ালার মরজি ; নইলে,যমজ নয় অথচ এক চেহারা।"যুবকদ্বয় পরস্পরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তৎপর কোটধারী যুবক আচকানধারী যুবককে কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

আ-ধা। বেলগাঁও জুট কোম্পানীর অফিসে।

কোটধারী তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, "আপনি তথায় চাকরী করেন?"

আ-ধা। জি, হাঁ।

কো-ধা। আপনি কি পাটের মরশুমে মফঃস্বলে যান?

আ-ধা। জি, হাঁ।

কো-ধা। গত ভাদ্রমাসে কি মফঃস্বলে গিয়াছিলেন?

আ-ধা। জি।

কো-ধা। কোন্ দিকে গিয়াছিলেন?

আ-ধা। মধুপুর অঞ্চলে।

কোটধারী মনে মনে ভাবিলেন, ইনিই হামির লিখিত আনোয়ারার প্রাণ চোরা পুরুষবর হইবেন।

আ-ধা (স্মিতমুখে) মোয়াক্কেলের নিকট মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া উকিল-মোক্তারেরা যেরূপ বাদী বা আসামীকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আপনার জিজ্ঞাসার ধরন প্রায় সেইরূপই দেখিতেছি। যাহা হউক, আপনি কোথায় যাইবেন?

কোটধারী স্মিতমুখে কহিলেন, "বেলতা"।

যে দিবস রাত্রিতে নুরল এসলাম ভূঞা সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, সেই দিন গল্পগুজব প্রসঙ্গে তিনি তালুকদার সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার জামাতা কলিকাতায় ল-ক্লাসে পড়িতেছেন, বাড়ী বেল্‌তা, নাম আমজাদ হোসেন এবং তাহার চেহারা ঠিক তাঁহারই চেহারার মত। এক্ষণে ভাবিলেন, ইনিই তালুকদার সাহেবের জামাতা হইবেন এবং বোধহয় খিড়কীদ্বারে দৃষ্টা অলঙ্কারাদি পরিহিতা বালিকাই এই মহাত্মার সহধর্মিণী হইবেন; পরন্তু ইহার স্ত্রীই বোধহয় পত্রযোগে ইহাকে সব কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ফলতঃ এইরূপ দৈব-মিলনে, এইরূপ কথোপকথনে মনে মনে একে অন্যকে অনেকটা চিনিয়া লইলেন। তথাপি খাঁটি সত্য জানিবার জন্য আচকানধারী কোটধারীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কলিকাতায় ল-ক্লাসে পড়েন?" কোটধারী রহস্যভাবে কহিলেন, "আপনাকে জ্যোতির্বিদ বলিয়া মনে হইতেছে?"

আ-ধা। জ্যোতির্বিদ্যায় ত' আপনিই প্রথম পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কো-ধা। আমার পাণ্ডিত্য আনুমানিক।

আ-ধা। আমারও তদ্রূপ।

কো-ধা। আচ্ছা, আপনি অনুমানে আরও কিছু বলিতে পারেন কি?

আ-ধা। আপনার নাম আমজাদ হোসেন নয় কি?

কো-ধা। তারপর?

আ-ধা। মধুপুর আপনার শ্বশুরবাড়ী।

কো-ধা। তারপর?

আ-ধা। আনুমানিক গণনায় আর কিছু পাইতেছি না।

কো-ধা। অল্পদিন হইল আমিও কিছু গণনা বিদ্যা শিখিয়াছি' পরীক্ষা করিবেন কি?

আ-ধা। (হাসিয়া) তাহা হইলে আমার অদৃষ্ট বর্ণনা করুন দেখি?

কো-ধা। আপনার নাম নুরুল এস্‌লাম, আপনি এখনও অবিবাহিত।

আ-ধা। তারপর?

কো-ধা। সম্প্রতি আনোয়ারা নাম্নী এক বেহেস্তের হুর মধুপুর আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে।

এইটুকু বলিয়া কোটধারী আচকানধারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ আবেগ উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে। তিনি সেই অবস্থায় কহিলেন, "তারপর?"

কো-ধা। আপনি সেই বেহেস্তের হুরকে কোরান পাঠে মুগ্ধ করিয়া, চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়া বিবাহের পূর্বেই তাহার সরল মনটি চুরি করিয়া আনিয়াছেন। এখন বাকী তাহার লাবণ্যভরা দেহখানি। বোধহয়, এখন সেইটা পাইলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

আ-ধা। (লজ্জিতভাবে) আপনি সত্য গণক; খোদার ফজলে আপনার গণনা সফল হউক।

কো-ধা। গণনা খোদার ইচ্ছায় নিশ্চয়ই ফলিবে।

আ-ধা। (স্মিতমুখে) আপনার গণনা বিদ্যার গুরু কে?

কো-ধা। (স্মিতমুখে) নাম প্রকাশ নিষেধ আছে।

আচকানধারী এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রীই পত্রযোগে সব কথা তাঁহাকে জানাইয়াছেন।

উল্লিখিতরূপে বৃহস্তালাপে ক্রমে উভয়ের প্রকাশ্য পরিচয় হইয়া উঠিল। পরিচয়ে হৃদ্যতা জন্মিল।

এই সময়ে হঠাৎ নবপরিচিত যুবক যুগলের বিশ্রান্তালাপের মধ্যেএক বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। গাড়ীতে কোটধারী অর্থাৎআমজাদ হোসেনের উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দিল। বিশেষ ভাবনার কথা। তখন কলিকাতা অঞ্চলে কলেরার খুব বাড়াবাড়ি। আচকানধারী নুরুল এস্‌লাম চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবার বাক্স পুরিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়াছেন। ট্রাঙ্ক হইতে রুবিনীর ক্যাম্পার বাহির করিয়া এক দাগ আমজাদকে সেবন করাইলেন। রাত্রি ৩॥ টার সময় রেলের মধ্যে আর একবার দাস্ত হইল। নুরুল এস্‌লাম আরও একদাগ ক্যাম্পার দিলেন। ভোরে উভয়ে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে নামিলেন। নামিবার পর রাস্তায় আমজাদের অত্যন্তবমি হইল, এবার তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। নুরুল তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ষ্টীমারে তুলিনে এবং নীচের তলায় সুবিধামত স্থান লইলেন।

নুরুল এস্‌লাম কোম্পানীর কার্যে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, কার্য শেষ করিয়া বেলগাঁও যাইতেছিলেন। আমজাদ পুজার ছুটিতে বাড়ীতে চলিয়াছেন।

আমজাদকে ষ্টীমারে লইয়া গিয়া নুরুল এস্‌লাম, বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে ষ্টীমারে আর একবার মাত্র দাস্ত হইল ; কিন্তু পেটে বেদনা ধরিয়া উঠিল। সম্মুখে নুরুল এস্‌লামের নামিবার ষ্টেশন। আমজাদকে প্রায় সমস্ত দিন রাস্তায় কাটাইতে হইবে। তখন বেলা ১০টা। নুরুল এস্‌লাম ভাবিলেন, ইনি যেরূপ কাতর হইয়াছেন, তাহাতে সত্বর ভাল চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এমতাবস্থায় একাকী ইহাকে দিনমানে রাস্তায় ফেলিয়া যাওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। আমজাদের অনিচ্ছা সত্বেও নুরল পাল্কী করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন।

বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার পর, আমজাদের ঘন ঘন ভেদ-বমি হইতে লাগিল, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠিল, রাত্রিতে খিচুনী প্রভৃতি কলেরার যাবতীয় উপসর্গ একযোগে দেখা দিল। নুরল এস্‌লাম মহা চিন্তিত হইলেন। আমজাদ ভাঙ্গা গলায় কহিলেন, "দোস্ত, আর বাঁচিবার আশা নাই। আমার বাড়ীতে একটা তার করিয়া দাও। তোমার উপকারের প্রতিকার করিতে পারিলাম না ; ইহাই আক্ষেপ থাকিল।" এই বলিয়া আমজাদ কাঁদিয়া ফেলিলেন। নুরল এস্‌লাম

তাঁহার চক্ষের পানি মুছিয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি ভীত হইও না, ইহা অপেক্ষা কঠিন কলেরায় লোকে আরোগ্য হয়। আমি বেলগাঁও হইতে এসিষ্টাণ্ট সার্জনকে আনিতে পাঠাইয়াছি।" এই সময় সার্জন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অবস্থা দেখিয়া ঔষধ দিলেন এবং রাত্রিতে আসায় চতুর্গুণ ভিজিট লইয়া বিদায় হইলেন। নুরল ও তাঁহার ফুফু সারারাত আমজাদকে ঔষধ সেবন করাইলেন ও সেবাশুশ্রূষা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু পীড়ার উপশম না দেখিয়া নুরল প্রাতে স্বয়ং বেলগাঁও যাইয়া বেলতা 'তার' করিলেন, তারের সংবাদ পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন আবার আপনাদিগের পূর্বে হামিদা মনস্তাপে স্বামীর অমঙ্গল সংবাদ যে অবগত হইয়াছে, তাহাও জানেন।

সাধ্বী ললনার হৃদয় স্বামীর হৃদয়ের সহিত এইরূপ এক তারে বাঁধা' এ তার টেলিফোনকে হারাইয়া দেয়। সুদূর প্রবাসে থাকিলেও স্বামীর মঙ্গলামঙ্গল সাধ্বী তারযোগে ঘরে বসিয়া জানিতে পারে। ভক্তির সংযোগ ইহা সতীহৃদয় সর্বদা জ্যোতির্ময় করিয়া রাখে। মেসমেরিজমের মূলে যেমন গভীর এক'গ্রতা, এ তারের মূলে তেমনি নিরবচ্ছিন্ন পবিচিন্তা বা প্রেমের সাধনা।

তার পাইয়া আমজাদের পিতা মীর নবাব আলী সাহেব ও আমজাদের শ্বশুর ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেব ছেলেকে দেখিতে রতনদিয়ায় রওয়ানা হইলেন।

এদিকে নুরল এসলাম বেলগাঁও হইতে প্রাতে আর একজন ভাল ডাক্তার লইয়া গেলেন। আল্লার ফজলে তাঁহার চিকিৎসায় আমজাদ আরোগ্যের পথে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা ও শ্বশুর রতনদিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বাড়ীতে পুনরায় 'তার' করিলেন। মীর নবাব আলী সাহেব পুত্রের সহিত নুরল এসলামের একাকৃতি দেখিয়া তাজ্জব বোধ করিতে লাগিলেন।

পাঁচ বিঘা জমি জুড়িয়া নুরুল এসলামের বাড়ী। চারিদিকে অনতিউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের ভিতর দিকে যথাস্থানে রোপিত ফলবান বৃক্ষাদি. পশ্চিমাংশে পুষ্করিণী। বাড়ীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় এগারোখানি ঘর; তন্মধ্যে রান্নাঘর, ভাণ্ডার ঘর ও বৈঠকখানা ঘর করগেট টিনে নির্মিত। অন্যান্য ঘরগুলি খড়ের। নুরুল এসলামের পিতা টিনের ঘর ভালবাসিতেন। বৈঠকখানার ঘর-খানি সাহেবী ফ্যাসানে প্রকাণ্ড আটচালা। আটচালার সম্মুখে ফুলের বাগান, তাহার সম্মুখে দূর্বাদল শোভিত পতিত ক্ষেত্র। পতিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন একখানি সবুজ গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। বাগান হইতে পতিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অনতিউচ্চ সরল বাঁকা রাস্তা দক্ষিণ প্রাচীরের সদর দ্বার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গুবাক বৃক্ষ সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় সদর্পে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের বাহিরে অনতিদূর দিয়া গবর্ণমেণ্টের বাঁধা সড়ক বেলগাঁও বন্দর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জেলা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

আমজাদ হোসেনকে বৈঠকখানা ঘরের অন্দরমহল-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও শ্বশুরকে মধ্য প্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হইল। ৪।৫ দিন মধ্যে আমজাদ সুস্থ হইয়া উঠিলে তাঁহারা বাড়ী যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু নুরুল এসলামের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে আরও দুই তিন দিন তথায় থাকিতে হইল। তাঁহারা নুরুল এসলামের আতিথ্য সৎকারে ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমজাদের সহিত নুরুল এসলামের বন্ধুত্ব সবিশেষ ঘনীভূত হইল। দৈবঘটনায় আমজাদ হোসেনের পীড়া উপলক্ষে ফরহাদ হোসেন তালুকদার সাহেবের সহিত পুনরায় দেখা হওয়ায়, নুরুল যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের বাড়ী রওয়ানা হইবার পূর্বে আমজাদ নুরুল এসলামকে কহিলেন, "এখন আমার রেলওয়ের গণনা, কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি।" নুরুল এসলাম তাঁহার বিবাহের কথা বিমাতা ও ফুফু-আম্মাকে জানাইলেন। ফুফু-আম্মা আগ্রহ সহকারে মত দিলেন। অগত্যা বিমাতাও

সম্মতি জানাইলেন। নুরল এসলাম স্মিতমুখে আসিয়া বন্ধুকে কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রম।" আমজাদ পিতা ও শ্বশুরের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তালুকদার সাহেব তাঁহার বেহাইকে নুরল এসলামের পাট খরিদ, আনোয়ারার চিকিৎসা, তার দাদিমার মনের ভাব, আজিমুল্লার পুত্রের সহিত আনোয়ারার বিবাহ-প্রসঙ্গ এবং ভূঞা সাহেবের টাকার লোভ প্রভৃতি কথা খুলিয়া বলিলেন।

মীর সাহেব শুনিয়া কহিলেন, "রতনদিয়ায় দেওয়ান-গোষ্ঠি বুনিয়াদী ঘর। আমি এ ঘরের পরিচয় পূর্ব হইতেই জানি। এমন ঘরে, এমন বরে কন্যা দিতে পারিলে, ভূঞার চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে যাইবে। টাকার লোভ ত' দূরের কথা, বিনা অর্থে সত্বর যাহাতে এ কার্য হয়, আমি বাড়ী যাইয়া ভূঞা শালার কান ধরিয়া তাহা করিতেছি।"

পরদিন আহারান্তে পিতা ও শ্বশুরের সহিত আমজাদ বাড়ী রওয়ানা হইলেন। যথেষ্ট শিষ্টাচার সহকারে নুরল এসলাম তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। বৈকালে তাঁহারা বাড়ী পৌঁছিলেন। আমজাদের মা ছেলেকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, অন্যান্য সকলে আনন্দিত হইলেন, হামিদা স্বামী দর্শনে মৃতদেহে প্রাণ পাইল এবং দুই রেকাত শোকরানার নামাজ আদায় করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমজাদের পিতার যে কথা সেই কাজ। তিনি মধুপুরে ভূঞা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন ও বন্দোবস্ত একই সঙ্গে করিয়া ফেলিলেন।

বেল্‌তার মীরবংশ আভিজাত্যে দেশবিখ্যাত। আমজাদের পিতা বর্তমান সেই বংশের মুরুব্বী। তাঁহার মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি তেজস্বী কর্মবীর বলিয়া খ্যাত। মধুপুরে পুত্রের বিবাহ দিয়া তত্রত্য সকল লোকের সহিত পরিচিত। ভূঞা ও তালুকদার সাহেব তাহাকে বড় মুরুব্বী বলিয়া সম্মান করেন। তাঁহার আদেশ উপদেশ মত কার্য করা গৌরবজনক বলিয়া ভাবেন। উপস্থিত বিবাহ প্রস্তাবে ভূঞা সাহেব কোন ওজর-আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কৃপণতা ও অর্থের লোভ দূরে পলায়ন করিল। মীর সাহেব বিবাহ-সম্বন্ধে দেনা ও পাওনা যাহা সাব্যস্ত করিলেন ভূঞা সাহেব মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাহাতেই মাথা নোয়াইলেন। গোলাপজানও যেন কি বুঝিয়া বিশেষ কোন আপত্তি করিল না।

অতঃপর রতনদিয়ায় চিঠি লেখা হইল, "আগামী ২৭শে আশ্বিন আমরা শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তাহার পূর্বে বা পরে ভাল দিন নাই; সুতরাং ঐ তারিখেই যাহাতে এখানে চলিয়া আসিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়, আপনারা তাহাই করিবেন। বিবাহের পূর্বে এখান হইতে আপনাদের বাড়ী যাওয়ার আর সময় নাই, পরন্তু আবশ্যকতাও নাই। খোদা না করুন, এই পত্রানুযায়ী কার্য সম্পন্ন করিতে কোন বাধাবিঘ্ন ঘটিলে, পূর্বাহ্ণে জানাইবেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনাদিগের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

পাত্রীকে কেবল তিন হাজার টাকার কাবিন দিতে হইবে। বস্ত্রালঙ্কার অন্যান্য ব্যয় আপনাদের ইচ্ছাধীন। আশা করি, এ বন্দোবস্তে আপনাদের অমত হইবে না।"

মীর সাহেবের পত্র পাইয়া নুরল এসলামের বাড়ীতে বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। তিনি জুট ম্যানেজার সাহেবের নিকট এক মাসের বিদায় লইলেন।

কেবল ভাদ্র মাসের খরিদ পাটে নুরল এসলাম কোম্পানীকে তিন হাজার টাকা লাভ করিয়া দিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত কোম্পানীর গুণগ্রাহী ম্যানেজার সাহেব তাহাকে বিবাহের সাহায্য বাবদ তিন-শত টাকা দান করিলেন। নুরল এসলামের আত্মীয়-কুটুম্বে, বন্ধু-বান্ধবে, চাকর-চাকরাণীতে তাহার বাড়ী-ঘর জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। নুরল এসলামের মামু সাহেব, নুরল এসলামের পুর্বকথিত ভাগিনীদ্বয়ের বড়টিকে যমুনা-পারে একজন ভদ্রবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি এফ-এ পাশ করিয়া সুপারিশের জোরে এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও ছুটি লইয়া সস্ত্রীক বিবাহে আসিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নুরল এসলাম নওশা সাজিয়া, পাত্র-মিত্রসহ প্রেম প্রতিমা আনোয়ারার পাণিগ্রহণ বাসনায় মধুপুরে উপস্থিত হইলেন। আজ ভূঞা সাহেবের বৃহৎ ভবন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। হামিদাও সইয়ের বিবাহে আসিয়াছে। সে শুভ বিবাহে আনন্দে আত্মহারা। আনোয়ারা আজ তাহার আশাতীত আশাসাফল্যে সলাজ-প্রেম-রোমাঞ্চ-কলেবরা। তাহার দাদিমা আশাপূর্ণ হেতু উৎফুল্লা ও ব্যয়বাহুল্যে মুক্তহস্তা। অন্যান্য রমণীগণও বিবাহের আনন্দে আনন্দিতা। কেবল একটি স্ত্রীলোক আজ আন্তরিক আনন্দিতা না হইলেও, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। বলা-বাহুল্য, ইনি আনোয়ারার বিমাতা—গোলাপজান।

ভূঞা সাহেব যথাসময়ে, পাত্রপক্ষ ও স্বপক্ষ জনগণকে নাশ্‌তা ও পোলাও পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। দীনহীন কাঙ্গালেরা উদর পুরিয়া আহার করতঃ ভূঞা সাহেবকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। অপরাহ্নে পাত্রপক্ষ হইতে নয় শত টাকার অলঙ্কার, তিন শত টাকার শাড়ী প্রভৃতি বস্ত্রাদি ও তিন হাজার টাকার কাবিননামা বাড়ীর মধ্যে পাঠান হইল। হামিদা ৬০৲ টাকা মূল্যের একটি অঙ্গুরী সখিত্বের নিদর্শনস্বরূপ সইয়ের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল এবং তাহার আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি বিনাইয়া বিনাইয়া চিত্রবিচিত্রভাবে খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া দিল। আনোয়ারার দাদিমার আদেশে হামিদার পুণ্যশীলা জননী আনোয়ারাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করাইলেন। আর ৪ জন স্বভাবসুশীলা ভদ্র-মহিলা আয়া-স্বরূপ হামিদার মাতার সাহায্য করিলেন। হস্তস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন সহজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বালিকা বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া লজ্জায় সেইরূপ জড়সড় হইয়া পড়িল; কিন্তু সমাগত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে

দুলহীন সাজে দেখিতে ইচ্ছা করায়, হামিদার মা হাত ধরিয়া তুলিয়া কন্যাকে মহিলামণ্ডলীর মাঝে দাঁড় করিয়া ধরিলেন। অকস্মাৎ বিজলীর আলোকে যেমন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কন্যার উত্থানমাত্র রমণীমণ্ডলীর চক্ষুও সেইরূপ ধাঁধিয়া গেল। তাঁহারা বীণানিন্দিত মধুকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা বাহবা।" সে পবিত্র ধ্বনি অন্দরমহল হইতে আনন্দকোলাহল-মুখরিত ভূঞা সাহেবের বহির্ভবন মধুময় করিয়া অনন্তের পথে উত্থিত হইল। কন্যা লজ্জার ভারে অর্ধস্ফুট গোলাপকলিকার ন্যায় নিম্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহলাবণ্য প্রভায়, অনুপম কারুকার্যমণ্ডিত পরিহিত ভূষণের সৌন্দর্য অধিকতর চাকচিক্যময় হইয়া উঠিল। তাহার স্বর্ণাভ অঙ্গের জ্যোতিঃফলিত রেশমী বস্ত্রের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। বালিকা ইতঃপূর্বে যাহার প্রেমে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, অথচ যাঁহাকে সহজে পাওয়া কঠিন বা একেবারেই পাওয়া যাইবে না বলিয়াই মনে করিয়াছিল; পরন্তু না পাইলে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আশ্রয় করিয়া—খোদাতায়ালার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল; ওহো! বালিকার কি সৌভাগ্য, সে আজ তাঁহারই প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা! সে আজ সেই দুষ্প্রাপ্য প্রেমাধার যুবকবরকে উপস্থিত মুহূর্তে পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যত!

বালিকার হৃদয়ের অনুরাগ-জ্যোতিঃ এখন তাহার সুন্দর মুখে প্রতিফলিত। অন্তরের জ্যোতিঃ বাহিরের জ্যোতিঃতে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন দুইটি যৌগিক তাড়িতের সম্মিলনে পরিস্ফুট জড়িল্লতার উৎপত্তি হইয়াছে, জ্যোতির সহিত জ্যোতি মিলনে বালিকা আজ সত্যই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সত্য সত্যই সে আজ বিবাহের সাজে সৌন্দর্যের মহিমান্বিতা পাটরাণী সাজিয়াছে।

সমাগত স্ত্রীলোকেরা অনিমেষ দৃষ্টিতে বালিকার রূপ দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। কেহ কহিলেন, "এমন রূপ জন্মেও দেখি নাই।" কেহ কহিলেন, "এত মেয়ে, নয়,সাক্ষাৎ পরী।" কেহ বলিলেন, "এ মেয়ে পরীও নহে, পরীদিগের মাথার মণি।" আবার কেহ বলিলেন, "যেমন মা ছিলেন তেমনই মেয়ে হয়েছে।" গোলাপজান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে খুশী করার জন্য আর একজন স্ত্রীলোক কহিলেন, "বাদশার মাও, ছোটবেলায় এইরূপ ছিল।" বাদশার মার ব্যথায় ব্যথী আর একজন কহিলেন,

বাদশার মা বুঝি এখন বুড়ি হয়েছেন? ঘাটের কোলে তাঁহার রূপ এখনো ধরে না।" তাহা শুনিয়া অন্য একজন অল্প বয়স্ক রমণী তাঁহাকে কহিলেন, "ছি, ছি, তুমি বল কি? বাদশার মাকে কন্যার পায়ের"—এই পর্যন্ত বলিয়াই জিভ কাটিল। একজন প্রবীনা চতুরা দেখিলেন বিবাদ বাধে ; তাই তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "বাদশার মার যে রূপ, তাহা অন্যের নাই।" বাদশার মা রাগ সমলাইয়া কহিলেন, "আমাদের গাঁয়ের রেবতী ঠাকুরের কন্যা এ মেয়ের চেয়ে বেশী সুন্দরী।" একজন মুখরা পাড়াবেড়ানী নারী সেখানে উপস্থিত ছিল, সে কহিল, "থোও থোও, রেবতী ঠাকুরের কন্যাকে আমি না দেখিলে হইত। এ মেয়ের বাঁদীর যোগ্যও সে হইবে না। আমি অনেক স্থানে অনেক মেয়ে দেখিয়াছি এমন খবছুরত মেয়ে কোথাও দেখি নাই।" রূপ সমালোচনা ক্রমে এইরূপ বাড়িয়া চলিল দেখিয়া হুরলহীনের দাদিমা কহিলেন, "থাক মা সকল, রুপের বড়াই মিছা। তোমরা দোয়া কর, আমার আনার যেন খোদাভক্তি ও পতি-ভক্তিতে সকলের সেরা হয়।

২৭শে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে শুভক্ষণে আনন্দ-কোলাহল মধ্যে মোহাম্মদ নুরুল এস্‌লাম মোসাম্মাৎ আনোয়ারা খাতুনের পাণিগ্রহণ করিলেন।

নুরল এস্‌লাম বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলেন। আনোয়ারা দাদিমার অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, নিরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, তিনি শোকমোহে কাতর হইয়াও পৌত্রিকে প্রবোধ ও উপদেশ দিতে লাগিলেন, "চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করা কন্যার কর্তব্য নহে ; শরিয়ত মত দুনিয়ায় পতি-গৃহই তাহার প্রকৃত আবাসস্থল ; পরন্তু পতিসেবা না করিলে স্ত্রীলোকের নামাজ, রোজা, ধর্মকর্ম সব বিফল। অতএব তুমি পতি-সেবামাহাত্ম্যে ধর্মকর্ম রক্ষা করিবে। পতিকুলের তৃপ্তিসাধন ও মুখোজ্জলকরিবে ; তাই বৎসে, তোমাকে পতিগৃহে পাঠাইতেছি। বিদায়ের সময় আসন্ন হইয়াছে, আর অধিক কি বলিব।"

এই সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বৃদ্ধা স্বয়ং চোখের পানি মুছিতে মুছিতে রোরুদ্যমানা পৌত্রীকে তাহার স্বামীর সহিত বিদায় দিলেন। দুইটি চাকরাণী কন্যার সঙ্গে গেল।

নুরল এস্‌লাম মঙ্গলমত বাড়ী পৌঁছিলেন। এ বাড়ীতেও হুলহীনের

রূপ-সমালোচনা পূর্ণমাত্রায় চলিল। কেহ কহিলেন, "এমন খুবছুরত মেয়ে কোন্ দেশে ছিল?" কেহ বলিলেন, "ছেলে দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া এমন রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন।" নুরল এস্লামের ছোট ভগিনী মজিদা বারম্বার ঘোমটা খুলিয়া নববধুর মুখ দেখিতে লাগিল। ডেপুটি সাহেব ২৫ টাকা দর্শনী দিয়া সম্বন্ধী-পত্নীর মুখ দেখিলেন। দেখিয়া কহিলেন, "পাত্রী বটে, এমনটি কখনও দেখি নাই!"

আজ ফুলশয্যা। মুসলমানের ফুলশয্যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ আচারবিধি না থাকিলেও, যিনি ইহার বিধানকর্ত্রী তিনি বিশেষ সখ করিয়া এই ফুলশয্যার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। একমাত্র ভাই, জগৎ-সেরা বৌ ; তাই সর্বগুণসম্পন্না ভগিনী রশিদনের উদ্বেগে আজ এই মহোৎসব।

রাত্রি এক প্রহর। সকলের আহার শেষ হইয়াছে। নুরল এস্‌লাম আহারান্তে বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্দব পরিবৃত হইয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন। গল্প করিতে-ছিলেন মুখে, কিন্তু মনটি তাঁর অন্তঃপুরে ; চক্ষুদ্বয় তাঁহার দেওালের সংলগ্ন ঘড়ির দিকে কর্ণদ্বয় তাঁহার অন্ত-পুরের আহ্বান শ্রবণে সতর্কিত ও ব্যকুলভাবে উৎকণ্ঠিত। ক্রমে ঘড়িতে ১১টা বাজিল। বন্ধুগণ একে একে উঠিয়া স্ববাসে প্রস্থান করিলেন। নুরল এস্‌লাম তখন ওজু করিয়া পরম ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এশার নামাজ পড়িলেন। অনন্তর আরাম-কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের একখানি মানচিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। অঙ্কন যেখানে ভাল হইল না, সেখানে মুছিয়া নূতন করিয়া গড়িতে লাগিলেন।

এদিকে রশিদন্নেছার আদেশে দাসীরা ফুলশয্যা রচনায় ব্যস্ত। রিশদনের ছোট ভগিনী মজিদা ও বৈমাত্রেয় ভগিনী সালেহা সেখানে উপস্থিত। রশিদন মজিদাকে কহিলেন, "কি লো, সাঁজের ফুলগুলি কোথায় রাখিয়াছিস ?" মজিদা দৌড়াইয়া গিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে সাজিভরা ফুল আনিল, তাহাতে রক্তপদ্ম, বেলী, চামেলী, গোলাপ, জবা—নানা জাতীয় ফুল ছিল। রশিদনের আদেশে দাসীরা পূর্বেই নুরল এস্‌লামের শয়ন ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া-ছিল ; এক্ষণে শয্যা রচনা করিয়া ফুলগুলি যথোপযুক্তস্থানে সন্নিবেশিস করিল। লোবান জ্বালান হইল। ফুলের সৌরভে, লোবানের সুগন্ধে ফুলময়গৃহ পরী নিকেতন হইয়া উঠিল।

অতঃপর মজিদা, সালেহা প্রভৃতি নববধুকে ঘরে দিতে ঘিরিয়া লইয়া আসিল। এই সময় নববধুর বড়ই বিপন্ন অবস্থা। প্রেম ও লজ্জা একসঙ্গে বালিকাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। শেষে প্রেম তাহাকে ধীরে—অতি ধীরে ঘরে উঠীতে উপদেশ দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নুরল এস্‌লাম সলজ্জভাবে বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ননদেরা নববধুকে দুনিয়ার বেহেস্তের বাগানে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বালিকা অবগুণ্ঠনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকও নীরব। নীরবতার পীযুষপানে উভয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। শেষে বালিকা ধীর শরমকম্পিতচরণে একটু অগ্রসর হইয়া চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর দুর্লভ চরন চুম্বন করিল;—যেন বসন্তের সুখানিল স্পর্শে নবমঞ্জুরিত মাধবীলতা দুলিতে দুলিতে সহকারমূলে আনত হইল। নুরল এস্‌লাম তখনই সেই কনক-প্রতিমার চম্পকবিনিন্দিত কোমলকরাঙ্গুলি করে ধারণ করিয়া ধীরে—অতি ধীরে উঠাইলেন এবং প্রেমপুরিত মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "চুরি করিয়া কি এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়?" নিমেষমধ্যে আনোয়ারার মানস-নেত্রে সেই খিড়কীদ্বারে নৌকাদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া এতদিনের আশা-নৈরাশ্য ও সুখমোহবিজড়িত মর্মকোণে লুকায়িত গুপ্ত কাহিনীগুলি চিত্রের ন্যায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার সুকোমল গণ্ড কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া গেল। মুখমণ্ডলে প্রভাতকালে রক্তপদ্মের উপর শিশির বিন্দুর মত স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু লজ্জায় সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। মুখে অবগুণ্ঠন থাকায় নুরল এস্‌লামও প্রাণপ্রতিমার এই অপার্থিব মাধুরী দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ আত্মহারাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রিয়-তমার মুখের নিকট মুখ লইয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, টগর জবার দাম পাইয়াছেন?" এবার বালিকা কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিল না। লজ্জা তার গলা চাপিয়া ধরিলেও টগর ও জবার নামে প্রেমও বিস্ময় বালিকাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, সে তখন কহিল, 'আপনি টগর-জবার নাম জানিলেন কি করিয়া?"

যুবক। সেই দিনই প্রেম বৈঠকখানায় আসিয়া আমার কানে কানে বলিয়া গিয়াছিল।

প্রেমের ভয়ে লজ্জা আর বালিকাকে পীড়ন করিতে সাহস পাইল না। বালিকা স্বামীর কথার উত্তরে কহিল'—"টগর-জবার নগদ মূল্য পাই নাই। কিন্তু তাহার বদলে যে মহামূল্য রত্ন পাইয়াছি, তাহাতে জিন্দেগী সফল মনে করিতেছি।"

যুবক। কি রত্ন লাভ করিয়াছেন?

বালিকা। এই ত, সম্মুখে উপস্থিত।

যুবক। কৈ, দেখিত' না?

বালিকা ধীরে নিজহস্তে স্বামীর হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল, "এইত। নুরল এসলাম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "আজ আমিও কোহিনুর লাভ করিয়া ধন্য হইলাম; এখন অসুন, উভয়ে একত্রে এজন্য খোদাতালার শোকর-গোজারী করি।" এই বলিয়া তিনি স্ত্রীকে আপন বামপার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বালিকা পতির পবিত্র প্রথম আদেশ সসম্মানে পালন করিতে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। যুবক কহিলেন, "আমার কথিত বাক্যে মোনাজাত করিবেন ও আমিন আমিন বলিবেন।" এই বলিয়া উর্দ্ধ হস্তে বলিতে লাগিলেন "হে আল্লাহতা'লা! আজ আমরা, তোমার নবীর ছোন্নত পালন করিলাম। কিন্তু দয়াময়! দুর্বল আমরা, নির্বোধআমরা যাহাতে আমরা আমাদের এই নূতন জীবনের কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহার শক্তি আমাদিগকে দাও। হে প্রেমময়! যেন আমাদের প্রেম তোমারই প্রেমের জন্য হয়। হে মধুর! হে সুন্দর! যেন আমাদের চির-জীবন মধুময় হয় ও আমাদের কর্ম সৌন্দর্যময় হয়। হে আমাদের অস্তিত্বের স্বামী, যেন আমরা এক মনে এক প্রাণে সর্বদা তোমার সেবা করিতে পারি। আমিন্ ইয়া রাব্বেল আলামিন, আমিন।"

মোনাজাত অন্তে নুরল এসলাম গাত্রোত্থান করিলেন; কিন্তু বালিকা উঠিল না; নুরল এসলাম তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন—তাহার শতদল নিন্দিত নেত্রদ্বয় হইতে মুক্তাফল গড়াইতেছে। মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিগলিত! প্রেমময় স্বামীর পত্নীভাবে এই প্রথম ব্যবহার। নুরল এসলাম কহিলেন, "কাঁদিতেছেন কেন?" প্রেম বালিকাকে কহিল—উত্তর দাও? লজ্জা কহিল—ছি! প্রেমের কথায় তোমার এই স্বর্গীয়ভাবের মাধুর্য নষ্ট করিও না। নুরল এসলাম কোন উত্তর পাইলেন না; কিন্তু ভাবদৃষ্টে বুঝিলেন, এ মুক্তাফল শোকর-গোজারীর দক্ষিণা। অতঃপর তিনি প্রিয়তমার কর ধরিয়া ফুলাসনে আরোহণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুখে, আমোদ-আহ্লাদে দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। নানা-ভাবে এ পর্যন্ত নববধু স্বামীসহ ফিরাণীতে যাইতে পারে নাই। আগামীকল্য যাওয়ার দিন স্থির হইয়াছে। পূর্ব রাত্রি শয়ন-মন্দিরে নুরল এসলাম একটি সুন্দর ক্ষুদ্র বাক্স স্ত্রীর সম্মুখে খুলিলেন। পরে তাহা হইতে এক গোছা চুল বাহির করিয়া ঈষদ্ হাস্যে কহিলেন, "না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিয়া অপনার বস্তু আপনি গ্রহণ করুন।" চুল দেখিয়া স্ত্রী প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না। শেষে যখন স্মরণ হইল যে, দাদিমা তাহাকে বলিয়া ছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব নিজ হাতে তোমার মাথার চুল কাটিয়া নিজ হাতে জলপটী বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন ভাবিল, এ চুল তাহারই মাথার হইবে; তথাপি পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইহা কোথায় পাইলেন?"

পতি। হাতে লইয়া দেখুন। স্ত্রী চুল হাতে লইয়া দেখিয়া কহিল, "ইহা আমার মাথার বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

পতি। নিশ্চয় তাহাই।

স্ত্রী। সামান্য চুলের প্রতি আপনার যত্ন দেখিয়া লজ্জিত হইতেছি।

পতি। আমার নিকট ইহার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের সমান। স্ত্রীর মুখ অধিকতর রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

পতি। যদি আপনাকে না পাইতাম তবে এই কেশগুচ্ছ আমার জীবনের অবলম্বন হ'ত। স্থানান্তরে বিবাহের প্রস্তাব চলিলে আমি ঘটককে এই চুল দেখাইয়া বলিয়া দিতাম, এইরূপ সুচিক্কণ কেশযুক্তা পাত্রী না পাইলে বিবাহ করিব না। ঘটক এমন রত্ন কোথাও পাইত না; আমারও বিবাহ করা ঘটিত না।

স্ত্রী। যদি পাওয়া যাইত?

পতি। অসম্ভব।

স্ত্রী। এত বড় দুনিয়া; এত স্ত্রীলোক; পাওয়া অসম্ভব নয়।

পতি জেরায় ঠকিয়া আম্‌তা আন্‌তা করিয়া কহিলেন, "অসম্ভব সম্ভব হইলে কি করিতাম, সে বিচার তখন হইত।"

স্ত্রীর রক্তিমাভ গোলাপ গণ্ডে ঈষৎ মলিনতার ছায়া পড়িল। সে কহিল- "বাবাজান ইতঃপূর্বে আমার বিবাহ সম্বন্ধে স্থানান্তরে দেড় হাজার টাকার গহনা, দেড় হাজার টাকা নগদ এবং তিন হাজার টাকার কাবিন চাহিয়াছিলেন, তাহাও দিতে সম্মত হইয়াছিল ; যদি আপনার নিকট তাহাই চার্জ করিতেন তবে কি করিতেন ?"

পতি। আমি গরীব মানুষ, তথাপি ধার-কর্জ করিয়া আপনাকে আনিতাম।

স্ত্রী। আপনাকে নগদ টাকা-পয়সা কিছুই দিতে হয় নাই, কেবল মাত্র তিন হাজার টাকার কাবিন দিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি এই কাবিন দিতে অনেক ওজর-আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাকে পাওয়া যদি এতই বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল, তবে শুধু কাবিন দিতে এত ইতস্তত: করিয়াছিলেন কেন ?

পতি। কাবিনে বড় ভয় হইয়াছে। বাবাজান শেষে আবার বিবাহ করিয়া অর্ধেক তালুক কাবিন দিয়া গিয়াছেন ; শুনিতে পাইতেছি, মা (বিমাতা) নাকি সেই সম্পত্তি লইয়া পৃথক হইবেন। তিনি অর্ধেক ও আপনি তিন হাজার আদায় করিলে, কালই আমাকে পথে বসিতে হইবে।

পতি দুঃখের স্বরে এ কথাগুলি বলিলেন।

স্ত্রী পতির মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার ভাবান্তর উৎপাদনের জন্য কহিল, "এশার নামাজ পড়িয়াছেন ?"

পতি। না। আজ নটায় ঘরে আসিয়াছি, নামাজ এখানেই পড়িব। স্ত্রী তখন ঘরের দক্ষিণ দিকের দ্বারের কাছে তাঁহার ওজুর জন্য একখানি জলচৌকি ও পানি রাখিয়া দিল। পতি ওজু করিতে বসিলেন। এই সময় স্ত্রী তাহার ট্রাঙ্ক হইতে রেশমী রুমালে জড়ান এক জোড়া চটিজুতা বাহির করিয়া লইয়া পতির পার্শ্বে উপস্থিত হইল। অনন্তর নিজ হস্তে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া নিজ হস্তে জুতাজোড়া পরাইয়া দিল এবং পরম ভক্তির সহিত তাঁহার কদমবুসি করিল। পতি স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহারে বিস্ময়ে সুখ-সাগরে মগ্ন হইতেছিলেন। কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রী পতির পান-তামাক প্রস্তুত করিয়া নিজেও নামাজে প্রবৃত্ত হইল।

নামাজ অন্তে পতি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জুতা কোথায় পাইলেন ?"

স্ত্রী। আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন কেন ?

পতি। আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন কেন ?

স্ত্রী হাসিয়া উঠিল ; তারপর কহিল, "আপনি আমার পরম পূজনীয়, তাই 'আপনি' বলি।"

পতি। আপনি আমার মাথার মণি, এই নিমিত্ত 'আপনি' বলি।

স্ত্রী। আমি আপনার বাঁদী। বাঁদীর সহিত মনিবের 'আপনি' বলা মানায় না।

পতি। আর আমি যে আপনার কেনা ; সুতরাং মুখ সামলাইয়া কথা বলা উচিত।

স্ত্রী। আপনি অমন কথা বলিলে আমি আর আপনার সহিত কথা বলিব না।

পতি। আচ্ছা, আমি এখন হইতে আপনাকে 'তুমি' বলিব ; কিন্তু তুমি আমাকে 'আপনি' বলিলে, বুঝিব তুমি আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস না।

"ভালবাস না"—এই কথায়, এই চিন্তায় স্ত্রী হৃদয়ে যাতনা বোধ করিতে লাগিল, সে পতির হাত টানিয়া নিজ বুকে স্থাপন করিল। পতি হস্তস্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলেন, উত্তাপে জল যেমন টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড সেইরূপ স্পন্দিত হইতেছে। তখন পতি স্ত্রীকে কহিলেন, "প্রেমময়ী, তুমি আমাকে এতখানি ভালবাসিয়াছ? আমি যে ইহার শতভাগের এক ভাগও প্রতিদান করিতে পারি নাই। প্রাণাধিকে, তুমি মানবী না দেবী ?" স্ত্রীর চক্ষু পতিপ্রেমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ জুতা কোথায় পাইয়াছ ?"

স্ত্রী। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে।

পতি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হাঁ ঠিক ; মনে হইতেছে, তোমাদের বাড়ীতে রাত্রিতে যখন আহার করি, তখন বৃষ্টি নামিয়াছিল। আহারান্তে নৌকায় যাইবার সময় চটিজুতায় যাওয়া অসুবিধা মনে করিয়া পাচককে নৌকা হইতে বুট-আনিতে বলি, সে বুট জুতা আনিয়া দেয় এবং চটি ভুলিয়া নৌকায় তোলা হয় নাই।" পতি এই কথা বলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জুতা যে আমার, তাহা তুমি কিরূপে চিনিলে ?"

স্ত্রী। আপনার পায়ে দেখিয়াছিলাম।

পতি। এই সামান্য জুতা এতদূর বহন করিয়া আনিবার কি দরকার ছিল।

স্ত্রী। জুতা সামান্য নয়, ইহা নিত্য দরকারী। এই বলিয়া সে কহিতে লাগিল, "বৈঠকখানায় চটি পাইয়া চিনিলাম ইহা আপনার। তখনই আল্লার কাছে মোনাজাত করিলাম, 'দয়াময়! দাসী যেন এই জুতা তাঁহার চরণে নিজ হাতে পরাইতে পারে।'" আল্লাহ আজ দাসীর বাসনা পূর্ণ করিলেন।

ইহা শুনিয়া পতি বিবাহের পূর্বেই তাঁহার প্রতি স্ত্রীর প্রেম কতদূর গভীর হইয়াছিল বুঝিতে পারিলেন এবং বুঝিয়া স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিলেন।

অতঃপর নবদম্পতি নিদ্রার কোলে শায়িত হইলেন।

ভক্তি-পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

লৌকিক প্রথামতে নুরল এসলামের বিবাহের ক্রিয়াপর্ব সমাধা হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে অফিসের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রী আপন পিত্রালয়ে। মাসাধিক পর নুরল এসলাম তাহাকে পত্র লিখিলেন, "প্রাণাধিকে! এত অল্প সময়ে ভক্তি ও সদ্ব্যবহারে নাকি তুমি ফুফু-আম্মার মন কাড়িয়া লইয়া গিয়াছ; তাই তিনি তোমাকে আনিবার নিমিত্ত উতলা হইয়াছেন। আগামী ১৭ই অগ্রহায়ণ তিনি তোমাকে আনিবার নিমিত্ত এখান হইতে লোক পাঠাইবেন। তোমার সই এখন কোথায়? দোস্ত সাহেব বি-এল পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। খবরের কাগজে নাম দেখিয়া বেল্‌তায় 'তার' করিয়াছি। তুমি কেমন আছ? খোদার ফজলে আমরা সকলে ভাল আছি। আগামীতে তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ লিখিবে।" ইতি—তারিখ, ১৩ই অগ্রহায়ণ।

তোমারই—
নুরল এসলাম

আনোয়ারা পত্র পাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল। ইহাই তাহার প্রেমময় জীবনের প্রথম পত্র :—

"পাক্ জনাবে কোটি কোটি কদমবুসি পর আরজ,—

আপনার পবিত্র হস্তের সুধালিপি পাইয়া সুখী হইলাম। আমার একমাস "নফল রোজা মানত ছিল, এখানে আসিয়া কয়েকদিন পর তাহা আরম্ভ করিয়াছি আজ রোজার ১১ দিন, আর তিন সপ্তাহ পর আমাকে লইয়া গেলে ভাল হয়; কারণ তথায় যাইয়া রোজা করিবার নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে। পত্রমধ্যে যে টুক্‌রা কাগজগুলি পাঠাইলাম সেগুলি স্বহস্তে পোড়াইয়া ফেলিবেন। দাসীর বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা মাফ করিবেন। আমি এখানে আসিবার এক সপ্তাহ বাদ সই বেল্‌তা গিয়াছে। সে ও তথা হইতে আমাকে লিখিয়াছে, তাহার স্বামী প্রশংসার সহিত বি-এল পাশ করিয়াছেন। আমি পরমানন্দে সন্দেশ চাহিয়া তাহাকে পুনরায় পত্র লিখিয়াছি। আপনার শরীর কেমন আছে? দাদী আম্মার দোওয়া

জানিবেন। বাটীস্থ আর আর সকলের মঙ্গল জানিবেন। খোদার মরজি এখানে সকলে ভাল আছেন। আরজ ইতি—তারিখ, ১৫ই অগ্রহায়ণ।

সেবিকা—

আনোয়ারা

নুরল এসলাম যথাসময়ে পত্র পাইলেন। খুলিবামাত্র কতকগুলি টুক্‌রা কাগজপত্র বাহির হইয়া পড়িল। তিনি বিস্মিত হইয়া কাগজগুলি যথাযথভাবে জোড়াতালি দিয়া দেখিলেন ; তাহা তাঁহার নিজহস্তেলিখিত পূর্বকথিত সেই তিন হাজার টাকার কাবিননামা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নুরল ইসলাম অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর স্বগত ভাবিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সত্য সত্যই স্বর্গের আনোয়ারা (জ্যোতির্মালা), তোমার তুলনা মর্ত্যে সম্ভবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লামের বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে চারটি বৎসর অতীতের পথে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। সময়ের এই ক্ষুদ্র অংশটুকুর মধ্যে পারিবারিক জীবনে তথা বিরাট বিশ্বপরিবারের ছোট বড় কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।

নুরল এস্‌লাম সতীনের ছেলে ; উপার্জনক্ষম। জুট-কোম্পানীর ম্যানেজার সাহেব তাঁহার কর্মদক্ষতায় ও স্বভাবগুণে ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। এখন তাহার বেনত ৮০টাকা।

নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নুরল এস্‌লামের সহিত সাধিয়া বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন এই জন্য নুরল এস্‌লামের বিমাতা আপনাকে যারপরনাই অপমানিত বোধ করিয়াছেন। পরন্তু নুরল এস্‌লাম তাঁহার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া হুরপরীর মত সুন্দরী স্বভাব-সুশীলা বিদুষী ভার্যা গৃহে আনিয়াছেন—তাহার উপর যে ভার্যা সর্বগুণান্বিতা এবং গৃহস্থালির সর্ববিষয়ে পরিষ্কার পরিছন্নতায় ঘর-বাহিরের সমস্ত কার্যের শৃঙ্খলা পারিপাট্য বিধানে ও অবিশ্রায় কর্মপ্রিয়তায় সে অল্পদিনেই প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় গৃহলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হাতের গুনে শাক-ভাতও অমৃতের মত বোধ হইতেছে।

এক রাত্রি আহারান্তে সালেহা তাহার মায়ের কাছে শুইয়া বলিতে লাগিল, “মা, আজ সকালে ভাবী যে মুড়িঘণ্ট পাক করিয়াছিলেন, তাহার স্বাদ এখনও জিহ্বায় লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি যে ডাইল পাক করেন, শুধু তাই দিয়া ভাত খাইয়া উঠা যায়।”

মা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ও ভাল পাকে বিষ মাখান ; তাহাতে আমাদের মরণ।

মেয়ে। সে কি মা ! ৩।৪ বছর হইল খাইতেছি মরি ত' না ?

মা। অভাগীর বেটি তুই তা বুঝবি কি করিয়া ?

মেয়ে। বুঝাইয়া দেও না।

মা। বৌ-এর রূপে নুরল আজকাল ভেড়া বনিয়াছে। বৌ ঘরগৃহস্থালী,

চাকর-চাকরাণী সব আপনার করিয়া লইয়াছে। রকমে সকমে বুঝিতেছি, বোই সংসারের সব, নুরল এখন তালে তালে তারি আদেশ-উপদেশ মত সংসার চালায় সে আর সংসারের জমা খরচ রাখে না, বৌ-এর হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছে। সেদিন রাত্রে জমাখরচ লিখিবার সময় নুরলকে বলিয়াছে কাপড় থাকিতে সকলকে জোড়ায় জোড়ায় কাপড় দিবার কি দরকার ছিল? তাহাতেই ত' এ মাসে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। সকলের মানে তুই আর আমি।

মেয়ে। তুমি যতই বলনা কেন, ভাবী আমাদের অনিষ্ট করবেন না। তিনি আমাকে কত ভালবাসেন, আদর করেন, হাতে তুলে কত জিনিস খাইতে দেন, কত মিঠা কথা বলেন। তোমাকেও ত' খুব ভক্তি করেন, আদরের সহিত কথা কন। সকলের কাপড়ের কথা বলিয়াছেন মিথ্যা কথা কি? তোমার আমার জোড়া-ধরা কাপড় ত' ঘরেই তোলা রহিয়াছে।

মা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুই গোল্লায় যা, বুঝাইলাম কি, আর বুঝিলি কি।"

মেয়ে। কি বুঝাইলে?

মা। দুইদিন পরে আমাদিগকে বৌ-এর বাঁদী হইয়া সংসারে থাকিতে হইবে। একটু আগেই এক জোড়া কাপড় দিয়াছে, তাই তাহার পরানে সয় নাই। এমন ছোট লোকের মেয়ে কি আছে।

মেয়ে। না, ভাবী ছোটলোকের মেয়ে নয়। আমি শুনিয়াছি, ভাবীর বাপের বাড়ীতে বড় বড় টিনের ঘর, পালে পালে গরু-ভেড়া, চাকর-বাকর বাড়ী ভরা।

মা। হাবা মেয়ে বড় বড় টিনের ঘর থাকিলেই বুঝি বড় লোক হয়? ওর বাপ দাদা যে ভুঁইমালী ছিল, তার মা আবার চোরের মেয়ে।

মেয়ে। তুমি বল কি! তবে কি ভাবীর বাপ-দাদারা আমাদের ঝাড়ুদার বলাই মালীদের জাত? ওরা নাকি হিন্দু ছোটলোক। বলাইয়ের বৌ ত' আমাদের ঘরে ঢুকিতেই সাহস পায় না।

নুরল এস্‌লামের প্রপিতামহের আমল হইতে হিন্দু ভুঁইমালী তাহাদের উঠান পরিষ্কার করিত, ঘরের ডোয়া বাঁধিত, এজন্য মালার চাকরান জমি ছিল। এক্ষণে বলাই মালী সেই কাজ করে।

মা বলিল, "হাঁ ওর বাপ-দাদারা আগে হিন্দু ভুঁইমালী ছিল, শেষে জাত খাইয়া মুসলমান হয় এবং ভুঁইয়া খেতাব পায়।"

মেয়ে। ভাবীর মা কি সত্যই চোরের মেয়ে ?

মা। নয় ত' কি ?

মেয়ে। তুমি এত কিরূপে জান ?

মা। তোমার মামুর মুখে শুনিয়াছি, বৌ-এর বাপ-দাদার খবর ; আর বৌ-এর বাপের বাড়ীর বাঁদীর মুখে শুনিয়াছি ; তার মার পরিচয়।

সালেহার মামু ও আনোয়ারার বাঁদী যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য। তাহাদের ঐরূপ বলিবার কারণ ছিল। সালেহার মামু নুরল এস্‌লামের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হন এবং আনোয়ারার দাসীকে আনোয়ারার বিমাতা গোলাপজান জ্বালাতন করিত।

মেয়ে। শুনিয়া ঘেন্নায় পরাণ যায়। এতদিনে বুঝিলাম ভাবী আমাকে এত আদর করে কেন। আর তোমাকেই বা ভক্তি করে কেন। আমার মনে হয়, ভাইজান কেবল মাথার চুল ও রূপ দেখিয়া এমন ঘরে বিবাহ করিয়াছেন। আমি কাল হইতে বৌ-এর কাছে এক বিছানায় বসিব না, তাহাকে মালীর মেয়ে ডাকিব।

মা। তুই যে অমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিস, এ-ও ভাগ্যির কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন রবিবার। আজ নুরল এসলামের অফিস হইতে বাড়ী আসিবার দিন। ইংরেজ বণিকেরা রবিবারে আফিস বন্ধ না রাখিলেও সেদিন তাঁহাদের বৈষয়িক কার্যাদি কম হয়। ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র নুরল এসলাম এ-নিমিত্ত শনিবার বৈকালে বাড়ী আসিয়া থাকেন, সোমবার অপরাহ্নে আফিসে হাজির হন।

আনোয়ারা রোজ প্রাতে কোরান শরীফ পাঠ করে। আজ পড়িতে পড়িতে একটু বেলা হইয়াছে। সালেহা তাহার ঘরের কাছে গিয়া কহিল, "আজ যে মালীর মেয়ের কোরান পড়া এখন শেষ হ'লো না? রোজই ভাতের বেলা হয়, আমি যে খিদেয় মরি, তা কে দেখে?" একথা নুরল এসলামের ফুফু-আম্মার কানে গেল।

ফুফু-আম্মার নাম পূর্বেও দুই তিনবার করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় বলা হয় নাই। তিনি নুরল এসলামের পিতার চাচাতো ভগিনী; প্রৌঢ় বয়সে বিধবা হইয়া একটি পুত্র ও একটি কন্যাসহ অনন্যোপায়ে নুরল এসলামের পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ন্যায় ধার্মিকা স্ত্রীলোক কম দেখা যায়। ইনি বারো মাস রোজা রাখেন এবং সর্বদা তসবী পাঠে রত থাকেন। ইনি নুরল এসলামের পিতার কনিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু ইঁহার স্বভাব ও ধর্মশীলতা দেখিয়া, নুরল এসলামের পিতা ইঁহাকে সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও যত্ন করিতেন। নুরল এসলামের পিতার মৃত্যুর অল্প-দিন পরেই ক্রমে ফুফু-আম্মার পুত্রকন্যাদ্বয় কাল কবলে পতিত হয়। এক্ষণে নুরল এসলামই তাঁহার পুত্র-কন্যা। নুরল এসলামের গৃহস্থালীই তাঁহার নিজের গৃহস্থালী। অতঃপর আমরা তাঁহাকে কেবল ফুফু-আম্মা বলিয়া ডাকিব।

ফুফু-আম্মা সালেহার কথা শুনিয়া কহিলেন, "তুই ও কি কথা বলিলি? তোর কি আদব আক্কেল কিছুই নাই? হইলই যেমন সৎ-ভাইয়ের বৌ; সম্বন্ধে তাহার বাপ-মা যে তোর তা-ঐ মা ঐ হন। আনোয়ারা সালেহার কথায় ভাবিল' "আমি রোজই বাগানের ফুল দিয়া তার খোঁপা বাঁধিয়া

দিই, ছেলেমানুষ তাই না বুঝিয়া ঐভাবে বুঝি ঠাট্টা করিয়াছে।" কিন্তু সালেহার মা ননদের কথায় গর্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ছুঁড়িটা রোজই খিদেয় কষ্ট পায়, তাই সকাল সকাল বৌকে পাক করিতে বলিতে গিয়াছে, তাতে তুমি আদব-আক্কেল তুল্লে? আদব-আক্কেল কাকে বলে তা কি তোমরা জান?"

ফুফু। আমরা জানি না বটে; কিন্তু আপনার মেয়ের যে তা' আছে দেখা গেল।

সালেহা। আপনি আর বরাই করিবেন না, আপনার ভাই-পুত যে মালীর ঘরে বিয়ে করিয়াছে, তা বুঝি আমি জানি না?

ফুফু। ও মা সে কি কথা।

সালেহা। ভাবীর বাপ-দাদারা ভুঁইমালী ছিল, শেষে জাত যেয়ে মুসলমান হয়ে ভূইঞা হয়েছে; তার মা আবার চোরের মেয়ে; এসব কথা আর চাপা দিলে চলিবে না। আমি সব শুনিয়াছি। ছি, ছি! এমন বৌ ঘরে আনিয়া আবার বড়াই?

ফুফু-আম্মা ত' শুনিয়া অবাক। আনোয়ারা আকাশ পাতাল ভাবিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কথিত আছে—পৃথিবী সর্বংসহা হইলেও সূঁচের ঘা সহ্য করিতে পারে না; আর স্ত্রীলোক পরম ধৈর্যশীলা হইলেও পিতা-মাতার অযথা নিন্দাবাদ সহিতে পারে না। সালেহার কথায় আনোয়ারার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, সে উচ্চবাচ্য না করিয়া সারাদিন অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

অপরাহ্ণ ৪টায় নুরল এস্‌লাম বাড়ী আসিলেন। তাঁহার আগমনে আজ কেহই আনন্দিত নহে। ফুফু-আম্মা তাঁহাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিলেন না। বিমাতার মুখ বিষাদ-বিষে পূর্ণ। সরলা সালেহাও উৎফুল্লা নহে। নুরল এস্‌লাম কাপড় ছাড়িতে ঘরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু হায়, গৃহে প্রবেশ মাত্র যে জন ভক্তির সহিত তাঁহার পদচুম্বন করিয়া নিজ হাতে গায়ের পোশাক খুলিয়া লয়, সে নিকটে আসিল বটে। কিন্তু তাহার চাঁদপানা মুখ আজ বিষাদ-মেঘে আবৃত তাহার প্রেমময় সাদর-সম্বাষণ নীরব; নুরল এসলাম ব্যাকুলভাবে কহিলেন "তোমার মুখ ত' কখনও এরূপ মলিন দেখি নাই, কারণ কি?" আনোয়ারা ভগ্ন হৃদয়ের অদম্য দুঃখ চাপা দিয়া কহিল, "অসুখ করিয়াছে।" নুরল এসলাম তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

বিবাহের কিছুদিন পর হইতে নুরল এসলামের বিমাতা, তাঁহার স্ত্রীকে নানা

প্রকার অকথ্য, অশ্রাব্য কথায় জ্বালাতন করিতেছেন, ছল-ছুতায় ছোটলোকের মেয়ে বলিয়া কত মর্মাঘাতী ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ধৈর্যের প্রতিমা আনোয়ারা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে যেরূপ বিমাতার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কাল কাটাইয়াছে, পতিগৃহে আসিয়াও সেই সৎ-শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া তাহারই মুখাপেক্ষীণী হইয়া, তাঁহারই মনস্তুষ্টি সম্পাদনে দেহ-মন নিয়োজিত করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করিতেছে। স্বামী শুনিলে মনে ব্যথা পাইবেন বলিয়া শাশুড়ীর দুর্ব্যবহারের কথা সে একদিনের জন্যও স্বামীর কানে দেয় নাই। যখন শাশুড়ীর নিষ্ঠুর বাক্যবাণে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল ছিন্ন হইয়া যাইত, তখন সে নির্জনে নীরবে অশ্রুপাত করিয়া শান্তিলাভ করিত।

নুরল এসলাম স্ত্রীর মুখে কোন কথা না জানিতে পারিলেও তাঁহার সরলা ফুফু-আম্মার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন, বিমাতা তাঁহার পারিবারিক সুখ-শান্তির ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন এবং সে আগুন তাহার প্রেমময়ী প্রাণাধিকা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে; কিন্তু ধৈর্যবশতঃ মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতেছে না। এ পর্যন্ত নুরল স্ত্রীর দেখাদেখি নীরবে সব সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজ স্ত্রীর বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া তাঁহার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি ফুফু-আম্মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীতে আজ কি হইয়াছে?'

ফুফু। বাবা, হবে আর কি? তোমার জাতি-পাতের কথা শুরু হইয়াছে।

নুরল। (ব্যাকুল ভাবে) সমস্ত কথা খুলিয়া বলুন।

ফুফু। তুমি নাকি মালীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছ? বৌমার বাপ-দাদারা নাকি ভুঁইমালী ছিল, শেষে জাত যাইয়া মুসলমান হয়, সেই হইতে তাহাদের ভুঁইয়া খেতাব হইয়াছে। তার মা নাকি আবার চোরের মেয়ে?

নুরল এসলাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "এমন কথা কে বলিল?"

ফুফু। সকাল বেলা সালেহা বলিয়াছে।

নুরল। সে এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কোথায় পাইল?

ফুফু। জানি না।

নুরল এসলাম সালেহাকে ডাকিলেন। সালেহা নুরল এসলামের ক্রোধ দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইল। নুরল সহোদরা ভগীনি জ্ঞানে

সালেহাকে এতদিন স্নেহের 'তুই' শব্দ ব্যবহার করিতেন। আজ কহিলেন, "সালেহা! তুমি ঠিক করিয়া বল, তোমার ভাবী যে মালীর মেয়ে, একথা তোমাকে কে বলিয়াছেন?" সালেহা নীরব। সুরল তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন, "বল না ঠিক কথা, না বলিলে তোমার ভাল হইবে না!" সালেহা পিছন ফিরিয়া মায়ের ঘরের দিকে চাহিল, মা ইশারায় বলিতে নিষেধ করিলেন। সুরল আবার কহিলেন, "বল না?" সালেহা কহিল, "বলিতে পারিব না।" সুরল সক্রোধে কহিলেন, "কেন পারিবে না? তোমাকে বলিতেই হইবে।" সালেহা ভয় পাইয়া কহিল, "মা বলিয়াছো,, সুরল কহিলেন, 'যাও।"

অনন্তর সুরল ম'য়ের ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মা, আপনাকে কয়েকটি কথা বলিব। বাবাজানের মৃত্যুর সময় আপনার যে ব্যবহার দেখিয়াছি, তাহাতেই মর্মে মরিয়া আছি! আপনার আচার-ব্যবহার দেখিয়া, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করি নাই। করিলে এতদিনে উৎসন্ন যাইতাম। আপনি শরিফের ঘরের মেয়ে বলিয়া সর্ব্বদাই অহংকার করেন, কিন্তু ইহা অপানার অশিক্ষার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বংশ গৌরব কাহারও একচেটিয়া নহে। আল্লাহতায়ালা বড়-ছোট করিয়া কাহাকেও পয়দা করেন নাই। সকলের মূলেই এক আদম! তবে কার্য বশতঃ সংসারে বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মোগল, পাঠান, শেখ প্রভৃতি শ্রেণীভাগের মূল ইহাই। ফলতঃ বংশমর্যাদা সব দেশে, সব কালে সৎ-অসৎ কার্যফলের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। আমরা সম্রান্ত শেখ বংশোদ্ভব। যে বংশে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাহারাও সম্রান্ত শেখ। আপনার বাপ-দাদারাও বুনিয়াদি শেখ ব্যতিত আর কিছুই নহেন। সুতরাং বংশের গৌরব করা আপনার উচিত নয়। আবার যাহারা ভূমির অধিপতি তাঁহারা ভৌমিক বা ভূঞা। আমার শ্বশুরের পূর্ব পুরুষেরা ভূমির অধিপতি অর্থাৎ রাজা ছিলেন, তজ্জন্য তাহাদের খেতাব হইয়াছে ভূঞা। আপনি যদি কল্পনা করিয়া এই সম্মানিত উপাধি কদর্থ করিয়া থাকেন, তবে আপনার তওবা করা উচিত। আর যদি অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তবে তাহাকে হিংসুক, নীচাশয় বলিতে হইবে। আমার শাশুড়ী-আম্মা জীবিত নাই; কিন্তু তিনি আমার শ্বশুরদিগের অপেক্ষাও সম্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিলেন। আমার সৎ-শাশুড়ী এখন আছেন, তাঁহার পিতৃবংশ আশরাফ না হইলেও অধুনা তাঁহারা আশরাফের ক্রেতা। যাহা হউক, একার

পর্যন্ত আপনার ব্যবহারে আমি মর্মপীড়া ভোগ করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে বিনীত প্রার্থনা, আর আমাকে কষ্ট দিবেন না, সদয়-স্নেহ দৃষ্টিপাতে সংসার করুন।"

নুরল এসলামের কথা শুনিয়া, তাহার বিমাতা ক্রোধে, অভিমানে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি যদি বড় ঘরের মেয়ে হই, তবে এ অপমানের প্রতিফল তোকে ভোগ করিতেই হবে। আমি কসম করিলাম, আজ হইতে তোর ভাত-পানি আমার পক্ষে হারাম। আমি কি একেবারেই মরিয়াছি যে, তোর সোহাগের বৌএর বাঁদী হইয়া সংসার করিব? পৃথক হইলে আমার ভাত খায় কে? কালই ভাইকে ডাকিব, তোর মুখ দোরস্ত করিব, পৃথক হইলে, তবে ভাত-পানি ছুইব।"

নুরল এসলাম কহিলেন, "তাহাই-হইবে, কিন্তু অনাহারে দুঃখ পাইবেন না; এখন এই অন্নে আপনার অধিকার আছে।"

অতঃপর নুরল এসলাম ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি আর দুঃখ করিও না, এখন হইতে যদি ওঁর শিক্ষা না হয়, তবে উপায় নাই।"

আনো। আমি যে ভয়ে আপনার নিকট আম্মাজানের কোন কথা খুলিয়া বলি না, আপনি আমার সেই ভয় দশ গুণ বাড়াইয়া তুলিলেন।

নুরল। কিসের ভয়ের কথা বলিতেছ।

আনো। উনি যেরূপ কসম করিলেন, যদি রাগের মাথায় কালই পৃথক হ'ন, তবে দেশময় আমাদের দুর্নাম রটিবে। লোকে আপনাকে বলিবে, স্ত্রৈণ হইয়া মাকে পৃথক করিয়া দিল; আমাকে বলিবে, বৌটি ডাইন, ভাল সংসার নষ্ট করিল। তখন উপায় কি?

নুরল। ন্যায় পথে থাকিলে লোকে কি বলিবে, সে ভয় আমি করি না।

আনো। না করুন, তথাপি আম্মাজানকে তিরস্কার করিয়া ভাল করেন নাই। হাজার হইলেও তিনি আমাদের গুরুজন; বিশেষতঃ আমার জন্য তাঁহাকে অতদূর বলা ভাল হয় নাই।

নুরল। আমি ত তাঁহাকে তিরস্কার করি নাই। কেবল তাঁহার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া উপদেশ ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়াছি মাত্র।

ক্ষণমাত্র মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "সংসার বড়ই কঠিন স্থান; এক আধটুকু উচ্চবাচ্য না করিলে তিষ্টান কঠিন।'

আনো। আমার বিবাহের পূর্বেও কি আম্মাজান সর্বদা সংসারে অশান্তি ঘটাইতেন?

নুরল। আমার ফুফু-আম্মাজান পবিত্রতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি। মা এ সংসারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতেছেন। আমার প্রতি মা'র হিংসা চিরদিনই আছে, তবে বিবাহের পর তাঁহার হিংসা যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আনো। বাড়া কমাইলে ক্রমে সবই কমিতে পারে।

নুরল। এ বাড়া কমাইবার উপায় নাই।

আনো। এক উপায় আছে।

নুরল। কি উপায়?

আনো। আমি তাঁহার মতিগতি যেইরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আপনি এ দাসী ত্যাগ করিলে, তাঁহার সমস্ত হিংসার আগুন পানি হইতে পারে।

নুরল এসলাম শিহরিয়া উঠিয়া এবং বিস্ফারিত নয়নে দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "চন্দ্র-সূর্য কক্ষচ্যুত হইতে পারে, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ অসম্ভব পরন্তু ওরূপ কথা চিন্তা করিবার পূর্বে এ হৃদয় যেন দোজখের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হয়।"

এই সময় চাকরাণী আসিয়া পাকের আঙিনায় যাইতে আনোয়ারাকে ইঙ্গিতে ফুফু-আম্মার আদেশ জানাইল। আনোয়ারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন রবিবার পূর্বাহ্ণে নুরল এসলামের বৈঠকখানায় গ্রামের গণ্যমান্য প্রধান প্রধান লোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। কিছু বেশী বেলায় একটা তাজী ঘোড়ায় চড়িয়া গোপীনপুর হইতে নুরল এসলামের সৎমার ভাই—আলতাপ হোসেন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা শোচনীয় হইলেও তাঁহার সম্পদকালের আমীরী চালচলন কমে নাই। আমাদের অপরিণামদর্শী আভিজাত্যাভিমানী মহাত্মা অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অধঃপাতের চরম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ইহা যে আমাদের সমাজের দুর্ভাগ্যের একটি কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, বৈঠক বসিল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আমরা মনে করিয়াছিলাম, দেওয়ান

সাহেবের মৃত্যুর পর ছেলের সহিত তাঁহার সৎ-মা পৃথক হইবেন ; কিন্তু ছেলের গুণেই এতদিন সংসারটি বাঁধা ছিল।" যাঁহারা ভিতরের অবস্থা জানেন না, তাঁহারা কহিলেন, "পুরান সংসার, একত্র থাকাই ত ভাল ছিল, হঠাৎ এরূপ পৃথক হওয়ার কারণ কি ?" আলতাপ হোসেন সাহেব কহিলেন, "জামানার দোষ, আজকালকার ছেলেরা বৌ-বশ হইয়া তাহাদের পরামর্শ মত অনেক ভাল সংসার নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।" ২।৪ জন প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার কথায় সমর্থন করিলেন।

যাহা হউক, একত্র থাকার জন্য অনেকে নুরল ও তাঁহার বিমাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন ; কিন্তু বিমাতার উৎকট জেদের ফলে বণ্টনই সাব্যস্ত হইল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইল, নুরল এসলাম পুরান বাড়ীতে থাকিবেন। পুরান বাড়ীর পশ্চিমাংশে তাঁহার সৎ-মার বাড়ী হইবে। নূতন ঘরবাড়ী করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত নগদ আড়াই শত এবং সালেহার বিবাহের খরচ সাড়ে তিন শত, মোট ছয় শত টাকা ১৫ দিনের মধ্যে নুরল এসলামকে তাহার বিমাতার হাতে দিতে হইবে। বিমাতার কাবিন বাবদ অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি লেখা ছিল, তাহা তাহাকে নির্দিষ্ট করিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। এই সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগের নিমিত্তই তিনি পরিণাম চিন্তা না করিয়া সগর্বে-পৃথক হইলেন।

বণ্টনের পর বিমাতা পৃথক পাকের বন্দোবস্ত করিয়া পানি স্পর্শ করিলেন। হায় রে জিদ ! হায় রে অশিক্ষিতা কৌলিণ্যাভিমানী রমণী। তোমাদের জন্য কত সুখের সংসার যে দুঃখে ভাসিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও ভাসিবে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পনর দিন পর নুরল এসলামকে ছয় শত টাকা দিতে হইবে,—এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে যাহা ছিল, বিবাহের ব্যয়ে তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে; তবে তিনি ঋণগ্রস্ত হন নাই—এই যা' লাভ। সোমবারে তিনি চিন্তিত মনে বেলগাঁও অফিসে গমন করিলেন। পতিপ্রাণা আনোয়ারা পতির মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার চিন্তা নিজ হৃদয়ে ধারণ করিল। সে মধুপুরে পত্র লিখিল :—

"দাদিমা! আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র সালাম জানিবে। অনেক দিন তোমাদের পত্র পাই না, এজন্যও চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। সত্বর তোমাদের কুশল সংবাদসহ পত্র লিখিবে।

"গতকল্য আর্ম্মাজান পৃথক হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদের কিছু ঠেকাঠেকি হইয়াছে। পত্রপাঠ আমার নিজ টাকা হইতে, ছয় শত টাকা তোমার দুলা-ভাইজানের নামে—যাহাতে পরবর্ত্তী সোমবার বেলগাঁও পৌঁছে, এইরূপ তাগিদে পাঠাইবে। বাবাজান ও মা'কে এবং ওস্তাদ চাচাজান ও চাচি আম্মাকে আমার সালাম জানাইবে। বাদশা ভাই কেমন আছে? সে স্কুলে যায় তো? ভোলার মা, গদার বৌ, মার সই—ইহাদের কুশল সংবাদ লিখিবে। আমাদের বালিকা-বিদ্যালয় কেমন চলিতেছে? জেলা হইতে হামিদার পত্র পাইয়াছি। সই কিছু খুলিয়া লিখে নাই; কিন্তু চিঠির ভাবে বুঝিলাম, সে অন্তঃসত্ত্বা। উকিল সয়া দৈনিক ৫০্ টাকা ফি লইয়া মফঃস্বলে মোকদ্দমায় গিয়াছেন। আমরা ভাল আছি।" ইতি—

তোমার জীবনসর্বস্ব—"আনার"

সপ্তাহ শেষ—শনিবার নুরল এসলাম বাড়ী আসিলেন। টাকা সংগ্রহ না হওয়ায় তাঁহার মুখ মলিন। আনোয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চেহারা এত খারাপ হইতেছে কেন?

নুরল। আর কয়েকদিন পরেই সালেহাদিগকে টাকা দিতে হইবে, এ পর্যন্ত তাহা সংগ্রহ হইল না। ম্যানেজার সাহেব সরকারী তহবিল হইতে বিনা সুদে দুই

শত দিতে চাহিয়াছেন; অবশিষ্ট টাকা কোথায় পাইব, সেই ভাবনায় বড়ই চিন্তিত হইয়াছি।

আনো। মা মরণকালে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'মা সংসারে যত বিপদে পড়িবে, ততই খোদাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, বিপদ আপনা-আপনি ছাড়িয়া যাইবে।' নুরল সোৎসাহে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। আনোয়ারা পতির মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ কি! আপনার মুখে হঠাৎ যেন বেহেস্তের জ্যোতি ফুটিয়াছে।"

নুরল। তোমার মুখে স্বর্গীয়া আম্মার উপদেশের কথা শুনিয়া আমার মনের অবসাদ যেন নিমিষে অন্তর্নিহত হইয়াছে! আমি আজ সারারাত্রি বন্দেগীতে কাটাইব।

আনো। ভাগা-ভাগির গণ্ডগোল-অসুখে এ কয়েকদিন আমিও ওজিফা পড়িতে পারি নাই। আজ রাত্রিতে প্রাণ ভরিয়া কোরান শরিফ পড়িব।

আহারান্তে রাত্রিতে ধর্মশীল দম্পতি, সঙ্কল্পিত ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

নুরল এসলাম বেলগাঁও যাইবেন। আনোয়ারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার পাকের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পাকান্তে নিজ হস্তে স্বামীকে স্নান করাইল। স্নানান্তে উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। নুরল এসলাম আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আনোয়ারা পান তৈয়ারী করিতে বসিয়া হাসি হাসি মুখে কহিল, "আজ রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এক পরমা ধার্মিকা বৃদ্ধা আপনাকে অর্থাভাবে চিন্তিত দেখিয়া বলিতেছেন, 'বৎস, চিন্তিত হইও না; তোমার প্রাপ্য কিছু টাকা আমার নিকট মওজুদ আছে, তাহা হইতে কতক টাকা তোমার সংসার খরচের জন্য দিলাম।' আমার বিশ্বাস, আপনি বেলগাঁও যাইয়া আজ কি কাল তাহা পাইবেন। দাসীর অনুরোধ, স্বপ্ন সফল হইলে টাকা গ্রহণে সঙ্কোচ করিবেন না।"

নুরল এসলাম স্ত্রীর স্বপ্নের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। খোদা ভরসা করিয়া বিস্মিতচিত্তে অশ্বারোহণে বেলগাঁও রওয়ানা হইলেন। তিনি বরাবর ঘোড়ায় চড়িয়া বেলগাঁও যাতায়াত করেন।

নুরল এসলাম বেলগাঁও উপস্থিত হইয়া সবেমাত্র অফিসের কার্যে মনোযোগী হইয়াছেন,এমন সময় ডাকপিয়ন যাইয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাগ হইতে একখানি মণি অর্ডারের ফরম বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি

ফরম পড়িয়া দেখিলেন, ছয়শত টাকার মনি অর্ডার। প্রেরিকা দাদিমা, গ্রাম, মধুপুর। নুরল তখন স্ত্রীর স্বপ্নের অর্থ বুঝিলেন এবং খোদাতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, "দয়াময়! আমি নগণ্য নরাধম, তুমি আমাকে এমন স্ত্রী-রত্ন দান করিয়াছ।"

শনিবার নুরল টাকা লইয়া বাড়ী আসিলেন। আনোয়ারা টাকার ব্যাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, 'দাসীর স্বপ্ন ত বৃথা যায় নাই।

নুরল। শুনিয়াছি বেহেস্তের হুরেরা স্বপ্নের নায়িকা; সুতরাং তাহা বৃথা হইতে পারে না।

এই বলিয়া তিনি ছয়শত টাকার তোড়া আনোয়ারার নিকটে দিলেন এবং কহিলেন, "এ টাকা আমি লইব না।"

আনো। কেন?

নুরল। কেন আর বলিতেছ কেন? তিন হাজার টাকার কাবিন গেল। তারপর আরও কত কি উপহার, আবার এককালে এই ছয়শত টাকা।

আনো। তাতে কি?

নুরল। তাহা হইলে যে, বেচারার নিজস্ব বলিয়া কিছুই থাকে না।

আনো। প্রয়োজন?

নুরল। সংসার বড় কঠিন স্থান।

আনোয়ারার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে ছলছল নেত্রে উর্ধ্বে তাকাইয়া কহিল, "তবে আমি কি পর? আমার জিনিষ কি আপনার নয়?" নুরল তাহার কথার ভাবে ও অবস্থাদৃষ্টে একান্ত মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন।

অনন্তর নুরল এসলাম কহিলেন, "টাকাগুলি কার?"

আনো। আপনার।

নুরল। দাদী-আম্মা পাঠাইয়াছেন?

আনো। আপনার টাকা তাঁর কাছে মজুদ ছিল।

নুরল। বুঝিলাম না।

আনো। বাবাজান যদি আমার বিবাহ বাবদ আপনার নিকট টাকা চাহিতেন, আর আপনি যদি তাহা দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে এ বিবাহে বিঘ্ন ঘটিত। তজ্জন্য দাদিমা সংকল্প করিয়াছিলেন, আপনি টাকা দেওয়া অস্বীকার করিলে, গোপনে আপনার নিকট (বাপজানকে দিবার জন্য) ইহা পাঠাইতেন। এ

সেই টাকা। এই টাকা বিবাহের জন্য আবশ্যক হয় নাই, আপনার নামেই মজুদ রাখা হইয়াছিল।

নুরল। বাপজান যদি হাজার টাকা চাহিয়া বসিতেন?

আনো। দাদিমা আপনার প্রতি আমার মনের ভাব টের পাইয়া বসিয়াছিলেন, যত টাকা লাগে দিয়া আনোয়ারাকে সুখী করিব।

নুরল। তিনি সেকেলে লোক, প্রেম-মহাত্ম্যের পক্ষপাতী?

আনো। তিনি বলিয়াছেন যে, 'আমিও স্বয়ম্বরা মতে বিবাহিতা হইয়াছি'।

আনোয়ারার সনির্বন্ধ অনুরোধে নুরল এসলাম শেষে টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পরদিন ২।৪ জন সম্ভ্রান্ত প্রধানের মোকাবিলায় তিনি বিমাতাকে নগদ ছয়শত টাকা গুণিয়া দিলেন। পত্নীর পতিপ্রাণতায় তাঁহার চিত্তের ভার কমিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একযোগে ৬০০৲ টাকা হাতে পাইয়া নুরল এস্‌লামের বিমাতা, গোপীনপুর হইতে ভ্রাতাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভগ্নিপতির মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু ভগ্নি আছে, তাহার নামেই দুই হাজার টাকার কাহিনের তালুক আছে, বিবাহযোগ্য সুন্দরী ভগিনেয়ী আছে, তদপুরি নিজের বিবাহযোগ্য পুত্রও আছে। এই সকল উপকরণ যোগে আলতাফ হোসেন সাহেব পূর্ব হইতেই দুরাশার সংসারে এক সুখের সুরম্য সৌধ নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছিলেন। বাসনা পথে যে বিঘ্ন ছিল, ভগ্নী পৃথক হওয়ায় তাহা দূর হইয়াছে; সুতরাং ভগ্নীর এ আহ্বানে তিনি সেই কথা মনে করিয়া অনতিবিলম্বে রতনদিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে ভ্রাতা-ভগ্নীতে নির্জনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ভ্রাতা। ডাকিয়াছ কেন?

ভগ্নী। অনেক কথা আছে।

ভ্রাতা। নুরল টাকা দিয়াছে?

ভগ্নী। জী হাঁ।

ভ্রাতা। ধাঁ করিয়া এত টাকা কোথায় পাইল? তলে তলে বুঝি অনেক টাকা পুঁজি করিয়াছিল?

ভগ্নী। তা কি আর বলিতে হইবে। তালুকের খাজনা বছরে প্রায় ৫।৬ শত টাকা, তার মাহিনা ৫।৬ শত টাকা, এত টাকা কোথায় যায়? ইচ্ছামত খরচের জন্য একটি পয়সাও হাতে পাইতাম না। কেবল এক মুঠো ভাত ও একখানি বস্ত্র।

ভ্রাতা। তাতে আর ভুল কি? আমি ভাবিয়া দুঃখিত হইতাম, তোমার থাকিয়াও নাই। যাক, পৃথক হইয়া ভালই করিয়াছ, এখন দু' পয়সা হাতে পাইবে।

ভগ্নী। ভাইজান, আমার বাড়ী-ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। আমাকে স্থিতি না করিয়া আর বাড়ী ফিরিতে পারিতেছেন না। তারপর স্থিতি হইলে সংসার কিভাবে চলিবে, তাহারও ঠিকঠাক করিয়া দিতে হইবে।

ভ্রাতা। পৃথক হওয়ার পর হইতে তোমাদের ভাবনায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। এখন দেখিতেছি বাড়ীঘর যেন করিয়া দিলাম, এক-আধজন পুরুষ মানুষ না থাকিলে চলিবে কিরূপে? তালুকের খাজনাপত্র আদায় হেপাজত এসবও করিতে হইবে; উপায় কি? তালুক যখন পৃথক করিয়া লওয়া হইল, তখন সুরল তোমার দিকে একেবারেই ফিরিয়া চাহিবে না।

ভগ্নী একটু রাগভরে কহিলেন, "সে না দেখিলে কি আমার চলিবে না? আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি এবং সেই বলেই পৃথক হইয়াছি।"

ভ্রাতা আপন সঙ্কল্প চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন, 'তুমি কি উপায় ঠিক করিয়াছ?'

ভগ্নী। যদি কথা রাখেন তবে বলি।

ভ্রাতা। তোমার কথা না রাখিলে চলিবে কেন?

ভগ্নী। আপনার খাদেম আলীকে আমি চাই; সালেহার সতি মানান মত হইবে।

ভ্রাতা মনে মনে হাতে স্বর্গ পাইলেন। তথাপি ভগিনীর নিকট একটু আদর জানাইয়া কহিলেন, "তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

ভগ্নী। আমি গত বৎসর আভাসে ভাবী সাহেবাকে একটু বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "তোমাদের ছেলে তোমরা লইবে তাতে আপত্তি কি।"

ভ্রাতা। তিনি রাজী হইলে আর কথা নাই।

ভগ্নী। খাদেমকে পাইলে আমার সবদিক বজায় থাকিবে। সে সংসার, তালুক সব দেখিবে; আমিও কুল রক্ষা করিয়া মেয়ে বিবাহ দেওয়ার দায় হইতে খালাস পাইব।

ভ্রাতা। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছামতই কাজ হোক্।

আলতাফ হোসেন সাহেবের পূর্বকথিত পুত্রের নাম খাদেম আলী। খাদেম আলী দুইবার মাইনর পরীক্ষায় ফেল হইয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়াছে। এক্ষণে সে নবীন যুবক, দেখিতে সুন্দর। কখন দুবেলা, কখন একবেলা, কখনও বা দুই একদিন পর বাড়ীতে আহার করে, তদ্ব্যতীত সে বাড়ীর সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখে না। গ্রামের দুষ্ট যুবকদের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। পার্শ্ববর্তী হাট-বাজার, শহর-বন্দরের কু-স্থানগুলি তাহার সুপরিচিত।

নগদ টাকা হাতে পাইয়া আলতাফ হোসেন সাহেব ২০।২৫ দিনের মধ্যে ভগ্নীর ঘরবাড়ী প্রস্তত করিয়া দিলেন। মহানন্দে ভগ্নী নিজ বাটীতে আসিলেন।

এখানে আসিয়া তিনি প্রস্তাবিত বিবাহ, কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। অভিমান ও জিদের বশে নুরল এসলামকে উপেক্ষা করিয়াই বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নুরল এসলাম লোক পরম্পরায় যখন বিবাহের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার মহান হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বিমাতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াও নূতন বাড়ী দর্শন উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিমাতা তাঁহাকে খানিকটা গর্বের সহিত কহিলেন, "বাপু, পায়ে ঠেলিয়াছ, কুঁড়ে-ঘর দেখিয়া কি করিবে?" নুরল এসলাম কহিলেন, "মা, উল্টা বলিতেছেন, তা বলুন, আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি, শুনুন।"

বিমাতা। কি কথা?

নুরল। শুনিলাম, খাদেমকে নাকি আপনি ঘর-জামাই রাখিতেছেন?

বিমাতা। হাঁ, তাহাই ত' মনে করিয়াছি।

নুরল। আমার অমতে আপনি সালেহার বিবাহ দিতে পারেন না; তবে আপনি সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবেন বলিয়া যখন পৃথক হইয়াছেন, তখন বিবাহে বাধা দিব না। তবে এ বিবাহে আমার মত নাই জানিবেন। বিবাহ দিলে সালেহাকে দোজখে ফেলা হইবে। কারণ, খাদেম মূর্খের মধ্যে গণ্য, বিশেষতঃ তাহার চরিত্র মন্দ।

বিমাতা। তা' হইলেও বড় ঘরের ছেলে ত'? আর সালেহা আমার চোখের উপর থাকিবে। আমি ত' বিবাহ দিবই।

নুরল বাক্যব্যয় নিস্ফল জানিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

সময়ান্তরে ভগ্নী ভাইকে কহিলেন যে, "উপস্থিত বিবাহ কার্যে নুরল এসলাম নিষেধ করিতে আসিয়াছিল।"

ভ্রাত। তোমার সুখ-সুবিধা যাতে না হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত শয়তান যে কত চেষ্টা করে, তাহার সীমা নাই।

ভগ্নী। আমিও তাই মনে করিয়া তাহার কথা গ্রহ্য করি নাই।

যথাসময়ে যথাবিধি খাদেম আলীর সহিত সালেহা খাতুনের বিবাহ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর ছয় মাস এইরূপে কাটিল। এ কয় মাস খাদেমের স্বভাব প্রকাশ পায় নাই, পরে পুরাতন স্বভাব আবার দেখা দিল।

অনন্তর খাদেম আলীর বিলাসপূর্ণ বেলগাঁও যাতায়াত আরম্ভ করিয়া স্বীয় দুশ্চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিল। টাকার অভাব হইল না শাশুড়ীর তালুকের খাজনা, বাজে খাজনাও জোর-জুলুম করিয়া সে যাহা আদায় করিত, তাহার হিসাব-নিকাশ তাহার শাশুড়ীকে বড় দিত না। অধিকাংশ টাকা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিতে লাগিল। শাশুড়ী মনে করিয়াছিলেন—ক্ষুদ্র সংসার, তালুকের খাজনা-পত্রে সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে; কিন্তু জামাতার গুণে তাহা চলিল না। অল্পদিন মধ্যেই ভগ্নী ভ্রাতাকে সংসার অচল হওয়ার কথা জানাইলেন। ভ্রাতা আসিয়া পুত্রকে শাসন করিলেন; কিন্তু বাৎসল্যপ্রযুক্ত তাহার সর্ববিনাশী চরিত্র-দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে ভগ্নীকে কহিলেন "আমি তোমার খুব স্বচ্ছলভাবে দিনপাতের নিমিত্ত এক বুদ্ধি স্থির করিয়াছি।" ভগিনী শুনিয়া আশ্বস্তচিত্তে কহিলেন, "কি বুদ্ধি করিয়াছেন, ভাইজান।"

ভ্রাতা। ঘর-বাড়ী প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের বিবাহ-খরচ বাদ তোমার হাতে এখন কত টাকা আছে?

ভগ্নী। শতখানেক, পরিমাণ টাকা হইবে?

ভ্রাতা। তাছাড়া, তোমার নিজ তহবিল কিছু নাই কি?

ভগ্নী। অনেক দুঃই-কষ্ট করিয়া হাজার-খানেক টাকা রাখিয়াছিলাম।

ভ্রাতা। তুমি ঐ টাকা হইতে সাতশত টাকা আমার হাতে দাও। বেলগাঁও নূতন উন্নতশীল বন্দর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু জুতার দোকান একটিও নাই, বড়ই সুযোগ। কলিকাতায় আমার দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব বড় দোকানদার। ঐ টাকা দিয়া এবং দোস্তের নিকট হইতে বাকী করিয়া আনিয়া, হাজার বারশত টাকার একটি জুতার দোকান খুলিয়া দেই। খাদেম আমার দুইবার ইংরেজী পরীক্ষা দিয়াছে। সে চাকর-বাকর রাখিয়া স্বচ্ছন্দে দোকান চালাইতে পারিবে।

ভগিনী শুনিয়া কিছু মলিন মুখে কহিলেন, "ভাল মানুষের ছেলের জুতা বিক্রী করা কি অপমানের কথা নয় ?"

ভ্রাতা। কলিকাতায় যে সকল বড় লোকেরা জুতার দোকান চালায়, তাহাদের কাছে আমরা মানুষই নই।

ভগ্নী। নুরল এস্‌লাম যে ঠাট্টা করিবে ?

ভ্রাতা। তাহার গোলামীর অপেক্ষা এ কার্য ভাল।

ভগ্নী। ইহাতে কত লাভ হইবে ?

ভ্রাতা। তোমার সাতশত টাকা মজুতই থাকিবে। তাহা হইতে মাসে মাসে ৭০।৮০ টাকা লাভ দাঁড়াইবে। দোকান ক্রমে বড় হইলে আরও বেশী লাভ হইবে। ফল কথা সাহেবের গোলামী করিয়া নুরল এস্‌লাম যাহা রোজগার করে, এ কার্যে তাহার অপেক্ষা বেশী লাভ হইবে। লাভের টাকাতেই তোমাদের খুব স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তালুকের টাকা তুমি সিন্দুকে তুলিতে পারিবে।

সতীনের ছেলের চাইতে জামাতা বেশী উপার্জন করিবে শুনিয়া ভগিনী ভ্রাতার হাতে তখনই সাতশত টাকা গণিয়া দিলেন।

আলতাফ হোসেন সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধি মন্দ ছিল না ; কিন্তু চরিত্রহীন পুত্রের দোষে যে সমূলে ব্যবসায়ে হানি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না।

আড়ম্বর সহকারে বেলগাঁও বন্দরে জুতার দোকান খোলা হইল। খাদেম আলী দোকানে সর্বেসর্বা হইল। ক্রয়-বিক্রয় প্রথম প্রথম খুবই চলিতে লাগিল। খাদেম গেরদায় ঠেস দিয়া, আলবোলার রজত-নল মুখে ধরিয়া দোকানে বসিল। বিনামা-বিক্রীত নগদ মুদ্রা ঝনাৎ-ঝন-ঝনাৎ শব্দে তাহার সম্মুখে আসিতে লাগিল ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবীন যুবকের বিকৃত মস্তিষ্ক রৌপ্য-চাকৃতির চাকচিক্যে একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গেল। সে অধিকতর পাপাচারী হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খাদেম আলীর এই সুখ-সম্পদের সময়, তাহার আর ৩।৪টি নূতন ইয়ার জুটিল। ইয়ারগণ তাহার সমবয়স্ক নবীন যুবক। প্রায় সকলেই ধনীর সন্তান, সকলেই পিতামাতার অন্যায় আব্দারে, অনুচিত বাৎসল্যে লালিত-পালিত—আদরের পুতুল। বিলাস-ব্যসন ও ইন্দ্রিয়সেবা ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য। ইহারা না পারে এমন দুষ্কার্য ছিল না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ খাদেম আলীর অর্থোন্নতি দেখিয়া পাপিষ্ঠেরা ঘন ঘন তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা খাদেম আলীকে নিজ দলে টানিয়া লইল। ক্রমে তাহাদের সহিত খাদেম আলীর অকৃত্রিম হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল।

এই সময় একদিন ইয়ারদল, খাদেম আলীর দোকানে বসিয়া তাহাকে বিশেষভাবে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই খাদেম! মিঠাই খাইতে খাইতে নাড়ীতে ময়লা ধরিয়াছে। তোমার নূতন দোকানে নূতন রোজগার, আজ রাত্রিতে দোকানে তোমাকে পোলাওয়ের ভোজ দিতে হইবে।

খাদেম। এ ত' আনন্দের কথা! কিন্তু নুরুল এস্‌লাম ভাইকে দেখে ভয় হয়। তোমরা জান, তিনি আমার কুটুম্ব—সাহেবের বড় বাবু। আমার স্বভাব মন্দ বলিয়া তিনি আমার বিবাহে নারাজ ছিলেন। আমার শাশুরী বলিয়াছেন, নুরল এস্‌লাম যেখানে, তুমিও সেখানে আছ; সে যেন তোমাকে মন্দ বলিতে না পারে, এমনভাবে চলিবে। আমাদের আমোদ-আহ্লাদ, গান বাজনার কথা যদি নুরল এস্‌লাম ভাই সাহেবের কানে যায়, তবে মুস্কিল।

সমসের। তাঁর চাপরাসীর মুখে শুনিলাম, তিনি আজই বাড়ী যাইবেন।

করিম। তবে আর ভয় কি?

গনেশ। কি ভাই খাদেম, মোড়গের না খাসির যোগার দেখবো?

গণেশ হিন্দুর ছেলে, লেখাপড়া জানে; আজন্ম ভীতু পরন্তু মাথা পাগলা; পাপ ঘনিষ্ঠতায় তাহার জাতিভয় ধর্মভয় বিলুপ্ত হইয়াছে।

খাদেম। তা হ'লে তোমরা যা ভাল বুঝ।

রাত্রিতে মোরগ পোলাওয়ের দাম দেওয়া হইল। দোকান ঘরের প্রকোষ্ঠে

পাক ও পানাহার শেষ করিয়া ইয়ারগণ গান-বাজনা, গল্প-গুজব আরম্ভ করিল। কথাপ্রসঙ্গে আব্বাস আলী কহিল, "আচ্ছা, তোমরা এ যাবৎ যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছে, তাহার মধ্যে কাহাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া জান?" আব্বাস আলীর কথায় ইয়ারগণ খুশী হইয়া স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিতে লাগিল। গণেশ কহিল, "বেশ কথা তুলিয়াছ হে আব্বাস, তোমাকে ধন্যবাদ। এমন না হইলে তোমাকে দলপতি বলিয়া মানে কোন্ শালা!"

সমসের গণেশের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল সমসের, তোমারি মত আগে শুনা যাক্!"

সমসের। আমাদের পাড়ার আলী মামুদের মেয়ে জমিলা।

করিম। না, না, রামজয় ঘোষের বউ।

গণেশ। এসব চেয়ে বেশী সুন্দরী, আমাদের জগত্তারণ বাবুর ভগ্নী নিস্তারিণী ঠাকুরাণী। আহা, বলিব কি, এমন সুন্দরী তোমাদের দুনিয়ায় নাই হে, বেশী আর কি বলিব: "তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে

তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।"

সমসের। ভেরী গুড।

গণেশ। "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

পয়জার উদ্দিন। এক্সেলেন্ট!

তিলক দাস নামে আর একজন মূর্খ লম্পট সেদিন ইয়ারদলভুক্ত হইয়াছিল। সে গণেশের রূপ বর্ণনা শুনিয়া কহিল, "গণেশ-দা ও কি ঘোড়ার ডিম ক'লা? তোমার ওসব কিড়িমিড়ি ত' বুঝলেম না।'

গণেশ। তিলক-দা এমন প্রাণমাতান কথা বুঝিলে না। তোমার মত গর্ভস্রাবত' আর দেখি নাই। যদি না বুঝিয়া থাক তবে শুন:—

ঠাকুরুণের মাথার চুল যেন অমাবস্যার আঁধার। মুখখানি তার পূর্ণিমার চাঁদ। কথাতে লবণ-ঝাল দুই-ই আছে। গাল দুটি যেন হলুদ মাখান। দাঁত-গুলি তার পুঁটি মাছ। বুকখানি লাউয়ের জাংলা আর কি। আহা! ঠাকুরুণের পেটটি যেন সুন্দর একটি হাড়ী। নিতম্ব যেন মশলাপেষা আস্ত পাটা। পা দু'খানি মস্ত দুটো কলাগাছ। গায়ের রং আগুনের মত। শরীর ঠাণ্ডা—জলের ন্যায়। অধিক কি বলিব, দিবসেই যেন ধরিয়া খাইতে চায়।

আসার জন্য স্ত্রী এই ফিকির খাটাইতেছে। স্বীকার করিয়া কহিলাম, কাল দেখাইতে পার কিনা? সে কহিল, চেষ্টা করিব, আপনি সারাদিন বাড়ীতে থাকিবেন।

পরদিন একপ্রহর বেলার সময়ে স্ত্রী আমাকে কহিল, ভাই কাল বাড়ী আসেন নাই, চাকর দুইজন স্থানান্তরে গিয়াছে, আপনি এ অবসরে বৈঠকখানার আট-চালার পশ্চিম দিকের আড়ার উপর নিঃশব্দে উঠিয়া দেখিয়া আসুন, নীচে থাকিলে দেখা যাইবে না, ভাবী এখন তাঁহার খিড়কীর বাগানে চুল শুকাইতেছেন, ঐ স্থান দুই মানুষ উঁচু বেড়ায় ঘেরা। স্ত্রীর আদেশ মত আমি যথাসময়ে যাইয়া এইরূপ কষ্ট করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি।

আব্বাস। ভাই খাদেম, তুমি আমার হৃদয়বন্ধু। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ঐরূপ করিয়া একটিবার দেখাও।

খাদেম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তবে আমাকে পুনরায় আজ বাড়ী যাইতে হইবে।" আব্বাস আলী কহিল, "ভাই খাদেম, যতবার ইচ্ছা বাড়ী যাও, যেমন করিয়া চালাইতে হয়, আমি তোমার দোকান চালাইব। দেখ, গত তিন দিনে তোমার চাইতে অনেক বেশী বিক্রয় করিয়াছি।"

খাদেম বৈকালে বাড়ী গেল। পরদিন দোকানে আসিয়া কহিল, "ভাই আব্বাস, তোমার জোর কপাল; হুর দর্শনের শুভযোগ উপস্থিত। অদ্য ভাই সাহেব কলিকাতা যাইবেন, বৈকালে আমরা দুইজন আমাদের বাড়ীতে যাইব। তারপর নির্ভাবনায় তোমাকে হুর দেখাইব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে নুরল এসলাম কোম্পানীর কার্যে কলিকাতা গমন করিলেন। পরামর্শানুযায়ী বৈকালে আব্বাস ও খাদেম রতনদিয়ায় উপস্থিত হইল। ঘন ঘন বাড়ী আসায় সালেহার স্বামী-ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খাদেম স্ত্রীর সাহায্যে নুরল এসলাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখার সময় ঠিক করিয়া আব্বাস আলীর সহিত যথাসময়ে পূর্বকথিত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। আব্বাস আলী নিঃশব্দে আড়ার উপর উঠিয়া বসিল। বাঞ্ছিতরত্ন নয়নগোচর হওয়ায়, আব্বাস সঘননিঃশ্বাসে কাঁপিতে লাগিল। খাদেম দেখিল আব্বাস পড়িয়া যায়; এ জন্য সে আব্বাসকে দেওয়ালের কাঠ চাপিয়া ধরিতে ইঙ্গিত করিল। আব্বাস তাহাই করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নামিয়া আসিয়া উভয়ে খাদেমের নুতন বৈঠকখানায় যাইয়া উপবেসন করিল। অতঃপর কথা আরম্ভ হইল।

খাদেম। কেমন দেখলে ?

আব্বাস। বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তুমি কিরূপ দেখিয়াছিলে ?

খাদেম। ভাবী উত্তরমুখে চৌকির উপর বসিয়া আছেন, তাঁর চুলগুলি কাঠের আলনায় রূপার দাঁড়ে করিয়া রৌদ্রে ছড়ান রহিয়াছে।

আব্বাস। আমিও প্রথমে সেইরূপ অবস্থায় দেখিলাম; শেষে তিনি চুলগুলি গোছাইয়া দক্ষিণমুখে বাগানের দিকে তাকাইলেন। তাঁর চুল প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। ওই সময়ে আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবশ হইয়া কাঁপিতেছিলাম। তুমি কাঠ ধরিতে ইশারা না করিলে, আমি ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতাম। ভাই খাদেম, তোমার সেইদিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিক স্ত্রীলোক যে এত সুন্দর আছে, জানি না। আরব্যোপন্যাসে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোকের অদ্ভূত কাহিনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এমন রূপ, এমন চুলের কথা কোথাও পাই নাই।

খাদেম। নুরল এসলাম ভাইয়ের জীবন সার্থক, এমন রত্ন লাভ করিয়াছেন।

আব্বাস। ভাই খাদেম, এ রত্ন যে স্পর্শ করে নাই, তার জীবন বৃথা।

খাদেম একটু দম ধরিয়া থাকিয়া কহিল, "হাজার টাকা ব্যয় করিলেও পারবে না।"

আব্বাস। পাঁচ হাজার!

খাদেম। ও কথাই বলিও না।

আব্বাস। তাই কথায় বলে, টাকায় বাঘের চোখ মেলে। টাকায় কি না হয়?

নবম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলামের কলিকাতা যাইবার চারিদিন পরে একটি বৈষ্ণবী "রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া তাঁহার বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণবীর কপালে, কণ্ঠে ও বাহুতে হরিনামের তিলক কাটা, গায়ে নামাবলী, কাঁধে কন্থার ঝুলি, মাথার চুল উর্দ্ধমুখে খোঁপা করা।

এই সময় আনোয়ারা দক্ষিণদ্বারী ঘরের দাওয়ায় তাহার ফুফু-শাশুড়ীর নিকট বসিয়া, দাসীর ব্যবহারের জন্য একটি বালিসের খোল সেলাই করিয়া দিতেছিল। তাহার সরলা ফুফু-শাশুড়ী বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কহিলেন, "কি গো, তোমাকে যে অনেকদিন পরে দেখিলাম?"

বৈষ্ণবী। মা দুই বৎসর নবদ্বীপে ছিলাম অল্পদিন হইল দেশে আসিয়াছি, এখন ঘন ঘন দেখিবেন। আপনাদের দুয়ারে না আসিলে কি আমাদের উপায় আছে?

ফুফু-শাশুড়ী দাসীকে ভিক্ষা দিতে ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। আনোয়ারা তখন সেলাই রাখিয়া ভাণ্ডার-ঘর হইতে ভিক্ষা আনিয়া বৈষ্ণবীর সম্মুখে রাখিল। বৈষ্ণবী আনোয়ারার আপাদমস্তক বিস্ময় বিস্ফারিত তীব্র দৃষ্টিতে সতর্কতার সহিত দেখিয়া লইল। এবং ফুফু-শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'মা, ইনি কে?"

ফুফু। ছেলের বৌ।

বৈষ্ণবী। সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হউক।

আনোয়ারার কপালে সিন্দুর ছিল না। মুসলমান-মহিলাগণ সিন্দুর ব্যবহার করেন না। বৈষ্ণবীর এইরূপ উক্তি তাহার বাঁধা গত। অতঃপর সে ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

বৈষ্ণবীর নাম দুর্গা। তাহাকে দুর্গার মত সুন্দরী দেখাইত বলিয়া তাহার পৈতৃক গুরুদেব দুর্গা নাম রাখিয়াছিলেন। দুর্গা রাজবংশী ধীবরের মেয়ে। বাল্যকালে বিধবা হইয়া ভরা-যৌবনে প্রতিবেশী এক স্বজাতি যুবকের অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আসাম নওগাঁয় চলিয়া যায়। তথায় সাত বৎসর অবস্থানের

পর যুবক চিররোগা হইয়া পড়িলে, দুর্গা তাহাকে ত্যাগ করিয়া এক উত্তরদেশীয় যুবকের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে চাকরী উপলক্ষে তাহাকে কামরূপ লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া দুর্গা অনেক তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষা করে। কিছুদিন অবস্থানের পর, রক্ষক ও রক্ষিতার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়, রক্ষিতা তথা হইতে পুনরায় নওগাঁ পলাইয়া আসে এবং এক বিখ্যাত বাবাজীর আখড়ায় যাইয়া বৈষ্ণবী হয়। আখড়ায় অবস্থান করিতে করিতে দুর্গা অন্য এক নবীন বৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিয়া, শেষে তাহাকে লইয়া পিতার দেশে চলিয়া আইসে ; কিন্তু পিত্রালয়ে বা পিতার গ্রামে যাইতে সে আর সাহস পাইল না। আব্বাস আলীর পিতা রহমতুল্লা মিঞা, নিজ গ্রাম ভরাডুবার উপকণ্ঠে, নিজ তালুক মধ্যে দুর্গার আখড়া স্থাপন করিয়া দিলেন। সেই হইতে সে তথায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। অনেকদিন হইল দুর্গার শেষ বৈষ্ণব ঠাকুরের লোকান্তর ঘটিয়াছে। অতঃপর সে আর নির্দিষ্ট অন্য বৈষ্ণব গ্রহণ করে নাই। এখন দুর্গা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধকালের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মানা। ভিক্ষা ও কামরূপী মন্ত্রে চিকিৎসা তাহার জীবিকা-নির্বাহের ভান মাত্র। হীরা যেমন সুন্দরের মাসী ছিল, দুর্গাও সেইরূপ আব্বাস আলীর মাসী হইল এবং তাহার অনুগ্রহে মাসীর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল।

দুর্গা ভিক্ষা লইয়া আখড়ায় উপস্থিত হইলে, আব্বাস আলী যাইয়া হাজির হইল।

আব্বাস বলিল, "মাসী খবর কি ?"

মাসী। যাদু একদিনেই খবর। ৩।৪ মাসে পাও যদি তাহাও ভাল।

আব্বাস বিলম্বের কথায় বিষণ্ণ হইল, তথাপি উদ্দাম বাসনাবশে কহিল, "মাসী, দেবীদর্শন ঘটিয়াছে ত ?"

মাসী। যাদু, দেবী নয়, তার চেয়েও বেশী। ভুবন ঘুরিয়াছি, এ জীবনে অমনটি দেখি নাই। হিন্দু-মুসলমান, রাজা-বাদশার ঘরেও অমন পাত্রী জন্মায় না ; যেন সাক্ষাৎ পরী, এখন তোমার কপাল।

আব্বাস। আশা পুরিবে ত ?

মাসী। দুর্গা যাহা মনে করে, তাহা সম্পন্ন করে। তবে আজকার ভাবে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে কাজ হাসিল করিতে বিলম্ব ঘটিবে।

আব্বাস। কত বিলম্ব ?

মাসী। ঠিক বলিতে পারি না। মাস দুই তিন লাগিতে পারে।

আব্বাস। মাসী, এত বিলম্ব প্রাণে সহিবে না; টাকা যত লাগে লও, সত্বর আশা পূরণের চেষ্টা দেখ। একবার হাতে পাইলে আর ছাড়িব না দেশ ত্যাগ করিতে হয় তাও কবুল।

মাসী। যাদু, শীতে কষ্ট পাইতেছি, হাত খালি, উপায় কি? তারপর ভবানীর মা পরশু নবদ্বীপে যাইবে, তাহাকেও কিছু না দিলে নয়।

আব্বাস কোমর হইতে ২৫টি টাকা খুলিয়া মাসীর হাতে দিল এবং কহিল, "টাকা যত লাগে দিব, কিন্তু—"

মাসী। বিলম্বে কার্যসিদ্ধি—যদি প্রাণে বাঁচি।

আব্বাস চলিয়া গেল।

নুরল এসলাম তিন সপ্তাহ পর কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার চেহারা মলিন, গলার আওয়াজ বসা। দেখিয়া আনোয়ারার প্রফুল্ল মুখ শুকাইয়া গেল। সে বিষাদস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন হইয়াছেন কেন? শরীর যে মাটি হইয়াছে।"

নুরল। কয়েকদিন শীতে ভুগিয়া সর্দি ধরিয়াছে। সর্দিতে গলার আওয়াজ বসিয়া গিয়াছে। আবার গতকল্য গাড়ীতে উঠিতে বুকে আঘাত লাগিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। আজ যেন একটু জ্বর জ্বর বোধ হইতেছে।

আনো। আর আফিসে যাইয়া কায নাই, শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ দুই সপ্তাহের ছুটি নিন।

নুরল। আচ্ছা, কাল প্রাতে দেখা যাইবে।

রাত্রিতে নুরল এসলামের জ্বর একটু বেশী হইল। তিনি খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাঁহার গলার স্বর আরও বসিয়া গিয়াছে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিয়াছে। রক্ত দেখিয়া আনোয়ারার আত্মা চমকিয়া গেল। নুরল এসলাম বিদায়ের আরজীর সহিত ম্যানেজার সাহেবকে লিখিলেন, "অনুগ্রহ পূর্বক আমার জন্য এসিষ্ট্যান্ট সার্জন বাবুকে পাঠাইবেন। রাত্রিতে জ্বর হইয়াছে এবং কাশির সহিত গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াছে।" পত্র লইয়া বাড়ীর চাকর বেলগাঁও গেল। এসিষ্ট্যান্ট সার্জন আসিলেন ও দেখিয়া ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার সাহেব এসিষ্ট্যান্ট সার্জনকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুরল এসলামকে কেমন দেখিলেন?"

এঃ সাঃ। অবস্থা ভাল নয়। ক্ষয়কাশের পূর্ব লক্ষণ বলিয়া বোধ হইল।

সাহেব শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

ইহার এক সপ্তাহ পরে দুর্গা বৈষ্ণবী পুনরায় নুরল এসলামের বাড়ীতে ভিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। সে দাসীর মুখে শুনিল, নুরল এসলাম কলিকাতা হইতে পীড়িত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

নুরল এসলামের পীড়ার প্রথম হইতেই আনোয়ারার অর্ধাশন, অনিদ্রা

আরম্ভ হইল। সে ফুফু-শাশুড়ীর হস্তে সাধারণ পাকের ও গৃহস্থালির অন্যান্য বিষয়ের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বামীর শুশ্রূষায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিল। সে স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্তন ও নিঃশ্বাস ত্যাগ গণিতে লাগিল। আদেশ শ্রবণে কর্ণকে সতর্ক করিয়া রাখিল। পথ্য রন্ধন, ঔষধ সেবন প্রভৃতি কার্য নিজ হাতে অতি সাবধানে করিতে লাগিল; কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, নুরল এসলামের পীড়া ততই বাড়িয়া চলিল। আনোয়ারা হতাশ মনে তীর-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় সে পীড়া নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিল। সে থাকিয়া থাকিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার কেমন বোধ হইতেছে? কি করিলে শান্তি পাইবেন, বলুন, আমি তাহাই করিতেছি।" নুরল এসলাম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলেন, "প্রিয়ে! অদৃষ্টে বুঝি আর শান্তি নাই।" শুনিয়া বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও আনোয়ারা স্বামীর সাহস ও ধৈর্যাবলম্বনের নিমিত্ত অশ্রু-সম্বরণ করিয়া বলে, "সে কি কথা! এই ত শীঘ্রই ভাল হইবেন।"

২৫।২৬ দিন ডাক্তারী মতে চিকিৎসা চলিল; কিন্তু কিছুই সুফল বুঝা গেল না। রোজ দ্বিপ্রহরের পর হইতে ২।৩ ডিগ্রী করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। কাশি পাকিয়া পুঁজে পরিণত হইল, পুঁজে রক্তমিশ্রিত হইয়া উঠিতে লাগিল; কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা—আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল, চক্ষু বসিয়া গেল, কণ্ঠের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। নুরল এসলাম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। আনোয়ারা অনন্যোপায়ে প্রয়সখী হামিদাকে জেলার ঠিকানায় পত্র লিখিতে বসিল। চোখের পানিতে তাহার পত্র ভিজিয়া গেল। সে আর্দ্র কাগজেই লিখিল, "সই, তোমার সয়া গুরুতর পীড়িত, পত্র-পাঠ সয়াকে দেখিতে পাঠাইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন শনিবার অপরাহ্নে আট বেহারার একখানি পাল্কি নুরল এসলামের বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। একজন নবকান্তি সোনার চশ্‌মাধারী যুবক পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় উঠিল; এবং তথায় অল্লক্ষণ বিশ্রামের পর বাটীস্থ জনৈক দাসীর আহ্বানে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি হামিদার স্বামী, জজকোর্টের উদীয়মান উকিল—মীর মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন।

উকিল সাহেব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে আনোয়ারা পতির নিকট হইতে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাকের আঙ্গিনায় চলিয়া গেল। উকিল সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফু-আম্মা মাথায় কাপড় দিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু, বন্ধুর চেহারা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। বন্ধুদর্শনে পীড়িত বন্ধুর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "দোস্ত, আর বাঁচিবার আশা নাই। অভাগিনী আনোয়ারা রহিল, দেখিও।" উকিল সাহেব নিজে চোখের পানি মুছাইয়া দিলেন এবং আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এর অপেক্ষা কঠিন পীড়ায় লোকে আরোগ্যলাভ করে, খোদার ফজলে তুমি সত্বর আরাম পাইবে। আমাকে পূর্বে খবর দাও নাই কেন?" নুরল দুর্বলতায় ও ভাঙ্গা গলায় ভালমত উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁর ফুফু-আম্মা বারান্দা হইতে কহিলেন, "বাবা ব্যারামের শুরু হইতেই বেলগাঁও-এর বড় ডাক্তার ঔষধ করিতেছেন। তাই আমরা প্রথমে তোমাকে জানাই নাই। কিন্তু দুই একদিন করিয়া প্রায় একমাস যায়, ঔষুধে কোন ফল হইতেছে না। ছেলে দিন দিন আরও কাহিল হইয়া পড়িতেছে।" উকিল সাহেব সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কহিলেন, "এ পীড়ার ডাক্তারী ঔষধে ভাল ফল হইবে না, কবিরাজী মতে চিকিৎসা করিতে হইবে। আমি এখনই বাসায় গিয়া কাল ভোরে তথাকার বড় কবিরাজকে পাঠাইব, আল্লার ফজলে তাঁহার ঔষধে ভাল ফল হইবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব, আপনারা চিন্তিত হইবেন না।" এই সময় রৌপ্য-ফুরসীতে দাসী তামাক আনিয়া উকিল সাহেবের নিকট রাখিল। তিনি তামাক খান,

আনোয়ারা তাহা জানিত ; তাই দাসীকে আদেশ করিয়াছিল। উকিল সাহেব তামাক খাইয়া প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, ফুফু-আম্মা কহিলেন, 'বাবা আজ থাক, এখন রাতমুখে কিরূপে যাইবে ?" উকিল সাহেব কহিলেন, "আজ না গেলে কাল পূর্বাহ্ণে কবিরাজ ঔষধ করিতে পারিবেন না। যতই বিলম্ব হইবে ততই অনিষ্ট।" এই সময় দাসী আসিয়া কহিল, 'বউ-বিবি আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় উকিল সাহেবকে তামাক সাজিয়া দিল।

অনুমান ১৫ মিনিট পরে দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারন্দায় দাসী পরিবেশনের স্থান করিয়া উকিল সাহেবকে তথায় ডাকিয়া লইয়া বসিতে দিল। একটু পরে এক রেকাব গরম পরোটা ও এক পেয়ালা হালুয়া তাহার সম্মুখে আসিল। তিনি দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, "একি ! এত সত্বর এরূপ আয়োজন কিরূপে হইল।" দাসী কহিল, "বউ-বিবি এখনই ইহা নিজ হাতে করিয়াছেন।" উকিল সাহেব খাদ্যসামগ্রীর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেছেন ; আনোয়ারা ইত্যবসরে দাসীর দ্বারা ৮ জন বেহারা ও একজন চাপরাশীর উপযুক্ত জল-খাবার বাহির বাড়ীতে পাঠাইয়া উকিল সাহেবের পান-তামাকের বন্দোবস্ত করিল।

উকিল সাহেব যাইবার সময় সকলকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে একদিন দুর্গা পুনরায় ভিক্ষাচ্ছলে নুরল এসলামের বাড়ীতে আসিল। দাসী তাহাকে ভিক্ষা আনিয়া দিল। আনোয়ারাকে না দেখিয়া দুর্গা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বৌঠাকুরাণীকে ত' দেখি না ?" দাসী কহিল, "দেওয়ান সাহেব পীড়িত হওয়ার পর তিনি সর্বদা তাহার নিকটে থাকেন।"

দুর্গা। দেওয়ান সাহেবের কি ব্যারাম ?

দাসী। জ্বর, কাশ ও গলার আওয়াজ বসা।

দুর্গা। কে চিকিৎসা করেন ?

দাসী। বন্দরের বড় ডাক্তার।

দুর্গা কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিল, তারপর চলিয়া গেল। এই সময়ে আনোয়ারা শয়নঘরে স্বামীকে নিজ হাতে তুলিয়া পথ্য সেবন করাইতেছিল।

দুর্গা পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিল, একবার কথাবার্তা ধরাইতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম, আমার যাদুর শিকারের গতি কোন দিকে। তা' নির্জনে রহস্যালাপই যে কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি।

কয়েকদিন পর আব্বাস আলী মাসীর সহিত দেখা করিল ও কহিল, "মাসী, আর যে সহে না !"

মাসী। যাদু, সবুরে মেওয়া ফলে; ভাগ্য তোমার অনুকূল বলিয়াই বোধ হইতেছে।

আব্বাস। কেমন করিয়া বুঝিতেছ ?

মাসী। দেওয়ান সাহেবের কঠিন ব্যারাম, অবস্থা এখন-তখন।

আব্বাস। আমিও ত' বেলগাঁও রতীশবাবুর কেরাণীর নিকট শুনিলাম, তাঁহাকে ক্ষয়কাশে ধরিয়াছে, বড় ডাক্তার বলিয়াছেন, বাঁচা কঠিন।

মাসী। আমিও দেখিয়াছি ক্ষয়কাশের রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

আব্বাস। মাসী তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, তাহা হইলে চারিমাস দশ দিন আর যাইতে দিব না, শাদী করিয়া সাধ পুরাইব।

মাসী। ঘন ঘন শিকারের সন্ধানে ঘুরিলে লোকে সন্দেহ করিতে পারে ; এ নিমিত্ত দুই তিন সপ্তাহ আর আমি রতনদিয়ায় যাইতেছি না। তুমি বেলগাও যাইয়া তাহার অবস্থার খবর লইও।

আব্বাস। তাই বলিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও না।

মাসী। তোমার কার্য হাসিলের জন্য আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না ; নিশ্চিন্ত থাকা দূরের কথা।

এদিকে উকিল সাহেব বাসায় যাইয়া, অতি প্রত্যুষে টাউনের বড় কবিরাজ বিষ্ণুপদ কবিভূষণ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু নুরল এসলামের পীড়ার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে রতনদিয়ায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় খ্যাতনামা গঙ্গাধর কবিরাজের ছাত্র। এ নিমিত্ত শহরে তাঁহার নাম ডাক খুব বেশী, হাতযশও মন্দ নয়। তিনি উকিল সাহেবকে কহিলেন, "আমি মফঃস্বলে বড় যাই না, বিশেষতঃ আমার তিলমাত্র অবসর নাই।"

উকিল সাহেব কহিলেন, "তবে কি আমরা গরীব মানুষ আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব ?" কবিরাজ মহাশয় উকিল সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তবে আপনার অনুরোধে স্বীকৃত হইলাম। আমার ভিজিটের কথা বোধহয় আপনি জানেন ? মফঃস্বলে দৈনিক ৫০ টাকা।"

উ। রোগী গরীব, টাকা আমাকে দিতে হইবে। অনুগ্রহপূর্বক দৈনিক ৩০ টাকা করিয়া স্বীকার করুন, কৃতজ্ঞ থাকিব।

কবি। পাল্কীভাড়া ও ঔষধের দাম পৃথক লাগিবে—অবশ্য জানেন।

উ। আমার ৮ বেয়ারার পাল্কী আছে, তাহাতেই যাতায়াত করিবেন।

কবিরাজ মহাশয় মুখখানি একটু ছোট করিলেন ; কারণ পাল্কীভাড়া দ্বিগুণ চার্জ করিয়া অর্ধেক টাকায় কাজ সারিতেন, তাহা হইল না। উকিল সাহেব ৫০ টাকার একখানি নোট কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, "এখনই পাল্কী পাঠাইতেছি, আপনি এই বেলাতেই যাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া দুই একদিন থাকিতে হইলেও থাকিয়া আসিবেন। কবিরাজ মহাশয় সম্মত হইলেন।

কবিরাজী মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নুরল এসলাম প্রথমতঃ অনেকটা

সুস্থ হইলেন। তাঁহার জর ও স্বরভঙ্গ কমিয়া আসিল, কাশির সঙ্গে পুঁজ-রক্ত উঠা বন্ধ হইল। তিনি ক্রমে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, যষ্টিভরে ক্রমে ক্রমে ২।১ পা করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তুষার-শৈত্য-সঙ্কুচিতা নলিনী যেমন তরুণ-অরুণ-আভা বক্ষে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া উঠে, পতির আরোগ্য লক্ষণ দৃষ্টে আনোয়ারাও সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একদিন নুরল এসলাম স্ত্রীকে কহিলেন, "অনেকদিন হয় গোসল করি নাই, নামাজও কাজা হইতেছে; আজ আমাকে গোসল করাও প্রাণ ভরিয়া নামাজ পড়িব।

স্ত্রী কবিরাজকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গোসল করিবেন?

নুরল। কবিরাজ ত বলিয়াছেন গরম জলে স্নান করিতে পারেন।

আনোয়ারা পানি গরম করিয়া নিজ হাতে স্বামীকে গোসল করাইল। পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্যাদি নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল। প্রথম বেলা একরূপ কাটিল; কিন্তু, হায়! অপরাহ্নে নুরল এসলামের গা গরম হইয়া উঠিল, রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি পাইল। তিনি পুনরায় পূর্ববৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কবিরাজ আসিলেন, ঔষধ চলিতে লাগিল; কিন্তু প্রথমবারের ন্যায় সত্বরআর ফল হইল না। নুরল এসলাম চিররোগা হইয়া পড়িলেন। প্রিয় সুহৃদ উকিল সাহেব মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। আনোয়ারার ধৈর্য ও পতিব্রতা যেন নারীজাতির শিক্ষার জন্য ক্রমশ: স্ফূর্তিলাভ করিতে লাগিল।

আনোয়ারা স্বামীর পীড়ার আরম্ভকাল হইতেই, নামাজ অন্তে তাঁহার আরোগ্য-কামনায় মাথা কুটিয়া মোনাজাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোনাজাতের সময় তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইত। খোদাতালার নিকট মোনাজাত করিতে লাগিল। প্রত্যহ এশার নামাজ বাদ হাত তুলিয়া বলিত, "হে দয়াময়! তোমার পবিত্র নামে আরম্ভ করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। হে সর্ব্বশক্তিমান খোদা! তুমি আঠার হাজার আলমের মালিক। তুমি মানুষের নিকট নিরানব্বই নামে প্রকাশিত। হে দায়াময়। দাসীকে বলিয়া দাও, কোন নামে ডাকিলে তুমি তুষ্ট হইবে? কোন্ নামে ডাকিলে তুমি দাসীর স্বামীকে আরোগ্য করিবে? নাথ! আমি জ্ঞানহীনা মূঢ়মতি বালিকা, আজ তোমাকে তোমার প্রকাশিত সমুদয় নাম ধরিয়াই ডাকিতেছি।" এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করিয়া বালিকা খোদাতালার নিরানব্বই নাম

ধরিয়া প্রার্থনা করিত। ভক্তি-জনিত অশ্রুধারায় তাহার দেহবস্ত্র সিক্ত হইয়া যাইত। বালিকা শেষে বলিত "প্রভো! অ"াধারে থাকিয়া ডাকিতেছি বলিয়া কি দাসীর প্র'র্থনা শুনিবে না? হে রহিম-রহমান! তুমি বুঝিতেছ—দেখিতেছ, তবে কোন্ প্রার্থনা শুনিবে? দয়াময়! দাসীর হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া যদি পতি-সেবার অধিকার দিয়াছ, তবে এত সত্বর তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। তাঁহার চরণ সেবায় দাসীর নারীজন্ম ধন্য হইতে দাও।"

আনোয়ারা কায়মনোবাক্যে এইরূপ প্রার্থনা শেষ করিয়া স্বামীর চরণে হাত বুলাইত।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বিশ্বাস না করিলেও আমরা জানি, বালিকা যেদিন এইরূপ বিশেষভাবে মাথা কুটিয়া পতির আরোগ্য-কামনায় প্রার্থনা করিত' সেদিন-নুরল এসলামের সুনিদ্রা হইত এবং পরদিন তিনি আপনাকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাসাধিক পর একদিন অপরাহ্নে দুর্গা আবার নুরল এসলামের বাড়ীতে ভিক্ষার ভানে উপস্থিত হইল। সেদিন দেখিল, আনোয়ারা পশ্চিমদ্বারী ঘরে আসরের নামাজ অন্তে হাত তুলিয়া মোনাজাত করিতেছে, তাহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে। দুর্গা আনোয়ারার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া দ্বারের চৌকাঠের উপর বসিল। বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'স্বামী অনেকদিন ধরিয়া কাতর— সেবা-শুশ্রূষায় বিরক্ত ধরিয়াছে ; তাই যাতনা সহিতে না পারিয়া হয় স্বামীর, না হয় নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছে। শিকারের উপযুক্ত সময় বটে।' আনোয়ারা অনেকক্ষণ পর মোনাজাত শেষ করিয়া চোখের পানি মুছিয়া পাশ ফিরিয়া বসিতেই দেখিল, সম্মুখে দুর্গা। দুর্গা কহিল, "মা, কাঁদিতেছেন কেন ?" আনোয়ারা দুর্গার কথার ভঙ্গি ও মুখের চেহারায় বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর করিল না। দুর্গা ব্যাথার ব্যথী হইয়া কহিল, "মা, ও দুঃখ আমিও পোহাইয়াছি। আপনার এই বয়সেই একবার ঠাকুর মরণাপন্ন কাতর হয় ; তখন সুখ-সন্তোষ বিসর্জন দিয়া না খাইয়া না শুইয়া তাহার সেবা করিলাম ; কিন্তু তাহাকে আর ফিরাইতে পারিলাম না। কি করিব ? সবই অদৃষ্টের লেখা। আমরা হিন্দুর মেয়ে, সারা জীবন বিধবা থাকিয়া কাটাইলাম।" দুর্গার কথা আনোয়ারার কানে ভাল লাগিল না, সে ঘর হইতে উঠিয়া গেল। রান্নার আঙ্গিনায় যাইয়া দাসীকে আদেশ করিল, "বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বল, ও যেন এ বাড়ীতে আর না আসে।" দাসী ভিক্ষা দিয়া দুর্গাকে কহিল, তুমি এ বাড়ীতে আর আসিও না।'"

দুর্গা। কেন গো, কেন ?

দাসী। বউ-বিবির হুকুম।

দুর্গা। কি অপরাধ করিলাম ?

দাসী। তা তুমি জান।

দুর্গা "আচ্ছা" বলিয়া, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল এবং পথে বলিতে বলিতে যাইতে লাগিল, 'কত রূপসী দেখিয়াছি এমন বদ-দেমাগী ত

কোথায় দেখি নাই; যেন কত বড় নবাবের কন্যা; ঘেন্নায় কথা কন না।
দুর্গার কথা আর কেহ শুনিল না। কেবল সালেহার মার কানে গেল। তিনি প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া দুর্গাকে ইশারায় ডাকিতেছেন। সে সালেহাদিগের আঙ্গিনায় ঢুকিয়া পড়িল। সালেহার মা তাহাকে আদর করিয়া বসিতে দিয়া কহিলেন, "তুমি অমন বকাবকি করিতেছ কেন?"

দুর্গা। মা, আমরা দশ দুয়ারে মাগিয়া খাই, তা ও-বাড়ীর বউ আমাকে ভিক্ষা দিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে।

সালেহার মা। বউকে তুমি কি বলিয়াছিলে?

দুর্গা। মা, বলিব আর কি।' একালে কি কারো ভাল করিতে আছে? আমি ভিক্ষার জন্য যাইয়া দেখি, বউ পশ্চিমদ্বারী ঘরে পশ্চিম মুখে বসিয়া হাত তুলিয়া কাঁদিতেছে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হইল, তাই বলিয়াছিলাম,—সোয়ামী কাতর, কাঁদবার কথাই ত', উপায় কি? বিপদে ভগমান ভরসা।

সালেহার মা। এ ত' ভাল কথা! তা' তুমি ত' বৈষ্ণবী, আমি বড় ঘরের মেয়ে হইয়া বাঁয়ের জালায় দু'দিন সংসারে তিষ্টিতে পারিলাম না। স্বামী-সোয়াগী স্বামীকে পরামর্শ দিয়া আমাকে পৃথক করিয়া দেওয়াইয়াছে।

দুর্গা। আমার নাম দুর্গা বৈষ্ণবী। আমি এ অপমানের শোধ লইব, তবে ছাড়িব।

সালেহার মা। কেমন করিয়া লইবে?

দুর্গা। যেমন করিয়া হোক।

কিছুক্ষন চিন্তা করিয়া দুর্গা কহিল, "আপনারা ও-বাড়ীতে যাতায়াত করেন না?"

সালেহার মা। বেশী না, নুরল কাতর শুনিয়া একবার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার এক অবুঝ মেয়ে আছে, সে চুপে চুপে অনেক সময় যায়।"

এই সময় সালেহা সেখানে আসিল।

দুর্গা। এইটি কি আপনার মেয়ে?

সালেহার মা। হাঁ।

হীরাপ্রকৃতি দুর্গা, তাহাকে শুনাইয়া কহিল, "দেওয়ান সাহেবের যে ব্যারাম তা তাহার বড় ডাক্তার-কবিরাজের অষুধ খাইলেও সারিবে না।"

সালেহার মা। তবে কিসে সারিবে?

দুর্গা। যাহাতে সারিবে আমি তাহাই বউটিকে বলিতে গিয়াছিলাম, তা' কালের দোষ। ভাল করিতে গেলে লোকে মন্দ বুঝে। আমাকে বউটি তাহাদের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছে।

সালেহা। তোমরা যাহাই বল অমন ভাল বউ কোথাও নাই। অমন মিষ্টি কথা আর কোন মেয়েলোকের মুখে শুনি নাই।

সালেহার মা চোখ রাঙ্গাইয়া কহিলেন, "দ্যাখ বজ্জাতের বেটি, তোর যে বড়ই বাড়াবাড়ি দেখিতেছি।

মেয়ে চুপ করিল। দুর্গা বিদায় হইল।

যেদিন আনোয়ারা দুর্গাকে তাড়াইয়া দেয়, তার পরদিন সালেহা সকাল-বেলা চুপে চুপে নুরল এসলামের আঙ্গিনায় গেল, তখন আনোয়ারা রান্নাঘরের আঙ্গিনায় উপস্থিত ছিল।

সালেহা। ভাবি, ভাই সাহেব কেমন আছেন ?

আনোয়ারা। পূর্বের ন্যায়, কিন্তু কাশি একটু বাড়িয়াছে।

সালেহা। কাল বিকালে যে বৈষ্ণবী আপনাদের আঙ্গিনায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে আপনি তাড়াইয়া দিয়াছেন কেন ?

আনোয়ারা। (সালেহার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কিরূপে জানিলে ?

সালেহা। সে আমাদের বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছে।

আনোয়ারা। তার কথা ও ভাবভঙ্গি আমার নিকট ভাল বোধ হইল না।

সালেহা। আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ভাল করেন নাই।

আনোয়ারা। কেন ?

সালেহা। সে কহিল, ভাইজানের ব্যারাম ডাক্তার-কবিরাজের অষুধ-পত্রে আরাম হইবে না। যাহাতে আরাম হইবে সে তাহা জানে।

আনোয়ারা। বদ্ স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই।

সালেহা। ফকির বৈষ্ণব কাহার মধ্যে কি গুণ আছে বলা যায় না। মামুজানের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকেঠিকে দুনিয়া। হয়ত ঐ বৈষ্ণবীর অষুধপত্রে ভাইজান আরামও হইতে পারেন।

আনোয়ারা ভাবিতে লাগিল, সালেহা ত' মন্দ কথা বলিতেছে না। বৈষ্ণবীই বা মন্দ কথা কি বলিয়াছে ? দাদিমাও বলিতেন, ঠাকেঠিকে দুনিয়া। ফকির সন্ন্যাসিকে অবজ্ঞা করিতে নাই। গোলেস্তায় পড়িয়াছি, সামান্য ঝিনুকে মতি থাকে, লতা-গুল্মেও সিংহ বাস করে। বৈষ্ণবী সালেহার কাছে বলিয়াছে, যাহাতে ব্যারাম সারে তাহা আমি জানি। বহু দেশে ঘোরে, অনেক জানাশুনা থাকিতে পারে ; সুতরাং তার ঔষধে রোগ সারিবে বিচিত্র কি ? এইরূপ চিন্তা করিয়া আনোয়ারা সালেহাকে বলিল, "বুবু, সত্যই কি বৈষ্ণবী তোমার ভাইজানের পীড়ার ঔষধ জানে বলিয়াছে ?"

সালেহা। আমি কি আপনার নিকট মিথ্যা বলিতেছি ?

আনোয়ারা। তবে ত' বৈষ্ণবীর উপর রাগ করিয়া ভাল করি নাই। এখন তাহাকে পাইবার উপায় কি ?

সালেহা। আপনি যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন সে বিনা ডাকে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আনোয়ারা। কাহাকে দিয়া ডাকাইব ?

সালেহা। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।

আনোয়ারা। বুবু, তোমার পায়ে পড়ি, সে যাহাতে আসে অবশ্য তাহাই করিবে।

বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দিয়া সে যারপরনাই অন্যায় কার্য করিয়াছে বলিয়া মনে করিল এবং তজ্জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে দুর্গা আখড়ায় বসিয়া আব্বাস আলীকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে শ্রবনমাত্র ব্যস্ত হইয়া উপস্থিত হইল।

দুর্গা। যাদু, বড় কঠিন স্থান। তোমার মনোমোহিনী আমাদের সীতা-সাবিত্রীকে হারাইয়া দিয়াছে।

আব্বাস। সে কেমন ?

দুর্গা ভিক্ষা নিষেধের কথা প্রভৃতি আব্বাস আলীর নিকট খুলিয়া বলিল।

আব্বাস। তবে এখন উপায় ?

দুর্গা। দুর্গা নিরুপায়ের খুব উপায় জানে।

আব্বাস। মাসী, কি উপায় করিবে ?

দুর্গা। উপায়ের পথে পা দিয়া তবে বলিব। বাছা, দু'দিন সবুর কর, আজ নিজের ভাবনায় ব্যস্ত আছি।

আব্বাস। মাসী, তোমার আবার নিজের ভাবনা কি ?

দুর্গা। ঘরে একমুঠা চালও নাই, ভিক্ষা ত কেবল তোমারই কার্যোপ-লক্ষে। কাল হাট হইবে কি দিয়া, তাই ভাবিতেছি।

আব্বাস পকেট হইতে ১০টি টাকা বাহির করিয়া দুর্গার হাতে দিল এবং বলিল, "মাসী, অভাবের ভাবনা মোটেই ভাবিও না। মোনবাঞ্ছা সিদ্ধি হইলে একযোগে তিনশত টাকা পাইবে।"

পরদিন আব্বাস আলী বেলগাঁও বেড়াইতে গেল। তথায় খাদেম আলী

তাহাকে বলিল, ভাই এক সু-খবর, তোমার প্রাণমোহিনী দুর্গাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তুমি যাইয়া অদ্যই তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও।

আব্বাস। তোমার মুখে সন্দেশ। আমি এখনই চলিলাম।

দুর্গার সহিত আব্বাস আলীরষড়যন্ত্রের কথা খাদেম আলী সব জানে। তাহার চরিত্র মন্দ, এ নিমিত্ত নুরল এসলাম যারপরনাই দুঃখিত এবং তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। পাপমতি খাদেমও নুরল এসলামের প্রতি দারুণ বিদ্বেষপরায়ণ এবং এই কারণে সে এই ষড়যন্ত্র দলভুক্ত। খাদেম আলীর স্ত্রী সেই দিনই তাহার নিকট দুর্গাকে নুরল এসলামের বাড়ীতে আসার সংবাদ দিতে অনুরোধ করে।

আব্বাস আখড়ায় আসিয়া দুর্গাকে কহিল, "মাসী, এইবার বুঝি তোমার শ্রম সার্থক হয়।"

দুর্গা। মাসীর শ্রম বিফলে যাইবার নহে; তবে আজ শ্রম সফল হইবে কিরূপে বুঝিতেছি না।

আব্বাস। তোমার উর্বশী তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

দুর্গা। কে বলিল?

আব্বাস। উর্বশীর নন্দাই খাদেম আলী।

দুর্গা। এত সত্বর, তবে অসুখ ধরিয়াছে! আচ্ছা, দু'দিন পরে যাইব

আব্বাস। আজই যাও না কেন?

আব্বাস। যাদু, এরূপস্থলে ডাকামাত্র হাজির হইলে বুজুর্কী কমিয়া যায়, যত গৌণ করিব, ততই আগ্রহ হইবে। বাড়া আবেগের মুখে কাজ হাসিলের সুযোগ বেশী।

আব্বাস। বুঝিলাম, এমন চিক্কণ বুদ্ধি না হইলে কি তুমি যেখানে স্ুঁচ চলে না সেখানে ফাল চালাও!

চিকিৎসার ক্রটি নাই, তথাপি পীড়া উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পীড়া যখন বেশী বাড়িয়া উঠে, তখন পতিপ্রাণা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়-খানি নানা আশঙ্কায়, নানা সন্দেহে আলোড়িত হইতে থাকে। সে কখন ভাবে, তাহার সেবা-শুশ্রূষার ক্রটিতেই বুঝি এরূপ হইতেছে। আবার ভাবে, তাহার নিয়মিত রূপে ঔষধ সেবন করানোর ভুল-ভ্রান্তিতে বুঝি পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই সে নামাজ অন্তে প্রার্থনার সময় মাথা কুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "দয়াময় খোদা! দাসীর দোষে স্বামীর পীড়া বাড়াইও না। জননী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, 'মা, নিজের দোষে স্বামীর অসুখ-অশান্তি যাহাতে না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে; অন্যথায় পরকালে দোজখের আগুনে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া কাল কাটাইতে হইবে।' নাথ! জননীর উপদেশ দাসীর হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। প্রভো! চারিমাস যাইতে বসিল, রোগের যন্ত্রণা স্বামী আর কতকাল সহ্য করিবেন? হায় বিধাতঃ! তাঁহার সুগঠিত দেহ অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াছে; তাঁহার সুন্দর মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সুধামাখা কথা নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় আর বাহির হইতেছে না। হে রহিম-রহমান! আমার ফেরেস্তার মত পতির এ অবস্থা যে আর প্রাণে সহিতেছে না? করুণাময়! দাসীর শেষ প্রার্থনা, তুমি তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি দাসীর দেহে সঞ্চারিত কর, দাসী অক্লেশে অম্লানচিত্তে তাহা সহ্য করিবে। অনাথপতি! দাসীকে আর কাঁদাইও না।"

কিন্তু হায়! বিধাতা বুঝি সতীর সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পতি ক্রমশঃ মৃত্যুর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। একদিন আনোয়ারা স্বামীর পদ-প্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "বৈষ্ণবীকে তাড়াইয়া দেওয়াতে বুঝি স্বামীর পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। এবার সে আসিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, স্বামীর আরোগ্য হেতু সে যাহা বলিবে তাহাই শুনিব। সালেহা বলিয়া গিয়াছে, আমি তাহার আসিবার উপায় করিব। সে কি কোন উপায় করিতে পারে নাই? হায়! বৈষ্ণবী বুঝি আর আসিবে না। কেন তাহাকে

আসিতে নিষেধ করিয়াছি? তাহার ঔষধে বুঝি স্বামী আমার নিরাময় হইতে পারিতেন। হায়! কি সর্বনাশ করিয়াছি! নিজ দোষে পতির মৃত্যুর কারণ হইলাম।" ভাবিতে ভাবিতে বালিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পর চোখের জল মুছিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপনার কেমন বোধ হইতেছে?" নুরল এসলাম কহিলেন, "কিছু বুঝি না। যখন তুমি গায়ে পায়ে হাত বুলাও, তখন মনে হয় ব্যারাম বুঝি সারিয়া গিয়াছে। আবার ধীরে ধীরে শরীর খারাপ হইতে থাকে।" আনোয়ারা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া আগ্রহের সহিত স্বামীর পদে হাত বুলাইতে লাগিল; এমন সময় 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া দুর্গা নুরল এসলামের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা বৈষ্ণবীর গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরে ধীরে তখন বাহিরে আসিল এবং দুর্গাকে দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

হায় পতিপ্রাণা বালিকা! প্রথম দিন ভিক্ষা দিতে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আবশ্যক মনে কর নাই, দ্বিতীয়বার যাহার কথা শুনিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলে, অসতী বলিয়া যাহাকে বাড়ীর উপর আসিতে পর্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলে, আজ তাহার কণ্ঠস্বর মাত্র শুনিয়া বাহিরে আসিলে, দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলে; পতির প্রাণরক্ষায় উন্মাদিনী তুমি! তোমার এ ব্যবহার, তোমার মনের এ ভাব, সতী ব্যতীত অন্যে কি বুঝিবে?

আনোয়ারা দুর্গাকে রন্ধনশালার দিকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

দুর্গা। মা, ডাকিয়াছেন কেন?

আনোয়ারা। না বুঝিয়া তোমাকে বাড়ীর উপর আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, মনে কিছু করিও না।

দুর্গা। না মা, সে কথা আমি তখনই ভুলিয়া গিয়াছি। দেওয়ান সাহেবের শরীর কেমন?

আনোয়ারা। তাঁর কাশি একটু বাড়িয়াছে।

দুর্গা। যে দুরন্ত ব্যাধি, কবিরাজি ঔষধ-পত্রে তাহা আরাম হইবে না।

আনোয়ারা বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে কিসে আরাম হইবে?

দুর্গা। আরামের উপায় আছে, কিন্তু বড় কঠিন।

আনোয়ারা। হাজার কঠিন হোক তুমি আমাকে খুলিয়া বল।

দুর্গা। মা, আমরা হিন্দু, আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা; ক্ষয়কাশ,

যক্ষ্মাকাশ, ওলাওঠা প্রভৃতি রোগকেও আমরা দেবতা বলিয়া মানি। ইহারা যাহাকে ধরেন, তাহার নিস্তার নাই ; তবে দেবতাগণকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাহারা ছাড়িয়া দেন।

আনোয়ারা। তোমার দেবতারা কিসে তুষ্ট হন ?

দুর্গা। আপনার স্বামীকে ক্ষয়কাশ-দেবতা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়াইতে হইলে, জীব-সঞ্চার-ব্রত সাধন করিতে হইবে, কিন্তু তা করা বড় কঠিন ব্যাপার।

আনোয়ারা। জীব-সঞ্চার-ব্রত কিরূপ ?

দুর্গা। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলবার বা শনিবার দুপুর রাত্রিতে শ্মশান হইতে মরা আনিয়া তাহার উপর বসিয়া যোগমন্ত্র পড়িতে হয়। তারপর গলায় কাপড় দিয়া ধন্বন্তরী দেবতাকে বলিতে হয়, 'হে মহাপ্রভু! আমার অমুক রোগীর শরীর হইতে অমুক রোগকে ছাড়িবার আদেশ করুন। তার ভোগের জন্য জীব দিতেছি।' এই কথার পরই, যিনি ব্রত করিবেন, তিনি মরার শিয়রের দিকে দাঁড়াইয়া কাহারো নাম তিনবার উচ্চারণ করিবেন, রোগটি তখনই রোগীর দেহ হইতে যাইয়া তাহাকে আশ্রয় করিবে। ফলে, রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে ; কিন্তু যাহার নাম করা হইবে, সে এ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ইহাই জীব-সঞ্চার-ব্রত।

দুর্গার কথা শুনিয়া সভয়ে বালিকার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার মনে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল, 'স্বামী এবং ধর্ম, কাহাকে রক্ষা করি ?' এই বিরোধের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে কিছুই করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিল।

দুর্গা। মা, আপনি কি ভয় পাইলেন ?

আনো। না ভয় পাই নাই।

দুর্গা। তবে ব্রত করাইবেন ?

আনোয়ারা। বৈষ্ণবী, তুমি বড়ই ভয়ানক কথা তুলিয়াছ। আমি স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত নহি ; কিন্তু ধর্মভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। আমাদের কেতাবে এরূপ ব্রত করা শেরেক্। যিনি প্রাণ দিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন—আমি স্বামীর প্রাণের বদলে আমার হৃদয়ের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

বল, তোমার এই ধর্মবিরুদ্ধ ব্রত ভিন্ন আর কোন উপায় আছে কি? কিন্তু আমি কোন শেরেকের কাজ করিতে পারিব না। আমাকে খোদার কাছে এক দিন অবশ্যই জবাব দিতে হইবে।

দুর্গা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল, "মা, অন্ত আর এক উপায় আছে।"

আনোয়ারা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আর কি উপায়?"

দুর্গা। সে উপায়ও বড় কঠিন।

আনোয়ারা। যতই কঠিন হোক না, তুমি খুলিয়া বল?

দুর্গা। মৃতসঞ্জীবনী বলিয়া এক রকম গাছ আছে। অমবস্যার মাথায় দুপুর রাতে এলো চুলে পূর্বমুখো হইয়া সেই গাছের শিকড় এক নিঃশ্বাসে তুলিতে হয়। সেই শিকড় বাটিয়া খাইলে সকল রোগ আরাম হয়।

আনোয়ারা। এ আর কঠিন কি?

দুর্গা। না মা, যে সেই শিকড় তুলিবে তার সেই ব্যারাম হইবে। তাতে তার মরণ নিশ্চয়; প্রাণের বদলে প্রাণ, বুঝিলেন ত? এখন সেই শিকড় তুলিবে কে?

আনোয়ারা। লোকের অভাব হইবে না। তবে সে গাছ চেনা যায় কিরূপ?

আনোয়ারার উত্তেজিত ভাবদৃষ্টে দুর্গা বুঝিল, সে জালে পড়িয়াছে। তখন দুর্গা বলিল, "আগামী শনিবারে অমাবস্যা, সুতরাং আপনার স্বামীর প্রাণরক্ষার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি সেই রাত্রিতে গাছ চিনাইয়া দিব।"

আনোয়ারা। বৈষ্ণবী, তুমি কি অভাগিনীর এতখানি উপকার করিবে?

দুর্গা। সে কি মা! আপনাদের খাইয়া দাইয়া আমরা মানুষ। এখন যদি কিছু উপকার করিতে পারি সে ত আমার ভাগ্যের কথা।

আনোয়ারা। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা তুমি যে দুপুর রাতে আসিবে তাহা আমি কি করিয়া জানিব?

দুর্গা। তাও ঠিক, তবে চলুন, গাছ এখনই দেখাইয়া দিতেছি।

আনোয়ারা। না, আমি ত পর্দার বাহিরে যাই না।

দুর্গা। তবে শনিবার রাতে আসাই স্থির রহিল। আমি আসিয়া আপনাকে ডাকিব।

আনোয়ারা। তা করিও না, কি জানি, ফুফু-আম্মা যদি কিছু বলেন। তুমি কোন সংকেতে ঠিক সময়ে আমাকে জানাইতে পার না?

দুর্গা। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আমি ঠিক দুপুর রাত্রির সময় আপনাদের উঠানে পর পর দুইটি ঢিল ফেলিব, তাহাতে আপনি বুঝিবেন, আমি আসিয়াছি। সেই সময় আপনি আপনাদের বৈঠকখানার বাগানের সামনে আসিবেন।

আনোয়ারা আশ্বস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে একটু বসিতে বলিয়া ঘর হইতে ২০টি টাকা আনিয়া দুর্গার হাতে দিল এবং কহিল, "আজ তুমি আমার মা'র কাজ করিলে ; তোমার জল খাইবার জন্য এই সামান্য কিছু দিলাম, কিছু মনে করিও না।"

দুর্গা জিব কাটিয়া কহিল, ''হরে কৃষ্ণ! মা, মা, আমি কিছুতেই আপনার টাকা নিতে পারি না। আপনার দুঃখ যদি কিছু দূর করিতে পারি, তবে তাহাই আমার পুরস্কার। আমি টাকা চাই না।"

আনোয়ারা তবুও তাহার হাতে টাকা গুঁজিয়া দিল। পাপীয়সী আর দ্বিরুক্তি করিল না। কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মা, দেখিবেন এ কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শনিবারের আর দুইদিন মাত্র বাকী। চিন্তার অনন্ত-তরঙ্গঘাতে বালিকার কোমল হৃদয় আলোড়িত ও ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। সে একবার ভাবিল, সমস্ত কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলি; আবার ভাবিল, তিনি যদি বিশ্বাস না করেন, অথবা প্রাণের বদলে প্রাণ রক্ষা করা ঘৃণা বোধ করেন, তবে আর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। অতএব আগে তাঁহাকে এই কথা জানাইব না। এইরূপ বিতর্ক করিয়া আনোয়ারা স্বামীকে কিছু জানাইল না।

রাত্রিতে আনোয়ারা ঘরে আসিল; এশার নামাজ অন্তে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করিল। তাহার পর যথাবিধানে পতি পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। সতীর সেবা-সাধনায় রোগক্লিষ্ট অতি শান্তির কোলে সুনিদ্রিত হইলেন। সতী তখন পতির পদপ্রান্তে বসিয়া একখানি চির বিদায়লিপি লিখিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। উদ্বেগ ও চিন্তার আতিশয্যে বালিকা পরিশ্রান্ত। তথাপি লিখিতে আরম্ভ করিল,—

"জীবনসর্বস্ব!

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি স্বরূপ আপনার পবিত্র সহবাসসুখে অতিবাহিত হইবে; কিন্তু হায়! ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।" এই পর্যন্ত লিখিয়া মুগ্ধ বালিকা ধীরে অবসন্ন দেহে পতিচরণ তলে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। তন্দ্রাবেশে সে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল, তাহার সম্মুখে দণ্ডধারী এক মহা-পুরুষ দণ্ডায়মান, তাঁহার জ্যোতির্ময় দেহ হইতে কর্পূরের সুবাস নির্গত হইতে-ছিল। তিনি বালিকার প্রতি সকরুণ স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার দেহে হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার জ্বালাময় স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। আবার পর মুহূর্তে দেখিতে লাগিল—বিশ্বগ্রাসী গভীর অন্ধকার, গভীরতমরূপে দশদিক হইতে তাহার নিকটে ঘনাইয়া আসিতেছে, এবং তাহার মধ্য হইতে তামস-ঝটিকার আবর্ত মহাকায় বিস্তার করিয়া মহাবেগে, মহাগর্জনে ঊর্ধ্বগামী হইতেছে। নীচে তামস-সাগর বক্ষে কালের করাল-কল্লোলে মহাভৈরীর

গ্যায় অনবরত ভীমরব তুলিয়া যেন তরঙ্গভঙ্গে তাণ্ডব নৃত করিতেছে। আকাশ সাগর একাকারে একের গায়ে অন্যে মিশিয়া গিয়াছে; মিলনের কেন্দ্র হইতে কোটি বজ্রনাদে ভীমরব ধ্বনিত হইতেছে; সে ভীমরবে গ্রহগণ যেন কক্ষত্যাগ করিয়া দিগন্তে ছুটাছুটি করিতেছে; মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে। কি ভীষণ দৃশ্য! বিভীশিকাময়ী লীলা! বালিকা শুষ্কনিঃশ্বাসে নিস্পন্দ নয়নে, ভীতিশূন্য মনে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আবার একি! আরও ভীষণ দৃশ্য! সর্বসংহারক লগুড়হস্তে যুগল জ্যোতির্ময়ী মূর্তি বালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! বালিকা একবার সভয়ে করুণ বিলাপে কহিল, 'কে তোমরা? আইস, পতি পরিচর্যায় ত্রুটি হইয়া থাকিলে তোমাদের হস্তের লগুড়াঘাতে দাসীর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেল।' দৃপ্তা তেজোময়ী বালিকার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই যুগল মূর্তি অন্তর্হিত হইল। অতঃপর সে দেখিতে পাইল, অনন্ত অপূর্ব এক আলোকময় দেশ তাহার পুরোভাগে প্রকাশিত। কি সুন্দর সোনার দেশ! বালিকা হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বর্ণরাজ্যে প্রবেশ করিল; চতুর্দিকে দৃষ্টি যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিল, সে দেশের নদ-নদী বন-ভুমি, বারিধি-বিমান আলোকমালায় ভূষিত। সে দেশের উদ্যান সমতল গহ্বর নির্ঝর আলোক-মালা বক্ষে নিত্য উদ্ভাসিত। সে দেশের অধিবাসিগণ জ্যোতির্ময় বস্ত্রালঙ্কারে চিরশোভিত—হিংসা-বিদ্বেষ, শোক-তাপ, মায়া-মোহবর্জিত—নিত্য শান্তিসুখে পরিসেবিত। বালিকা দেখিল, তাহার সম্মুখে সতীমহল। সতীমহলের শোভা অনুপম। স্বর্ণময় অট্টালিকার মধ্যে মণিখচিত পর্যাঙ্কে পয়ঃফেনসন্নিভ শয্যায় সতী-কুল সমাসীনা। শত শত রূপসী শিরোমনি হুর তাহাদের ,সবায় রত আছেন। সতীগণ পতিসেবা পুণ্যফলে সারাবন তহুরা পানে আত্মহারা হইয়া বিভু গুণ-গানে রত আছেন। বালিকা সতীমহলের একটি বিরাট অট্টালিকা দেখিয়া সুখরোমাঞ্চ কলেবরে তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। সে সৌধ কারুকার্যে অতুলনীয়, সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। সে সৌধ গৌরবে সমুন্নত সৌরভে পুরিত, শোভন উদ্যানে বেষ্টিত। সর্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা হইতে একে একে খোদেজা, ফাতেমা, রহিমা, হাজেরা, আছিয়া, আয়েশা, জোবেদা প্রমুখ সতীকুলরমণী গণ বাহির হইয়া বালিকাকে স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য ভূষিত করিয়া স্নেহাশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। বালিকা সেই অট্টালিকার অন্য প্রকোষ্ঠে তাহার জননীকে দেখিতে পাইল। সে তখন মা-মা, বলিয়া মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। মা

ভিতর হইতে স্বারুদ্ধ করিয়া কহিলেন "বৎসে, এখন নয়, স্বামীসেবা ... করিয়া যথা সময়ে আসিবে, কোলে তুলিয়া লইব।'

হঠাৎ বালিকার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল, একি দেখিলাম! আমি স্বপ্ন না জাগ্রত? কোথায় গিয়াছিলাম? মা যাহা বলিলেন, তাহাতে ত, বুঝিতেছি সঙ্কল্প সফল হইবে। দয়াময় আল্লা, দাসীর স্বামীকে রক্ষা কর!,

বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দুই রেকাত নফল নামাজ পড়িল। তারপর চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

"প্রিয়তম —

যে বৈষ্ণবী আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আইসে, সে আপনার পীড়ার অবস্থা শুনিয়া বলিল,— মৃতসঞ্জীবনী লতা ভিন্ন কোন ঔষধে ঐ ব্যাধি আরোগ্য হইবে না।

দীর্ঘদিন ঔষধ সেবনেও আপনার পীড়ার উপশম হইতেছে না দেখিয়া অগত্যা বৈষ্ণবীর ঔষধ পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু যে সেই লতা তুলিবে তাহার শরীরে পীড়া সংক্রামিত হইয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং রোগী নিরোগ হইবে। হে হৃদয়সর্বস্ব। আপনার জন্য জীবন দেওয়া ত তুচ্ছ কথা, জীবন অপেক্ষাও যদি কিছু অধিকতর মূল্যবান থাকে তাহাও আপনার জন্য অকাতরে দান করিতে দাসী সর্বদা প্রস্তুত। তাই প্রিয়তম, দুই দিন পরে আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি; কিন্তু এ বিদায় নহে— অনন্ত স্বর্গে আমাদের অনন্ত মিলন হইবে।

প্রাণ-প্রিয়, মৃতসঞ্জীবনী লতার গুণ সম্বন্ধে পাছে আপনি অবিশ্বাস করেন বা আমাকে লতা তুলিতে নিষেধ করেন,—এই ভয়ে আপনাকে আগে জানাইলাম না; দাসীর অপরাধ ও ধৃষ্টতা নিজগুণে ক্ষমা করিতে মরজি হইবে। আপনাকে পতিরূপে পাইয়া অল্প সময়ে যেরূপ সুখী হইয়াছি, যুগ-যুগান্তে বুঝি অন্য কোন নারীর ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না। আমি শনিবার নিশীথকে সাদরে আহ্বান করিতেছি আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারিব ভাবিয়া, দাসীর হৃদয়ে যে উল্লাস-লহরী খেলিতেছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বধির শ্রবণ-শক্তি পাইলে, জন্মান্ধের চক্ষু ফুটিলে, পঙ্গুর পদলাভে যে আনন্দ; আজ ততোধিক

আনন্দে দাসীর হৃদয় উৎফুল্ল। আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব, আহা! আমার তাতে কত সৌভাগ্য! কত সুখ! আপনি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের যে উপকার করিতে পারিবেন, দাসী দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ হইবে না। অতএব দাসীর অভাবে আপনি দুঃখিত হইবেন না। ইতি—

চিরসেবিকা দাসী—

আনোয়ারা”

বালিকা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত স্বামীর উপাধানের নীচে তাহা রাখিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুই দিন পর, স্বামী-পরিচর্যা করিতে পারিবে না ভাবিয়া বালিকা কায়মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। পাঁচবার নামাজ শেষ করিয়া সঙ্কল্পসাফল্য নিমিত্ত খোদাতায়ালার কাছে পুনঃ পুনঃ মোনাজাত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শুক্রবার অতীত হইল। আজ শনিবার প্রাতঃকাল। আনোয়ারা পৌর্বাহ্নিক কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিজা চুলে তাহার শুষ্ক বস্ত্র ভিজিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, নুরল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি আমার সাক্ষাতে আজ কাঠের আলনায় চুলরাশি শুকাও। তোমার চুল শুকানোর জন্য সোনার আলনা তৈয়ার করিয়া দিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।"—বলিতে বলিতে নুরল এসলামের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমি তোমাকে মুক্তকেশে দেখিতে ভালবাসি, আমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ কর।" আনোয়ারা সসন্তোষ উত্তেজনায় কহিল, "আমি আর লজ্জা করিব না।" এই বলিয়া সে দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে গিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনায় চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া শুকাইতে লাগিল। নুরল মুক্তকেশী সতীর পানে অনিমেষ তাকাইলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার রোগজীর্ণ দেহে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি একাল পর্যন্ত স্ত্রীর এরূপ সতেজ ভাব, এরূপ পূর্ণ লাবণ্যোদ্ভাসিত মূর্তি আর কখনও দেখেন নাই। সবিস্ময়ে ভাবাবেশে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে সতীর স্বর্গীয় তেজোদীপ্ত মূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আনোয়ারা চুল শুকাইয়া মুক্তকেশেই অনাবৃতমস্তকে পতিপাশে আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইল। নুরল আবেগভরে হাত ধরিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। সতী প্রেমবিহ্বলচিত্তে পীড়িত পতির কোলে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, "হে আমার দয়াময় খোদা, আগামীকল্য হইতে তুমি আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। আমি যেন তাঁহার কোলে এই ভাবে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" নুরল এসলাম কহিলেন, "প্রিয়ে

ও কি বলিতেছ, তোমার হতভাগ্য পতি যে তোমাকে রাখিয়া অগ্রেই মৃত্যুপথের যাত্রী সাজিয়াছে। প্রাণাধিকে, অপধারিত মৃত্যুকে ভয় করি না কিন্তু শত আক্ষেপ, তোমাকে আশানুরূপ সুখী করিতে পারিলাম না। অপার্থিব প্রেমঋণে, স্বর্গীয় ভক্তিপাশে হতভাগ্যের হৃদয় বাঁধিয়াছ; কাবিনের স্বত্বত্যাগ, উপরন্তু অর্থ সাহায্য করিয়া এ-দীনের সংসার ঠিক রাখিয়াছ, ছয় মাস যাবত অনাহারে-অনিদ্রায় সেবাশুশ্রূষা করিয়া দুর্বিষহ রোগযন্ত্রণায় শান্তি দান করিয়াছ, কিন্তু হায় তাহার কণামাত্র প্রতিদানও এই হতভাগ্যের দ্বারা হইল না।"—বলিতে বলিতে উচ্ছসিত শোকাবেগে নুরল এসলামের বাকরোধ হইয়া গেল। তিনি অবলার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আনোয়ারা তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া প্রেমাশ্রুনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং নুরল এসলামের চোখের জল আনোয়ারার চোখের জলে মিশিয়া গেল। আনোয়ারা স্বাগত বলিয়া উঠিল, "দয়াময়, চোখের পানি যেমন চোখে মিশাইল, বৈষ্ণবীর লতার গুণে রোগের পরিণতি যেন এইরূপ হয়।" নুরল এসলাম শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়ে, আবার ও-কি কহিতেছ?" আনোয়ারার চমক ভাঙ্গিল, সে সাবধান হইয়া কহিল, "কৈ, কিছু না।" নুরল সে কথা আর ধরিলেন না; কহিলেন, "প্রিয়তমে, আমার আয়ুষ্কাল ত পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; বাঁচিবার আশা নাই। আজ যে আমাকে এতখানি সুস্থ দেখিতেছ, ইহা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের উজ্জলতা বলিয়া মনে করিবে। যাহা হউক, আমার অন্য শরীক নাই। ভূ-সম্পত্তির মূল্য ১০।১২ হাজার টাকা হইবে, তাহার অর্ধেক তোমাকে, অপরার্ধের ।৵০ আনা তুল্যাংশে রশিদন ও মজিদনকে এবং ৵০ আনা ফুফু-আম্মাকে দিয়া গেলাম। বন্ধুবর উকিল সাহেবকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি; তিনি খুব সম্ভব অদ্য কি কল্য দানপত্র লইয়া এখানে আসিবেন। দানপত্রের লিখিত সম্পত্তি তোমার ইচ্ছামত দান-বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।"

নুরল এসলামের অন্তিমবাণী শুনিয়াও আনোয়ারা বিচলিত হইল না বরং তাহার বিম্বাধরে হাসির তড়িৎ খেলিয়া গেল। তাহার শতদল-বিনিন্দিত বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় আভা প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। নুরল এসলাম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সতী প্রকৃতির মর্মাবধারণে অক্ষম হইয়া কিঞ্চিৎ বিমনা হইলেন।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে শনিবারের দিনের আলো নিভিয়া গেল। সতী মৃত্যুপথের যাত্রীরূপে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্বেই সে স্বামীকে আহার করাইল। যথাসময়ে স্ফটিক-শামাদানে মোমের বাতি জ্বালাইল; মগরেবের নামাজ শেষ করিয়া রন্ধন-আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। তাহার হাবভাব স্ফুর্তি দেখিয়া ফুফু-আম্মা স্তম্ভিত হইলেন। বিষাদের প্রতিমূর্তি বউ-বিবিকে আজ ইত্যরূপ উৎফুল্ল দেখিয়া সুশীলা দাসীও সুখী হইল।

আহারান্তে সকলেই ঘরে গেল। আনোয়ারা ঘরে আসিয়া একাগ্র চিত্তে এশার নামাজ পড়িল। নামাজ অন্তে কায়মনোবাক্যে সঙ্কল্প-সাফল্য হেতু শেষ মোনাজাত করিল। আরাধনা শেষে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়া পতির চরণে হাত বুলাইতে লাগিল। সতীর হস্তস্পর্শে নুরল এসলাম ক্রমে নিদ্রা ভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনোয়ারা ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি ১১টা। আর এক ঘণ্টা পরে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। তখন তাহাকে সঙ্কল্পসাধনের জন্য বহির্বাটিতে উপস্থিত হইতে হইবে। অসূর্যস্পর্শ্যা বালিকা বধূর গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে একাকিনী বহির্বাটিতে গমন, ইহাও কি সম্ভব?

রাত্রি ১২টা। আনোয়ারা উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঘর-বাহির যাতায়াত আরম্ভ করিল। এদিকে ভীমভৈরবী করাল-কৃষ্ণ-পাপীয়সী কালনিশীথিনী তাহার আগমন ভয়ে ভীত হইয়াই যেন যামঘোষ ঘোষণা ত্যাগ করিয়াছে; ঝিল্লীরব থামিয়া গিয়াছে, দ্বিজগণ শাখিশাখে নীরবে উপবিষ্ট, বায়ু গতিশূন্য—বৃক্ষ-পত্ররাজি শব্দহীন। জীবকোলাহল-পূরিত প্রকৃতি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ, যেন নিঃশ্বাসরোধে বিগতপ্রাণ। কেবল জাগ্রত যোগী প্রকৃতির ভয়-কাতর অন্তরাদ্ভূত শাঁশাঁ শব্দমাত্রের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া শঙ্কিত। এই ভীষণাদপি ভীষণ সূচিভেদ্য নিবিড় তমসাচ্ছন্ন নীরব নিশীথে পতির রোগমুক্তিকামনায় সতী গৃহ হইতে প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এমন সময় দুইটি ঢিল পর পর আসিয়া প্রাঙ্গনে পতিত হইল। সতী সঙ্কেত বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বহির্বাটীর উদ্যানপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়! পরক্ষণে গালপাট্টা-বান্ধা একজন যুবক পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। পরপুরুষ স্পর্শে সতীর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে নুরল এসলাম কাশিতে কাশিতে কিছুক্ষণ পরে জাগিলেন। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল। অন্যান্য দিন কাশিবামাত্র আনোয়ারা উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে পিকদান ধরে, আজ তিনি কাশি ফেলিবার পিকদান নিকটে পাইলেন না; উঠিয়া বসিলেন। পীড়ার আরম্ভ হইতে আনোয়ারা স্বামীর শয়ন-খটের সংলগ্ন চৌকিতে পৃথক শয্যায় শয়ন করে। নুরল দেখিলেন, সে বিছানা শূন্য। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন ১টা বাজিয়া গিয়াছে; মনে করিলেন বাহিরে গিয়াছে, এখনই আসিবে; কিন্তু হায়! বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল —তথাপি আনোয়ারা ঘরে ফিরিল না। নুরল এসলাম তখন 'ফুফু-আম্মা' বলিয়া ২।৩ বার ডাকিলেন। তিনি শশব্যস্তে দরজা খুলিয়া ছেলের ঘরের বারান্দায় আসিলেন। চাকরাণী ফুফু-আম্মার ঘরে থাকিত, সেও তাঁহার পাছে পাছে উঠিয়া আসিল।

ফুফু। বাবা ডাক কেন?

নুরল। আপনাদের বউ কোথায়?

ফুফু। ওমা, সে কি কথা। বউ ত আমার কাছে যায় নাই। খুসী, তুমি পাকের আঙ্গিনায় দেখিয়া আইস।

চাকরাণীর নাম খুসী, সে আলো জ্বালিয়া রান্নার আঙ্গিনার দিকে গেল। ফুফু ভাণ্ডারঘর, তাঁর শয়নঘর দেখিতে গেলেন। নুরল এসলামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ফুফু-আম্মা ও খুসী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। নুরল এসলাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল? পাওয়া গেল না?" ফুফু ও খুসী নীরব। নুরল এসলাম হায়! হায়!! করিতে করিতে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। ফুফু-আম্মা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দেখেন, ছেলের মূর্চ্ছা হইয়াছে। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন. এমন সময় "হুরে হু হামবোল হুম" রবে দুইখানি পাল্কি বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। উকিল সাহেব পাল্কীর ভিতর হইতে নামিয়া বন্ধুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুফু-আম্মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা আমার সর্বনাশের উপর সর্বনাশ! বউ-মা আমার ঘরে নবই! ছেলে

তাহা শুনিয়া অজ্ঞান হইয়াছে।" উকিল সাহেব কহিলেন, "আপনার বউ-মা উঠানে পাল্কীর ভিতরে আছেন, তাহাকে ঘরে তুলিয়া লউন। তাঁহার অবস্থাও শোচনীয়। একটু পাতলা গরম দুধ এ সময় তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। আমি দোস্ত সাহেবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গার চেষ্টা করি।" ফুফু-আম্মা কতকটা বিস্মিত, কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বউয়ের কাছে গেলেন।

এদিকে উকিল সাহেব দেখিলেন তাঁহার দোস্তের দাঁত লাগিয়াছে। ব্যারামের শরীর, রাত্রিতে মাথায় পানি না দিয়া তিনি পকেট হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া তাহার নাকের নিকট ধরিলেন। ৫।৬ মিনিট পরে জোরে নিঃশ্বাস চলিল, তারপর নুরল এসলাম চক্ষু মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন। উকিল সাহেব বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

নুরল। দোস্ত, তুমি আসিয়াছ! আমার প্রাণের আনোয়ারা—আবার অজ্ঞান হইলেন। উকিল সাহেব চিন্তিত হইলেন। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া সাহসের সহিত মাথায় ঠাণ্ডা পানির ধারা দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নুরল আবার চক্ষু মেলিলেন, "আমার আনোয়ারা কোথায়?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উকিল সাহেব বলিলেন, "তুমি আশ্বস্ত হও, তিনি ফুফু-আম্মার ঘরে আছেন।" নুরল উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা। তাহাকে আর পাইব না।" উকিল সাহেব নুরল এসলামকে আশ্বস্ত করার জন্য কহিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি ফুফু-আম্মার ঘরে আছেন, একটু পরে দেখিতে পাইবে।" নুরল এসলাম কহিলেন, "তবে আমি এখনই দেখিতে চাই,"—এই বলিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলনে এবং 'কোথায়' বলিয়া খাট হইতে নামিবার চেষ্টা করিলেন। উকিল সাহেব তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি অত অস্থির হইও না; অসুখ শরীর, পড়িয়া যাইবে।"

নুরল। আমার ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বাস্তবিকই তখন তাঁহাকে সুস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উকিল সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "চল, আমিও সঙ্গে যাইতেছি।"

এদিকে ফুফু-আম্মা ও দাসীর যত্ন-চেষ্টায় আনোয়ারা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। নুরল ঘরে প্রবেশ করিলে সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। তখন অন্যান্য সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নুরল আনোয়ারার শয্যাপার্শ্বে

বসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার গোলাপগণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতেছে।

পলকে যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সতী জাগ্রতে যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল; স্বামীর হস্তস্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে অভাবনীয় শক্তিলাভে শয্যায় উঠিয়া বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যেন শতাব্দীর বিচ্ছেদের পর পরস্পরের সন্দর্শন, কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসে উভয়ে নীরব। কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না, যেন বিশ্বের যাবতীয় প্রেম-প্রীতি, সুখ-শান্তি একীভূত হইয়া দম্পতির বাকশক্তিকে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাই তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও মুখ ফুটিতে পারিতেছে না। এই সময় ঊষা দেবী দম্পতির এই স্বর্গীয় প্রেমলীলা দর্শনেচ্ছায় পূর্বাশার দ্বার খুলিয়া আসিয়া লীলা গৃহের বাতায়নে উঁকি মারিল। তিনটা দুষ্ট কোকিল নুরল এসলামের আম্র-কাননের আশে-পাশে পত্রান্তরালে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল তাহারা, 'কি কর ঊষা' বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঊষা চোখ রাঙাইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু দুষ্টেরা তাহাকে আরও ক্ষেপাইয়া বাতায়ন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিল। নুরল এসলাম এই সময় মৌনভাব ভঙ্গকরিয়া আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন?" আনোয়ারা নিরুত্তর।

নুরল। এ ঘরে আসিয়াছ কেন?

আনো। ফুফু-আম্মা ধরাধরি করিয়া পাল্কীর ভিতর হইতে আমাকে এ ঘরে আনিয়াছেন।

নুরল। পাল্কী! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছিলে?

আনো। বলিব না।

নুরল। আমাকে না বলিবার তোমার কিছু আছে না-কি?

আনোয়ারা লজ্জিত হইল এবং উত্তর চাপা দেওয়ার জন্য কহিল, "আপনার শরীর কেমন আছে?"

নুরল। তোমাকে পাইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছি। আমার যেন কোন পীড়া হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।

আনোয়ারা নুরল এসলামের পদ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে যদি খোদাতালার নিকট আপনার আরোগ্যের জন্য মোনাজাত করিয়া থাকি, তবে অদ্য হইতে আপনি নিরোগ হইবেন।"

নুরল। তুমি যে কোন্ সাধনা বলে আমাকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়াছ বুঝিতেছি না। সত্যিই, এখন আমার কোন পীড়া নাই। আশ্চর্যভাবে শরীরে বলাধান হইয়াছে।

আনোয়ারা স্মিতমুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কোন উত্তর করিল না।

নুরল। চল, ঘরে যাই।

আনো। আমার শরীর দুর্বল, উঠিতে পারিব না। এখানে বসিয়াই ফজরের নামাজ পড়িব।

নুরল এসলাম আর কিছু বলিলেন না। আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন। বসন্তের প্রাতঃসমীরণস্পর্শে তিনি যারপরনাই সুখবোধ করিতে লাগিলেন। যষ্টিহস্তে কিয়ৎক্ষণ প্রাঙ্গণে পদচারণ করিয়া বহির্বাটীর উদ্যানমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উকিল সাহেব এই সময় ঘুম হইতে জাগিলেন। তিনি নুরল এসলামকে বাগানপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, ''কাতর শরীর লইয়া এত প্রত্যুষে উঠিয়াছ কেন?

নুরল। আজ আমার শরীর খুব সুস্থবোধ হইতেছে; আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় উঠিয়া ইজিচেয়ারে উপবেশন করিলেন। উকিল সাহেব এই বৈঠকখানা ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন।

উকিল। সই কেমন আছেন?

নুরল। অনেকটা ভাল; কিন্তু তার কথাবার্তায় আমি ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি

উকিল। সে কেমন?

নুরল। রাত্রিতে তার ঘর হইতে উঠিয়া যাওয়া, চেষ্টা করিয়া না পাওয়া, পাল্কীতে চড়া, ফুফু-আম্মার ঘরে শোওয়া, তার সুস্থ শরীর দুর্বল হওয়া,—এই সকল কারণ জিজ্ঞাসা করায় 'বলিব না' বলিয়া উত্তর দেওয়ায় মনে অত্যন্ত খটকা লাগিয়াছে।

উকিল। (সহাস্য) সইয়ের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে নাকি?

নুরল। তার প্রতি আমার বিশ্বাস, হিমাচল হইতেও অচল, অটল।

উকিল। তবে আইস, নামাজ পড়ি।

উভয়ে একত্রে ফজরের নামাজ পড়িলেন। উকিল সাহেব বেহারাদিগকে পাল্কী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া পোশাক পরিতে লাগিলেন।

সুরল। কোথায় যাইবে ?

উকিল। একটু বেলগাঁও হইতে বেড়াইয়া আসি। তারপর তোমার খটকা দূর করিব।

রাত্রির ঘটনা সরল ফুপু-আম্মা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আনোয়ারা কাহার যেন দৈত্যবৎ মূর্তি দেখিয়াছিল। পলকমাত্রকাল স্পর্শ কাঠিন্য অনুভব করিয়াছিল, আর কিছু জানিত না, কিছুই বুঝিতেও পারে নাই ; তাহার সেই মুহূর্তমাত্রের ক্ষীণস্মৃতি পতির আরোগ্যজনিত আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আনোয়ারার কি হইয়াছিল ?

পূর্বে বলা হইয়াছে বেলগাঁও হইতে জেলা পর্যন্ত নৈঋত কোনে যে বাঁধা সড়ক আছে তাহা রতনদিয়া বাজারের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রতনদিয়া হইতে সেই পথে এক মাইল গেলে প্রায় অর্ধ মাইল ব্যাপিয়া সড়কের উভয় দিকে নিবিড় বেতস বন, নিম্ন সমতলে অবস্থিত। দুইখানি গাড়ি বা পাল্কী পরস্পর ঘেঁষাঘেষি ভাবে পাশাপাশি যাতায়াত করিতে পারে, সড়কের প্রস্থ এই পরিমান। পাপিষ্ঠেরা আনোয়ারাকে অজ্ঞানবস্থায় পাল্কীতে তুলিয়া এই সঙ্কীর্ণ বেতসবন-পথের মধ্যস্থলে আসিলে, অদূরে সম্মুখে আলো দেখিতে পায়, গণেশ ও কলিম সম্মুখে ছিল। গণেশ কহিল "ভাই আব্বাস; প্রমাদ দেখিতেছি।"

আব্বাস। কেনরে, কেন ?

গণেশ। সম্মুখে আলো দেখিতেছি।

আব্বাস লম্ফ দিয়া গণেশের স্থান অধিকার করিল, গণেশ হটিয়া গেল।

আব্বাস। পাল্কী বলিয়া বোধ হইতেছে।

কলিম। পাল্কী ত বটেই ; আবার একখানা নয়, দুইখানা।

আব্বাস। হাজারখানা হউক, হাতে কি লাঠি নাই ?

কলিম। ওরে, আবার দুই পাল্কীর আগে পিছে যে অনেক লোক দেখিতেছি।

আব্বাসের মুখ শুকাইল। তথাপি সে সাহসে ভর করিয়া কহিল, "আমাদের পাল্কীতে বাতি আছে। উহারা আমাদিগকে কিছু বলিবে না।" পাপিষ্ঠেরা আনোয়ারাকে পাল্কীতে তুলিয়া পাল্কীর সম্মুখে অসীম সাহসে আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখের পাল্কী নিকটে আসিল। পাল্কীর আগে পাছে কনেষ্টবল দুইজন, চৌকিদার দশ বারজন। অগ্রগামী কনেষ্টবল আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা পাল্কী কাঁহাছে আহা হায় ?"

আব্বাস। ষ্টিমার ঘাটছে।

কনেষ্টবল। কাঁহা যাতা হ্যায় ?

আব্বাস। জেলাকো উপর।

কনেষ্টবল। পাল্কীকা আন্দার্ কোন্ হ্যায় ?

আব্বাস। উকিল সাহেবকা বিবি হ্যায়।

কনেষ্টবল। কোন্ উকিল সাহেবকা

আব্বাস উকিল সাহেবের নাম জানে না। দুই একবার ফিয়ালসিনি মোকদ্দমায় পড়িয়া পিতার সহিত উকিল সাহেবের বাসায় গিয়াছিল মাত্র। উকিল সাহেব খুব জবরদস্ত নামজাদা এবং মুসলমান, সেই মাত্র জানিত। তাই কনেষ্টবলের কথার উত্তরে বলিল, "মুসলমান উকিলকা," অসম্পূর্ণ উত্তর শুনিয়া কনেষ্টবলেরা হাসিয়া উঠিল। গণেশ ভাবিল,—আব্বাস ঠকিয়া গিয়াছে, মুসলমান উকিলের নামে বিপদ কাটিবে না। এইরূপ ভাবিয়া সে কহিল, "সিপাই সাহেব, ও শালা লোক বোকার ওস্তাদ হ্যায়, চুড়ানকো ঢেকি বলিয়া ফেলতা হ্যায়। পাল্কীর ভিতর ডেপুটি বাবুর মেম সাহেব বিবি রতা।" কনেষ্টবলেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পাল্কীর মধ্য হইতে ডেপুটি গনেশবাহন বাবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুইতিন মিনিটে এই সকল কথার রহস্য হইল। এই সময় মধ্যে আব্বাস আলীদিগের পাল্কী ডেপুটি বাবুর পাল্কী অতিক্রম করিয়া আর এক পাল্কীর সম্মুখীন হইল। এ পাল্কীরও আগে-পাছে লোকজন পাইক-প্যাদা। ডেপুটিবাবু নিজ পাল্কী থামাইয়া অনুচরদিগকে কহিলেন, "আভি ওস্‌কা পাল্কী পাকড়লেও।" পশ্চাদ্বর্তী পাল্কী লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "উকিল সাহেব, আপনার সঙ্গের লোক দিয়া সম্মুখের পাল্কী ঠেকাইয়া দেন।" কথা-নুসারে কার্য হইল। ডেপুটি বাবু হাটিয়া উকিল সাহেবের পাল্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আব্বাস আলী ও কলিম প্রভৃতি তখন অনন্যোপায় লাঠি অবলম্বনে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আব্বাসের লাঠির আঘাতে একজন কনেষ্টবল ও দুইজন চৌকিদার আহত হইল। কলিম একজন বেহারা ও তিনজন চৌকিদারকে আহত করিল। ডেপুটি বাবু ও উকিল সাহেব দুইটি লোকের পরাক্রম দেখিয়া অবাক হইলেন; কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। অবশিষ্ট চৌকিদার ও কনেষ্টবলের অবিশ্রান্ত যষ্টি প্রহারে তাহারা মাটিতে পড়িয়া গেল। খাদেম ও গণেশ

পলাইতে চেষ্টা করিয়া সড়কের নীচে গড়াইতে গড়াইতে বেতস বনে আটকাইয়া পড়িল। দুইজন বেহারারও ঐ দশা ঘটিল। চৌকিদারগণ তাহাদিগকে পরে খুঁজিয়া বাহির করিল। পূর্বে বলা হইয়াছে 'গণেশ ভীরু ও মাথা পাগল; সে যখন ধরা পড়িল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, শালা আব্বাস এখন কোথায় গিয়াছ? সতীকে ত' ছুঁইতেও পারিলে না, মাঝ হইতে গণেশ বেটার প্রাণ যায়! হায়, হায়—জাতিও গেল, পেটও ভরিল না!" চৌকিদার হাসিয়া কহিল, "আরে চল্ চল্, তোদের সকলেই সড়কের উপরে আছে, চল্ সেখানে গেলে টের পাবি এখন।"

গণেশ। বাবা, বেতের কাঁটায় বিলক্ষণ টের পাইয়াছি। দেখ না গা দিয়া রক্তগঙ্গা ছুটিয়াছে। ইহার উপর আর টের পাওয়াইলে প্রাণের আশা কোথায়?

চৌকিদার হাসিতে হাসিতে গণেশের হাত ধরিতে উদ্যত হইল।

গণেশ। চৌকিদার বাবা, আমাকে ধ'র না বাবা! আমি কোন দোষ করি নাই বাবা! আমি তোমার বাবা না না, তুমি আমার—আমাকে রক্ষা কর বাবা!

এই বলিয়া সে স্বেচ্ছায় সড়কের উপর উঠিল। চৌকিদার খাদেম ও দুইজন বেহারাকে বাঁধিয়া সেই সঙ্গে উপরে আনিল।

ডেপুটি বাবু উকিল সাহেবকে কহিলেন, "দেখুন পাল্কীর ভিতরে কে আছে?" একজন চৌকিদার আলো ধরিল, উকিল সাহেব স্বহস্তে পাল্কীর দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একজন অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কীতে পড়িয়া আছে; তাঁহার মুখে কাপড় গোঁজা। উকিল সাহেব মুখের কাপড় টানিয়া বাহির করিলেন। যুবতী গোঙাইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত নির্গত হইয়া পড়িল। উকিল সাহেব বাতির আলো তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। দৃষ্টিমাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "জলদী পানি।" ইংরাজী ভাষায় কহিলেন, "ডেপুটি বাবু, আমার যে বন্ধুকে দেখিতে যাইতেছি, হায়! হায়!! তাঁহারই সর্বনাশ! তাঁহারই স্ত্রী অজ্ঞানাবস্থায় পাল্কীতে পড়িয়া, গলা দিয়া রক্ত উঠিয়াছে।" ডেপুটি বাবু—"এঁ্যা বলেন কি?" বলিয়া কনেষ্টবল ও চৌকিদারগণকে কড়া হুকুম দিলেন, "বেটারা যেন পলাইতে না পারে, বিশেষ সাবধানে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেল।"

ডেপুটি বাবুর হুকুম শুনিয়া গণেশ কহিল, "হুজুর, এ শালারা বদমাইশের গোড়া, তার মধ্যে ঐ আব্বাস শালাই আদত শিকড়। শালা আমাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া সতী-হরণে নিযুক্ত করিয়াছে। আমি ওর পিতার নিকট ৩ শত টাকা ধারি। ঐ টাকার এক পয়সাও সুদ লইবে না বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে এই পাপ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। ও টাকার বলে এ দেশের সুন্দরী কুলবধূ ও কুলকন্যা কিছু বাকী রাখে নাই। কিন্তু আজ শালার বড় আশায় ছাই পড়িল। আমাকে বাঁধিবেন না, আমি ওর সমস্ত সলা-পরামর্শের কথা আপনার নিকট খুলিয়া বলিতেছি।"

ডেপুটি বাবু। আচ্ছা, তুই যদি সত্য কথা বলিস, তবে তোকে বাঁধিব না।

গণেশ। হুজুর, কালী মা'র দিব্বি, সত্য ছাড়া একরত্তি মিথ্যা বলিব না। আপনি আমার জন্মের বাবা।

ডেপুটি বাবু গণেশকে একজন চৌকিদারের জিম্মায় দিয়া উকিল সাহেবের নিকট আসিলেন। এদিকে উকিল সাহেব যুবতীর মাথায় পানির ধারা দিতে দিতে সে ক্রমে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল, ক্রমে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে কহিল. "আমি কোথায়?" উকিল সাহেব কহিলেন, "আপনি ভাল স্থানে আছেন।" যুবতী উকিল সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

ডেপুটি বাবু কহিলেন, "খুবই অবসন্ন হইয়াছেন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।" উকিল সাহেবের পাল্কীতে আটজন বেহারা ছিল। তাহাদের চারজন যুবতীকে স্কন্ধে লইল। ডেপুটি বাবু ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন রাত্রি ১॥ টা।

পথে রওয়ানা হইয়া উকিল সাহেব ডেপুটি বাবুকে ইংরাজীতে কহিলেন, "আমার বন্ধুর এই দুর্ঘটনা যাহাতে প্রকাশ না হয়, আপনি তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত কার্য করিবেন। আমরা মুসলমান।"

ডেপুটি বাবু 'আচ্ছা' বলিয়া বদমাইশদিগকে লইয়া বেলগাঁও থানার দিকে এবং উকিল সাহেব বন্ধুপত্নীকে লইয়া বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন।

তারপর যাহা ঘটিয়াছে পূর্ব পরিচ্ছেদে সকল কথা লিখিত হইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উকিল সাহেব বেলগাঁও উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থানার আঙ্গিনায় ও আশে-পাশে চৌকিদার গিজ্ গিজ করিতেছে। থানার দারোগা কামদেব বাবুর উৎকোচপ্রিয়তার ও অর্থলোভে চৌকিদারগণ সময়মত পুরাহালে অনেক দিন যাবৎ মাহিনা পায় না, তাই তাহারা ধর্মঘট করিয়া গোল বাধাইয়া তুলিয়াছে। জেলার সিনিয়ার ডেপুটি সেই গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য বেলগাঁও আসিয়াছেন।

শনিবার কোর্টের কার্য শেষ করিয়া বাসায় আসিবার সময় পথে উকিল সাহেবের সহিত ডেপুটি বাবুর দেখা। কথা প্রসঙ্গে ডেপুটি বাবু বলেন, "আগামী কল্য আমাকে বেলগাঁও যাইতে হইবে।" উকিল সাহেব বলেন, "আমিও তাহার সন্নিকটে রতনদিয়া গ্রামে আমার বন্ধুকে দেখিতে যাইব।" ডেপুটি বাবু শুনিয়া কহিলেন, "অসম্ভব গরম পড়িয়াছে, দিনে পথচলা কঠিন। সুতরাং অদ্য রাত্রিতে একসঙ্গে যাওয়া যাক।" উকিল সাহেব কহিলেন, "তাহাই হোক।" পরে উভয়ে রাত্রিতে আহারান্তে একসঙ্গে গমন করিলেন। তারপর পথিমধ্যে যেরূপ ভাবে দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

ডেপুটি বাবু ডাকবাংলায় অবস্থিতি করিতেন। উকিল সাহেবের পাল্কী তথায় উপস্থিত হইলে, ডেপুটি বাবু তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণপূর্বক ঘরে লইয়া গেলেন। এই সময় ঘরের ভিতর একটি রমণী ও একটি নবীন যুবক উপস্থিত ছিল। উকিল সাহেব আসন গ্রহণ করিলে ডেপুটি বাবু আগ্রহ সহকারে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বন্ধুপত্নী কেমন আছেন?"

উকিল। অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।

ডেপুটি। তাঁহার পতিপরায়ণতায় শত ধন্যবাদ। এই যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছেন, এইটি বদমাইশ দলের গোড়া। ইহার নাম দুর্গা। আর যুবকের নাম গণেশ। ইহারা নানাবিধ প্রলোভন ও কৌশলে বশীভূত করিয়া সতী হরণের চক্রান্ত করিয়াছিল। ইহাদের মুখে যাহা শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে আপনার বন্ধুপত্নীর মত সাধ্বী সতী জগতে বিরল বলিতে হইবে। পতির

প্রাণরক্ষার জন্য সরল বিশ্বাসে, সরল প্রাণে এইরূপ ভাবে প্রাণদানে উদ্যতা কোন রমণীর কথা এ পর্যন্ত শুনি নাই ; এমন কি কোন পুরাতন ইতিহাসে আছে কি না তাহাও জানি না।

এই বলিয়া তিনি উকিল সাহেবের নিকট দুর্গার কথিত জীবন-সঞ্চার-ব্রতের কথা ও সঞ্জীবনী লতার কথা সবিস্তারে বলিলেন। উকিল সাহেব কহিলেন, "আমার বন্ধুপত্নী যে সতীকুলে কোহিনুর হইবেন, তাহা আমি তাঁহার বিবাহের পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; কিন্তু এই বৈষ্ণবীর শয়তানী কাণ্ডের কথা শুনিয়া অবাক হইতেছি। এমন ভাবে সাধ্বী-সতী কুলবধুকে ঘরের বাহির করিবার এমন অদ্ভুত পন্থার কথা জীবনে কদাচ শুনি নাই।"

ডেপুটি। ইহাদের কঠিন ভাবে শাস্তি দিতে হইবে।

উকিল। আমি আপনার নিকট সর্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি।

ডেপুটি। আপনি যে অপহরণ বৃত্তান্ত গোপন রাখার অনুরোধ করিয়াছেন ; আমি তৎসম্বন্ধে এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিতেছি—

প্রথমতঃ আসামীদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে গেলে, মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে হইবে ; সুতরাং তথায় তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ আপনার বন্ধুর ঘরজামাই ভগিনীপতি খাদেম আলী এই অপহরণের পথপ্রদর্শক আসামী। সুতরাং অগ্রে এ কথা আপনার বন্ধুর বাড়ী হইতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

উকিল সাহেব খাদেম আলীর নাম শুনিয়া লজ্জিত ও মর্মাহত হইলেন। সড়কের উপর সে যখন ধরা পড়ে,তখন উকিল সাহেব তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

"তৃতীয়তঃ আমি বুঝিতেছি, এই চুরি প্রকাশিত হইলে শুভ ব্যতিত অশুভ হইবে না। কারণ, সীতা-হরণে যেমন যুগ-যুগান্তরাবধি তাঁহার সতীত্ব-মাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত হইতেছে, পরন্তু তাহাতে সূর্যবংশের গৌরবই বর্ধিত হইয়াছে ; এ চুরিতেও অবশ্য তদ্রূপ ফল ফলিবে।"

উকিল। আমি ভাবিতেছি, লোকাপবাদে সতীর আবার বনবাস না ঘটে।

ডেপুটি। সতীর বনবাসে রাম-চরিত্র মলিনই হইয়াছে। আপনার দোস্তের স্বভাব কেমন ?

উকিল। এস্থলে রাম-পক্ষ হইতে না হইলেও সীতার দিক হইতে বনবাস ঘটিতে পারে। কারণ যে স্বামীর প্রাণরক্ষায় অসঙ্কোচে নিজ প্রাণ বিসর্জনে উদ্যতা, সে যে তাহার স্বামীর লোকাপবাদ দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় স্বামীসংসর্গ ত্যাগ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি?

ডেপুটি। এমন সতী, স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না।

উকিল সাহেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনি জ্ঞানী, বহুদর্শী বিচারপতি। যাহা ভাল বোধ করিবেন তাহাই শিরোধার্য।"

ডেপুটি। ইহাদিগকে এই বেলাতেই জেলায় চালান দিব। মোকদ্দমা গভর্ণমেণ্টবাদী হইয়া চলিবে।

তারপর হাসিয়া কহিলেন, "আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে।"

উকিল। আপনি ত' মূর্তিমান গভর্ণমেণ্ট। এই পবিত্রাসনে আপনাকেই আগে পা দিতে হইবে।

ডেপুটি। (স্মিতমুখে) তাহা ত' বুঝিতেছি। এই গণেশ বেটাকে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

উকিল। আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বদমাইশদিগের প্রতি আপনার সন্দেহ হইয়াছিল কিরূপে?

ডেপুটি। সে এক হাসির কাণ্ডকারখানা; মোটকথা এই গণেশ ও আব্বাসের কথার অনৈক্য হওয়াতে আমার সন্দেহ হয়।

"তবে এখন আসি" বলিয়া উকিল সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আব্বাস আলী নামজাদা ধনীর একমাত্র আদরের পুত্র। দুষ্কার্য করিয়া এ পর্যন্ত কেবল অর্থ বলেই রক্ষা পাইয়াছে ; কখনও ধরা পড়ে নাই। সে অদ্য থানার ঘরে বন্দী। তাহার হাতে আজ হাতকড়া। তাহার সহিত খাদেম আলী, করিম, দুর্গা তদবস্থায় আবদ্ধ।—একথা বন্দরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। আব্বাস আলীর পিতা রহমতুল্লা মিয়া প্রাতঃকালে আসিয়া দারোগা বাবুকে একশত টাকার নোট দিয়া সেলাম করিয়াছেন। উকিল সাহেবের বিদায়ের পর দারোগা বাবু রহমতুল্লা মিঞাকে কহিলেন, "বড়ই কঠিন ব্যাপার স্বয়ং জেলার বড় ডেপুটি বাবু গ্রেপ্তারকারী। তাঁহার মত কড়া হাকিম এদেশে আর নাই।"

রহমতুল্লা। যত টাকা লাগে দিতেছি, আপনি আমার ছেলেকে রক্ষা করুন।

দারোগা। কোন উপায় দেখিতেছি না।

রহমতুল্লা। আপনি হাকিমকে যত টাকা লাগে দিয়া উপায় করুন।

দারোগা। বাপরে! তবে এখনই চাকরীটা খোয়াইয়া জেলে যাইতে হইবে।

রহমতুল্লা মিঞা হতাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দারোগা। আপনি নিজে যাইয়া তাঁহার পা ধরিয়া কবুল করাইতে পারেন কি না চেষ্টা করুন। তবে ২।৫ হাজার টাকার কথা মুখে আনিবেন না। অনেক উপরে উঠিতে হইবে।

রহমতুল্লা মিঞা তখন অসীম সাহসে ডাকবাংলায় উপস্থিত হইয়া ডেপুটি বাবুর নিকট নিজ পরিচয় দিলেন এবং পুত্রের রক্ষার জন্য তাঁহার পা ধরিয়া একেবারে দ হাজার টাকা স্বীকার করিলেন। এই সময় তথায় আর কেহ ছিল না। এককালে দশ হাজার টাকা ঘুষের কথায় হাকিম প্রবরের মনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তথাপি তিনি মুখে ক্রোধ জানাইয়া কহিলেন, "তোমার এতদূর সাহস? আমার কাছে ঘুষের প্রস্তাব! তোমাকে জেলে দিব।" আব্বাস আলীর পিতা এগার হাজার স্বীকার করিলেন।

এবার ডেপুটি বাবু সদয়ভাবে কহিলেন, "এ ত'আচ্ছা লোক দেখিতেছি।"

আব্বাস আলীর পিতা আরও এক হাজার স্বীকার করিলেন।

ডেপুটি। পা ছাড়ুন, উঠিয়া বসুন।

বলিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, লোকটাকে রক্ষা করা উচিত কি না? পরে রহমতুল্লাহ মিঞাকে কহিলেন, "যে ভাবের চুরি, ইহাতে আপনার পুত্র চৌদ্দ বৎসর জেলের কাবেল।" তখন আরও হাজার টাকা স্বীকার করিয়া আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটি বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ডেপুটি বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন। তাহার পর বড়ে দিয়া দাবা মারিয়া জিতিবার মানসে এক নতুন চাল চালিলেন। কহিলেন, "আপনি জেলার বড় উকিল মীর আমজাদ হোসেন সাহেবকে চিনেন?"

রহমতুল্লাহ। চিনি, তাঁর দ্বারা অনেকবার মোকদ্দমাও করাইয়াছি।

ডেপুটি। তিনি এক্ষণে রতনদিয়ায় তাঁহার বন্ধু নুরল এসলাম সাহেবের বাড়ীতে আছেন। তিনি এই মোকদ্দমার সাক্ষী, আপনি তাঁহাকে বশ করিতে পারিলে আপনার ছেলের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ডেপুটি বাবুর বিশ্বাস, এক যোগে বেশী টাকা উৎকোচ পাইলে মুসলমান উকিল তাঁহার দোস্তকে রাজী করাইয়া নিশ্চয় মোকদ্দমাও ছাড়িয়া দিবেন।

উকিল সাহেব রতনদিয়ায় আসিয়া নাশতা করিয়া সবেমাত্র বাহির বাড়ীতে আসিয়াছেন, এমন সময় রহমতুল্লাহ মিঞা তথায় উপস্থিত হইলেন। উকিল সাহেব তাঁহাকে পূর্ব হইতে জানেন। এজন্য কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। মিয়া সাহেব আদর পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। একটু পরে তিনি সসম্মানে উকিল সাহেবকে নির্জন উদ্যান-অন্তরালে লইয়া গিয়া ছেলের চুরিরকথা বলিয়া ক্রমে ৫ হাজার হইতে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বীকার করিলেন। উকিল সাহেব লোকটা কত টাকা দিতে পারে শুধু এইটুকু জানিবার ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, যখন কুড়ি হাজার টাকা স্বীকার করিয়া মিঞা সাহেব তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি সজোরে পা ছাড়াইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া আসিলেন। উকিল সাহেব অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার কিছু-কাল পরে নুরল এসলাম যষ্টিহস্তে বাহির বাড়ীতে আসিয়া ঐ ঘটনা দেখিয়া-ছিলেন। উকিল সাহেব বৈঠকখানায় অসিয়া উপবেশন করিলে নুরল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারখানা কি?"

উকিল। ব্যাপার চমৎকার।

নুরল। শুনিতে পাই না?

উকিল। শুন, গতরাত্রিতে ভরাডুবার দুর্গানাম্নী এক বৈষ্ণবী, ঐ তালুকদারের পুত্র আরও কয়েকটি কুল-প্রদীপের সাহায্যে একটি ব্রতকরিয়াছিলেন, কিন্তু ফল বিপরীত হাওয়ায় ব্রতসাহায্যকারীর পিতা, ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার নিকট কিছু দক্ষিণা লইয়া আসিয়াছিল।

নুরল এসলাম মনে করিলেন, বন্ধু উকিল মানুষ, তালুকদারের পুত্র ভয়ানক গুণ্ডা, বোধ হয় কোনো ফিয়ালসিনি মোকদ্দমায় পড়িয়া পুত্র রক্ষার্থে উৎকোচ দিতে আসিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণা কত?"

উকিল। কুড়ি হাজার টাকা।

নুরল। গ্রহণ করিলে না?

উকিল। আমাকে তুমি এত ছোট মনে কর?

নুরল। কোন্ দেবীর ব্রত করিয়াছিলেন?

উকিল। আমার সই আনোয়ারা দেবীর।

নুরল এসলামের চক্ষু বড় হইয়া উঠিল, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

উকিল। (সহাস্যে) ভয় নাই, দম ফেল। তোমার মনের খট্‌কা দূর করিতেছি।

এই বলিয়া উকিল সাহেব রাত্রির সমস্ত ঘটনা এবং ডেপুটি বাবুর মুখের জীব-সঞ্চার-ব্রতের কথা ও সঞ্জীবনী লতা তোলার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। নুরল এসলাম দম ফেলিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি স্ত্রীর অভূতপূর্ব পতিপরায়ণতায় অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ-রসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি কোন সন্দেহ না করিয়া যে সুখী হইলেন, ইহাতে উকিল সাহেবও পুলকিত হইলেন। এদিকে আব্বাসের পিতা পুনরায় ডেপুটি বাবুর নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

উকিল সাহেব সোমবার প্রত্যুষে জেলায় রওয়ানা হইলেন, যাইবার সময় সঙ্গে আনীত হেবানামাখানি বন্ধুর হস্তে দিয়া কহিলেন, "দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলাম বলিয়া ইহা তোমাকে দিয়া গেলাম, নচেৎ সতীমাহাত্ম্যের যে ফল দেখিতেছি তাহাতে আল্লাহর ফজলে উহার দরকার হইবে না।"

নুরল। দোস্ত, খোদাতা'লার অনুগ্রহে গতকল্য হইতে সত্যি আমার শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতেছে।

উকিল। সত্যই বলিতেছি, সই-এর মত স্ত্রী যার, তিনি অজয়, অমর।

নুরল এসলাম কহিলেন, "দানের বস্তু আর প্রতিগ্রহণ করিব না। আল্লাহ ভাল রাখিলে অবসর মত উহা রেজিষ্টারী করিয়া দিব।"

উকিল সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। নুরল এসলাম দলিলখানি লইয়া স্ত্রীর হস্তে দিলেন।

অনন্তর আনোয়ারার ঐকান্তিক সেবা-শুশ্রূষায় নুরল এসলাম অল্প দিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পতির আরোগ্যলাভে সতীর মনে আনন্দ আর ধরে না। এজন্য সতী খোদাতায়ালার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

একদিন আনোয়ারা তাহার শয়ন ঘরের যাবতীয় শয্য ও বস্ত্রাদি দাসীকে রৌদ্রে দিতে আদেশ করিল। দাসী একে একে বালিশ, গদি, তোষক বস্ত্র প্রভৃতি রৌদ্রে দিল। আনোয়ারা সঞ্জীবনী-লতা তুলিবার পূর্ব-রাত্রিতে স্বামীকে যে চিরবিদায়-লিপি লিখিয়া তাহার উপাধান নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। নুরল এসলামেরও ইতিপূর্বে তাহা হস্তগত হয় নাই। দাসী বালিশের নীচের সেই চিঠি প্রয়োজনীয় মনে করিয়া মনিবের একটি আচকানের পকেটে রাখিয়া দিল।

৯

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আব্বাস আলী প্রভৃতি বদমাইশেরা জেলায় আসিয়া হাজতে পচিতে লাগিল। বহু বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও আব্বাস আলীর পিতা ছেলের হাজত মুক্তির জন্য আমিন মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারান্তে মোকদ্দমা দায়রায় দিলেন। আব্বাস আলীর পিতা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। খাদেম আলীর পিতা বেলগাঁওয়ের দোকানপাট ও গোপীনপুরের তালুক বিক্রয় করিয়া আব্বাস আলীর পিতার সহিত এজমালিতে মোকদ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কলিমের পিতা ও গণেশের অভিভাবক প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্য করা নিষ্ফল মনে করিলেন। জজ সাহেবের আদেশানুসারে জনৈক উকিল আনোয়ারার জবানবন্দী লইতে রতনদিয়ায় আসিলেন। আসামীর ব্যারিষ্টারও সঙ্গে আসিলেন। গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে একজন উকিল নিযুক্ত হইলেন।

নুরল এসলাম স্ত্রীকে কহিলেন, "তোমার জবানবন্দী করিতে জেলা হইতে উকিল-ব্যারিষ্টার আসিয়াছেন।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে পতিপরায়ণা আনোয়ারার সে করালকালরাত্রির মুহূর্ত-মাত্রের ক্ষীণস্মৃতি পতির আরোগ্যজনিত আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই সে স্বামীর উত্তরে কহিল, "কিসের জবানবন্দী।"

নুরল। যে যোগ-সাধনায় এই খাকছারকে আজরাইলের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ।

আনো। আল্লাহতায়ালার দয়ায় রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার আবার জবান-বন্দী কি?

নুরল দুর্গা বৈষ্ণবীর শয়তানী লীলা ও ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "দোস্ত সাহেব পাপিষ্ঠদিগের শাস্তির জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সেই মোকদ্দমায় তোমার জবানবন্দী দরকার।"

আনোয়ারা বৈষ্ণবীর বজ্জাতির কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঘৃণায় লজ্জায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

আমি তোমার মনের উন্নত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু ছাড়িয়া
দায়ী আমরা নহি, স্বয়ং গভর্ণমেন্ট বাদী ; তা ছাড়া, এ-ক্ষেত্রে
য় প্রদান করিলেই জগতের মঙ্গল বিধান করা হইবে।

আমি কেমন করিয়া জবানবন্দী দিব ?

সেই রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে উকিল-ব্যারিষ্টার তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা
মি তাহার উত্তর দিবে।

। (প্রেমকোপে স্বামীর দিকে চাহিয়া) উকিল-ব্যারিষ্টারের মুখে
আনোয়ারা খাতুন তাহাদের সহিত কথা বলিবে ?

নুরল। (হাসিমুখে) পর্দার অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর দিবে তাহাতে দোষ কি ?

আনো। (অভিমান কটাক্ষে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেশমান্য দেওয়ান সাহেবের অসূর্য্যম্পশ্যা সহধর্ম্মিনী পরপুরুষের সহিত কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করে।

তবে জবানবন্দী কিরূপে দিবে ?

উকিলের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর অন্দর হইতে লিখিয়া দিব।

.সলাম তখন স্বপক্ষে উকিলকে যাইয়া কহিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর লিখিত জবানবন্দী গ্রহণ করুন।"

উকিল। আইন অনুসারে লিখিত জবানবন্দী গ্রাহ্য নহে।

নুরল এসলাম অগত্যা স্ত্রীকে অনেক উপদেশ দিয়া মৌখিক জবানবন্দী দিতে বাধ্য করিলেন। আনোয়ারা স্বামীর আদেশে মরমে মরিয়া পর্দার অন্তরালে থাকিয়া অনুচ্চভাবে উকিল-ব্যারিষ্টারের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিল।

গভর্ণমেন্টের উকিল দুর্গা বৈষ্ণবীর ভিক্ষা করা হইতে আরম্ভ করিয়া বদমাইশ-দের গ্রেফতার পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া একে একে সসম্মানে আনোয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আনোয়ারার যাহা স্মরণ ছিল, সমস্ত কথার উত্তর দিল। বাহুল্য ভয়ে এখানে তৎসমস্ত উল্লেখিত হইল না ; কিন্তু আনোয়ারা যেরূপ সত্যতা ও তেজস্বিতার সহিত উকিলের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহাতে আসামীর ব্যারিষ্টার আসামীকে রক্ষা করা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তবে আসামীর আশু মনোরঞ্জনের জন্য আনোয়ারাকে নিম্নলিখিত-রূপ কয়েকটি জেরা করিলেন।

ব্যারিষ্টার। আপনি কত রাত্রিতে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন ?

আনো। দুপুর রাতে—১২টায়।

ব্যারিষ্টার। আপনি কি ঘড়ি দেখিয়া বাহির হইয়াছিলেন ?

আনো। হাঁ।

ব্যারিষ্টার। আপনার সঙ্গে আর কেহ ছিল না ?

আনো। না।

ব্যারিষ্টার। অত রাত্রিতে একাকিনী ঘরের বাহির হইতে আপনার ভয় হইল না ?

আনো। না।

ব্যারিষ্টার। অমন সময় পুরুষ মানুষের ভয় হয়, আর আপনার ভয় হইল না ?

আনোয়ারা নিরুত্তর।

ব্যারিষ্টার। যখন বাহির হন তখন আপনার স্বামী কোথায় ছিলেন ?

আনো। ঘরে।

ব্যারিষ্টার। নিদ্রিত না জাগ্রত ?

আনো। নিদ্রিত।

ব্যারিষ্টার। বাহিরে যাইতে আপনাকে কেহ ডাকিয়াছিল কি ?

আনো। কেহ না।

ব্যারিষ্টার। তবে কোন্ সূত্রে বাহিরে গেলেন ?

আনো। বৈষ্ণবীর সঙ্কেতানুসারে।

উকিল বাবু ব্যারিষ্টার সাহেবকে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরেই উনি সকল কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং পুনরায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।" ব্যারিষ্টার প্রবর ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

উকিল। আচ্ছা করুন।

ব্যারিষ্টার। আপনি বাহিরে যাইয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন ?

আনো। কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, তবে ভীষণ দৈত্যের মত হঠাৎ কে যেন পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিল।

ব্যারিষ্টার। আপনি তখন কি করিলেন ?

আনো। জানি না।

অতঃপর ব্যারিষ্টার আর জেরা করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিয়া চুপ করিলেন। ...প্রতিনিধি আনোয়ারার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া যথাসময়ে জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিলেন।

যথাসময়ে জজকোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। ডেপুটি বাবু ও উকিল সাহেব একে একে সাক্ষ্য দিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব ডেপুটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ... আপনারা বদমাইশদের গ্রেপ্তার করেন, তখন রাত্রি কত?"

ডেপুটি। ১২টা ১৫ মিনিট।

ব্যারিষ্টার। ঘটনাস্থল হইতে রতনদিয়া গ্রাম কতদুর?

ডেপুটি। ঠিক জানি না।

ব্যারিষ্টার উকিল আমজাদ সাহেবকে একটু কৌশলের সহিত জেরা করিলেন, "আপনারা যখন আসামী গ্রেপ্তার করেন তখন রাত্রি কত?"

উকিল। ১২টা ১৫ মিনিট। ব্যারিষ্টার সাহেবের মুখে মলিনতার ছায়া পড়িল।

ব্যারিষ্টার। ঘটনাস্থল হইতে আপনার দোস্তের বাড়ী কতদুর?

উকিল। দেড় মাইল।

গণেশ সাক্ষীরূপে সরলমনে সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। আব্বাস, কলিম প্রভৃতি পাষণ্ডেরা দুর্গা বৈষ্ণবীর সাহায্যে যেরূপ কৌশলে কুলবধুকে ঘরের বাহির করে, অতি বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রয়োগে গণেশ সে সকল কথা বলিয়া গেল। ব্যারিষ্টারের জেরার উত্তরে সে বলিল, "আমরা বড় বাবুর স্ত্রীকে পাল্কীতে তুলিয়াই বিরামপুর গ্রামের দিকে ছুটিয়াছিলাম। তথায় আব্বাস আলীর ন্যায় আর একটি লোকের বাড়ী। সে আব্বাস আলীদিগের খাতক। তথায় বড় বাবুর বিবিকে লইয়া রাখিবার কথাবার্তা পূর্বেই সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু পথেই ধরা পড়িলাম।"

অতঃপর উকিল, ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা ও আইন-ঘটিত যুক্তি-তর্কের কথা জজ সাহেব শুনিলেন। তদনন্তর জুরীদিগকে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। জুরিগণ একবাক্যে আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন।

পরিশেষে জজ সাহেব রায় লিখিয়া হুকুম দিলেন—আব্বাস আলী ও দুর্গা বৈষ্ণবীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর, কলিম ও খাদেম আলীর প্রতি

৪ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। বেহারাগণেরও এক বৎসরের শাস্তি [illegible] গণেশ প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী দেওয়ায় বেকসুর খালাস পাইল। সদাশয় [illegible] আনোয়ারার সরলতা ও পতিপরায়ণতার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলেন [illegible]

আব্বাস আলী ও খাদেমের পিতা 'হায় হায়' করিতে করিতে বাড়ী [illegible] দেশময় রাষ্ট্র হইল—বেলগাঁও জুট অফিসের বড়বাবুর বিবিকে [illegible] করিতে যাইয়া গুণ্ডাদলের নিপাত হইল। দীন-দরিদ্র-হিন্দু-মুসলমান কুল-[illegible] আনোয়ারাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, তোমার সতীপনা[illegible] হইতে আমাদের জাতি-মান রক্ষা হইল। অনেক গুণ্ডাভীত-মহিলা কেহ [illegible] দুয়ারে, কেহ মসজিদে মানত শোধ করিল। কেবল সালেহার মা মাথা কুটিয়া আনোয়ারাকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন। একদিন মাতার এই অবৈধ গালাগালি শুনিয়া সালেহা তাহার প্রতিবাদ করিল। মা ক্ষিপ্তার ন্যায় হইয়া সালেহাকে স্বহস্তে প্রহার করিলেন। কন্যা দুঃখে অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া আনোয়ারার নিকট উপস্থিত হইল। আনোয়ারা তাহাকে সস্নেহে সাদরে গ্রহণ করিল।

এদিকে খাদেম আলীর পিতা, পুত্রের দোষে সর্বস্ব হারাইয়া [illegible] ভগ্নির বাড়ী যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আল্লার ফজলে সতীর সেবা-সাধনায় নুরল এসলাম পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কোম্পানীর কার্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলামের পরবর্তী জীবনের ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্বে, বেলগাঁও বন্দরের একটি চিত্র এস্থলে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

স্রোতোবাহিনী-সরিতের সৈকতসমন্বিত পশ্চিম তটে অর্ধবৃত্তাকারে বেলগাঁও বন্দর অবস্থিত। বন্দরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে কোম্পানীর পাটের কারখানা ও অফিস ঘর। নাতিবৃহৎ অফিস-গৃহ করগেট টিনে নির্মিত, দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; সদর দরজা দক্ষিণ মুখে। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠে বড়বাবু নুরল এসলাম, পূর্ব-প্রকোষ্ঠে ছোটবাবু রতীশচন্দ্র সরকার কার্য করেন। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকে কোম্পানীর মূলধন থাকে, তাহা পশ্চিম প্রকোষ্ঠে বড়বাবুর জিম্মায়। গ্রীষ্মকালে তটিনীর সৈকতসীমা পূর্বদিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়, এইজন্যে এই সময় বন্দরে পানির বড়ই কষ্ট হয়। সদাশয় জুট ম্যানেজার সাহেব সর্বসাধারণের এই পানির কষ্ট নিবারণের জন্যে কোম্পানীর অর্থে, অফিস ঘরের পশ্চিমাংশে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পুষ্করিণীর পূর্বে ও উত্তরে দুইটি শানবাঁধা ঘাট। পূর্বের ঘাট দিয়া অফিসের লোক ও উত্তরের ঘাট দিয়া সাধারন লোক পানির জন্যে যাতায়াত করে। পশ্চিম পাড় নানাবিধ আগাছা লতাগুল্মে পূর্ণ, দক্ষিণ দিকে কোম্পানীর ফলবান বৃক্ষের বাগান। অফিস ঘরের উত্তর দিকে অনতিদূরে বড়বাবুর বাসা। বাসার উত্তর প্রান্তে জুম্মা মসজিদ। মসজিদের বায়ু-কোণে বাজার, সোম ও শুক্রবারে বন্দরে হাট বসে। বন্দরের পশ্চিম অংশে থানার ঘর। তাহার পশ্চিম দক্ষিণে কিছু দূরে বারাঙ্গনা-পল্লী। রতীশবাবুর বাসা বন্দরের উপর সদর রাস্তার ধারে। তাঁহার চরিত্র মন্দ;—এক রক্ষিতা রাখিয়াছেন। উপার্জিত অর্থ তাহার সেবাতেই ব্যয়িত হয়। রতীশবাবু বড়বাবু অপেক্ষা কিছু বেশীদিনের চাকর। তিনি ধূর্তের শিরোমণি, অসৎকার্যে তাঁহার অদম্য সাহস; মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা। বড়বাবুর নিযুক্তির পূর্বে তিনি অসদুপায়ে মাসে ৫০৲, ৬০৲ টাকা উপার্জন করিতেন। যাচনদার দাগু বিশ্বাস পুরাতন চাকর। সে শয়তানের ওস্তাদ; মাসিক বেতন ৯৲ টাকা। বড়বাবু আসিবার পূর্বে তাহারও ৩০, ৩৫৲ টাকা

আয় হইত। নিম্নপদে আরও ৩।৪ জন চাকর আছে। তাহাদের উপরি আয়ও ঐ অনুপাতে হইত। ভিজা পাট শুক্না বলিয়া চালাইয়া, ১০০ মণে একমণ করিয়া পাইকার বেপারীগণের নিকট দস্তরী ও ঘুষ লইয়া দুষ্টেরা উল্লিখিতরূপে উপরি আয় করিত। এইরূপ করিয়া তাহারা কোম্পানীর সমূহ টাকা ক্ষতি করিত। আবার ভিজা পাট চালান দেওয়ার দরুন অনেক সময় কলিকাতার ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কমদরে কোম্পানীর পাট বিক্রয় হইত। ইহাতেও কোম্পানীর অনেক টাকা লোকসান হইত। নুরল এসলাম কার্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনেই ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝিয়া উঠিলেন। নিমকহারাম চাকরদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় কোম্পানী যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারে না তিনি তাহা টের পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দুষ্টদিগের কার্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অল্পদিনেই দুষ্টদিগের উপরি আয় বন্ধ হইয়া আসিল। বুভুক্ষিত আহার-নিরত হিংস্র পশুর মুখের গ্রাস সরাইলে তাহারা যেমন রুখিয়া উঠে, ভৃত্যগণ নুরল এসলামের প্রতি প্রথমতঃ সেইরূপ খড়গহস্ত হইল। শেষে তাঁহাকে জব্দ ও পদচ্যুত করিবার জন্য নানা ফন্দী পাকাইতে লাগিল। সেই সময় হইতে সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। কিন্তু গত তিন বৎসরের মধ্যে নীচাশয়দিগের বাসনা পূর্ণ হইল না। এদিকে বিশ্বস্ততা ও ব্যবসায়নৈপুণ্যে উত্তরোত্তর নুরল এসলামের পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ছয়মাস কাতর থাকায় রতীশবাবু তাঁহার স্থলে কার্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অফিসের সমস্ত চাকরের উপরি আয়ের পুনরায় বিশেষ সুবিধা হইল, এজন্যে তাহারা রতীশবাবুর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। ছয়মাস পরে রোগমুক্ত হইয়া নুরল এসলাম যখন পুনরায় কার্য গ্রহণ করিলেন, তখন অর্থ-পিশাচ ভৃত্যগণের মাথায় যেন আবার বজ্র পড়িল। তাহারা এখন হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় নুরল এসলামের ছিদ্রান্বেষণে ও অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাস আলীদিগের কারাগারে যাইবার কিছুদিন পর, একদিন রাত্রি ১১টার সময় স্থানীয় সাবরেজিষ্ট্রার সাহেবের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, নুরল এস্‌লাম নিজের বাসায় যাইতেছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, রতীশবাবুর বাসা, বন্দরের উপর রাস্তার ধারে। নুরল এস্‌লাম ঐ বাসার নিকটে আসিলে শুনিতে পাইলেন ৩।৪ জন লোক তথায় বসিয়া গল্প করিতেছে। একজন লোক কহিল, "রতীশবাবু, আজকাল পাওয়া-থোওয়া কেমন ?"

রতীশ। নেড়ে দাদা কাজে আসা অবধি পাওয়া-থোওয়া চুলোয় গেছে।

প্রথম ব্যক্তি। রতীশবাবু, আপনি যাই বলুন, আপনাদের বড়বাবু লোকটি বড় মন্দ নয়। আজকালকার বাজারে অমন খাঁটি লোক পাওয়া কঠিন। বেচারার কথা মিষ্ট ব্যবহার উত্তম, চরিত্র দেবতার ন্যায়।

রতীশ। (গরম মেজাজে বলিলেন) তুমি বুঝি বড়বাবুর ঘোড়ার ঘাসী ? নইলে অসতী স্ত্রীলোক লইয়া ঘর-সংসার করিতে যে ঘৃণা বোধ করে না, তুমি তাহারই গুণগান করিতে বসিয়াছ ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আপনি বলেন কি ? বড়বাবুর স্ত্রীর সতীপনায় গুণ্ডাগণের হাত হইতে এদেশ রক্ষা পাইয়াছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। আমরাও শুনিয়াছি, মোকদ্দমার ঘটনা শুনিয়া জজ সাহেবও তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

রতীশ। আব্বাস আলীর মত গুণ্ডার হাতে যে স্ত্রীলোক একবার পড়িয়াছে, তাহার যে সতীত্ব আছে, তাহা তুমি শপথ করিয়া বলিলেও বিশ্বাস করি না। স্বয়ং সীতাদেবী হইলেও না।

নুরল এসলামের খানাবাড়ীর প্রজা নবাব আলী ওরফে নবা নামক একটি লোক তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল, "মুনিবের বিবি বলিয়া বলিতে ভয় হয়, কিন্তু ছোটবাবু যাই বলেন, আমারও ত তাহাই মনে হয়।" নুরল এস্‌লাম ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। রতীশবাবুর শেষ উক্তি নুরল এস্‌লামের কর্ণ ভেদ করিয়া সবেগে এবং সজোরে তীরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবিদ্ধ হইল।

তিনি দম বন্ধ করিয়া বাসায় আসিলেন। হায়! বিনা মেঘে অশনিপাত হইল। নুরল এসলাম শয্যায় পড়িয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, কি শুনিলাম! ক্ষয়কাশে মৃত্যু হইলেও ত ভাল ছিল! তাহা হইলে এমন ঘৃণিত কথা আর শুনিতে হইত না।"

অপরিসীম যাতনায় তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। শয্যা কন্টক অপেক্ষাও তীক্ষ্ণবিদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলেন। প্রাতে শান্তিলাভ-বাসনায় ধীরে ধীরে মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। নামাজ অন্তে উর্ধ্ব-করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! যদি রোগে রক্ষা করিলে তবে দুর্ভোগ কেন? হৃদয়ে যে দাবানল জ্বলিতেছে; প্রভো! আর ত সহে না, তুমি অসহায়ের গতি, বিপন্নের বন্ধু, দুর্বলের বল, তুমি সর্বশান্তির আধার, অতএব দাসের হৃদয়ে শান্তি দান কর, কর্তব্য নির্ণয়ে বুদ্ধি দাও!"

নুরল এস্‌লাম এইরূপ নানাবিধ বিলাপের সহিত মোনাজাত শেষ করিয়া হাত নামাইলেন। তাঁহার হৃদয়-যাতনার অনেক উপশম হইল। তিনি বাসায় আসিয়া যথাসময়ে অফিসের কার্যে ব্রতী হইলেন, কিন্তু মন কি আর অফিসের কার্যে স্থির হয়! অল্প সময় মধ্যে তাঁহার মনের আবার ভাবান্তর জন্মিল; থাকিয়া থাকিয়া রতীশের মর্মঘাতী ঘৃণিত উক্তি তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া পত্নীর সতীত্ব-নাশ সন্দেহের অপবিত্র ছায়াপাতে তাঁহার পবিত্র হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমার ন্যায় অসুখী, আমার ন্যায় অভাগা বুঝি দুনিয়ায় আর নাই? ফলতঃ এইরূপ দুর্ভাবনার নিদারুণ নিষ্পেষণে তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে উন্মনা ভাব জন্মিল। উন্মনা ভাব হইতে ক্রমশঃ তাঁহার স্মৃতিশক্তির বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। সরকারী কার্যাদিতে ভুলভ্রান্তি, হিসাবপত্রে কাটকুট আরম্ভ হইল। তিনি মনে স্থিরতা-সম্পাদন জন্য মসজিদে যাইয়া পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাস শেষ হইতে আর বেশীদিন বাকী নাই। শনিবার, মাধ্যাহ্নিক রবি পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মের নিদারুণ অত্যাচারে সর্বংসহা পৃথিবী শাঁ শাঁ খাঁ খাঁ করিতেছে। জীবকুল যেন রোজ কেয়ামত স্মরণ করিয়া সভয়ে নীরব হইয়াছে। যে যাহার আবাসে পড়িয়া ঝিমাইতেছে। কেবল ২।৪টি অপান্ত বালক এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। আর আমাদের বড়বাবু ও ছোটবাবু অবিশ্রান্তভাবে মসী-লেখনীর সদ্ব্যবহার করিয়া কেরানী-জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বড়বাবুর চিত্ত নিদারুণ ঘটনাবশে বিভ্রান্ত, তথাপি তিনি কর্তব্যকার্যে যথাসাধ্য মনোযোগী। তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে রত ছোটবাবুও কার্য করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া জানালা-পথে বড়বাবুর কার্য দেখিতেছেন।

বেলা ২টার পর বড়বাবু নুরল এসলাম চিত্তের প্রসন্নতার জন্য মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। একঘন্টা পর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অফিসের সেদিনের অবশিষ্ট কার্য শেষ করিলেন। অনন্তর ৪টার সময় সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বাড়ী রওয়ানা হইলেন। কিন্তু হায়! বাড়ী-মুখে গমনোদ্যত তাঁহার প্রফুল্লচিত্ত ও উৎসাহী হস্ত-পদ আজ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বিষাদের বোঝা বুকে করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন।

তিনি বাড়ীর নিকটবর্তী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি এখন কেমন করিয়া সেই পতিপ্রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই কলুশিত অন্তর লইয়া তাহার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইব—হাসিয়া কথা কহিব? আমার হৃদয়ে যে কি দাবানল জ্বলিতেছে, সে-ত' তাহার কিছুই জানে না; হায়, সে যখন হাসিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিবে, আদর করিয়া কথা কহিবে, তখন আমি কি বলিয়া উত্তর দিব? কিরূপেই বা সরিয়া দাঁড়াইব? কেমন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিব? হায়। সে যে আমা বই আর কিছুই জানে না! আমাকে সে যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—সে যে আমার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন দানে

উন্মত্ত। অহো! তাহার ভালবাসায় আমার আর অধিকার নাই। আমি আর সে পুণ্যবতীকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। ঘৃণিত সন্দেহের ছায়া লইয়া সে সতী-রত্নকে ছলনা করিতে পারিব না। এইসব চিন্তা করিতে করিতে তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর দাসী নুরল এসলামকে বৈঠকখানায় বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আনোয়ারাকে যাইয়া সংবাদ দিল। শুনিয়া আনোয়ারা উৎকণ্ঠিতা হইল। ফুফু আম্মা দাসী দ্বারা ডাকাইয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে আনাইলেন। নুরল এসলাম বাড়ীর মধ্যে আসিলে ফুফু আম্মা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, অসুখ করিয়াছে কি?" নুরল 'জি' বলিয়া শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন। আনোয়ারা ফুফু-আম্মার অসাক্ষাতে ছুটিয়া ঘরে গেল। কিন্তু স্বামীর বিবর্ণ মুখ ও ভীষণ ভাবান্তর দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন হইয়াছেন কেন? মুখে যে কালির ছাপ পড়িয়াছে; কি অসুখ করিয়াছে?" নুরল এসলাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কোন উত্তর করিলেন না।

অন্যান্য দিন আনোয়ারা নিকটে যাইবামাত্র স্বামী তাঁহাকে প্রেম-সম্ভাষণে সাংসারিক নানাবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে অস্থির করিয়া তোলেন। আনোয়ারা উত্তর দিতে দিতে তাহার গায়ের পোষাক নিজ হস্তে খুলিয়া লয়, ব্যজনে শ্রান্তি দূর করে, অজুর জন্যে পানি দিয়া, নানাবিধ উপাদেয় নাস্তায় টেবিল পূর্ণ করে। নামাজ শেষ হইলে 'এটা খান, ওটা খান' বলিয়া নানাবিধ আব্দার করিতে থাকে।

কিন্তু হায়! আনোয়ারা আজ স্বামীর প্রেমময় আদর-সম্ভাষণ কিছুই পাইল না। নিরাশায় পতিপ্রাণার হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। রাত্রিতেও নুরল এসলাম স্ত্রীর সহিত বিশেষ কোন বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া হাহুতাশ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। আনোয়ারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পর সালেহা আনোয়ারার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, "ভাবী, আপনার মুখ মলিন কেন?" আনোয়ারা মনের বেদনা চাপিয়া, বাহিরে প্রফুল্লতা দেখাইবার চেষ্টা করিল। কহিল, "কই বুবু, মুখ মলিন হইবে কেন?" শারীরিক অসুখের ভানে অনাহারে আনোয়ারার দিন গেল, বৈকালে সালেহা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিল, সে অস্বীকার করিল। রাত্রি আসিল,

আনোয়ারা অনাহারেই ঘরে গেল। যথাসময়ে এশার নামাজ পড়িয়া স্বামীর পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। নুরল এসলাম নীরব। আনোয়ারা কহিল, "আপনি এত বিমনা হইয়াছেন কেন? দাসীর অজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে কোন দোষ হইয়া থাকিলে পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছি। কাল হইতে আমার কিভাবে দিন যাইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখুন। আপনার মলিন মুখ দেখিয়া কলিজা যে জ্বলিয়া খাক হইতেছে, দয়া করিয়া বলুন কি হইয়াছে। আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া সে স্বামীর প্রতি করুণ-নেত্রে চাহিয়া তাঁহার পা ধরিতে উদ্যত হইল। সেই একান্ত-নির্ভরপূর্ণ দৃষ্টিতে নুরল এসলামের মর্ম ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় পা সরাইয়া লইয়া আর্তস্বরে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না।" আনোয়ারা ভক্তির আবেগ-উত্তেজনায় কহিল, "কেন স্পর্শ করিব না? খোদার বন্দেগীর পর এই চরণযুগলই দাসী তাহার জীবন-ব্রতের সার সম্বল করিয়াছে। যদি আপরাধীনী হই, অন্য শাস্তি বিধান করুন, তথাপি চরণসেবায় বঞ্চিত করিবেন না।" এই বলিয়া আনোয়ারা স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নুরল করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি বুঝিতেছ না, আমার হৃদয়ে কি দারুণ অগ্নি জ্বলিতেছে।" স্বামীর কথা শুনিয়া সতীর প্রেম-প্রবণ হৃদয় আরও অস্থির হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার সুখ-শান্তি, আপনার দুঃখ-অশান্তির সমভাগিনী হইব, আপনার রোগ-শোক বুক পাতিয়া লইব বলিয়াই ত এজীবন ও-চরণে বিকাইয়াছি।

প্রজ্বলিত হুতাশনের উপর সুশীতল সলিল পতিত হইলে তাহা যেমন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আনোয়ারার প্রেমপূর্ণ সুমধুর বাক্যে নুরল এস্লামের অন্তরের জ্বালা সেইরূপ বাড়িয়া উঠিল। তিনি যন্ত্রণাতিশয্যে দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে আর কিছু বলিও না। আমাকে একাকী থাকিতে দাও।" এবার স্বামীর উক্তি শত বজ্রঘাত অপেক্ষাও সতীর কোমল হৃদয়ে আঘাত করিল। সে বুক চাপিয়া ধরিয়া অবসন্ন দেহে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। 'হায়! কি হইল,' ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নুরল এস্লাম স্ত্রীকে উপেক্ষার ভাব দেখাইলেন বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তার তুষানলে তিনিও ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'একদিকে সাধ্বী-

সতী, অপরদিকে লোকাপবাদ ; কোন্‌টি ত্যাজ্য ? কোন্‌টি উপেক্ষণীয় ? সরলা অবলা—অন্ধকার রাত্রি—সত্যই কি পাপিষ্ঠেরা তাহার ধর্মনাশ করিতে পারিয়াছে ?' স্মরণমাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ভাবান্তর ঘটিল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'যে ব্যক্তি জীবনদানসংকল্পে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, যাহার মত প্রেমময়ী, পতিপ্রাণা সতী দুনিয়ায় আছে বলিয়া জানি না, যাহার প্রতি কার্যে পতিহিতৈষিতার পরিচয় পাইতেছি, যাহার প্রতি নিঃশ্বাসে সতীত্বের তেজ ও সৌরভ অনুভব করিতেছি, পাপিষ্ঠেরা কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে। সতী-অঙ্গ কি কখনও কলঙ্কিত হইতে পারে ? শুধু কতিপয় নীচাশয় ব্যক্তির অলীক কথায় বিশ্বাস করিয়া পতিপরায়ণা সতী রমণীকে ত্যাগ করিব ? অহো কি নিষ্ঠুরতা! কি নীচাশয়তা !! ধর্মবিক্রয়ে কর্ম রক্ষা, দীন ছাড়িয়া দুনিয়া, না না, আমার দ্বারা তাহা হইবে না, শত কোটি অপমানের বোঝা অম্লানচিত্তে বহন করিব, তথাপি আমার সহ-ধর্মিনীকে ত্যাগ করিব না'—এইরূপ দুশ্চিন্তার তিনি ক্ষণকাল শান্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু হায়। এই সুখ-শান্তি অধিকক্ষণ হৃদয়ে স্থায়ী হইল না। রতীশের ঘৃণিত উক্তি আবার পিশাচমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্ত্রীর সম্বন্ধে অনুকূল সাধু মত সকল চৈত্রানিল-তড়িত তুলার ন্যায় উড়াইয়া দিল। তিনি শূন্যহৃদয়ে আবার ভাবিতে লাগিলেন. "লোকাপবাদ অমূলক হইলেও সামান্য নহে। হায়! আমি কেমন করিয়া লোকের মুখ বন্ধ করিব ? রাজদ্বারে, সমাজে, সভাস্থলে লোক যখন আমাকে অপহৃতা স্ত্রীর স্বামী বলিয়া ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিবে, হায়! তখন আমি কোথায় লুকাইব ? হায়! খোদা আমি জীবন্তে হত হইলাম।" এইরূপ মর্মান্তুদ বিলাপ-পরিতাপের ও এইরূপ মরণ-যন্ত্রণাধিক চিন্তা তরঙ্গের মধ্যে দিয়া নুরল এস্‌লামের রাত্রি প্রভাত হইল। এইসময় গ্রামিক মসজিদ হইতে প্রাভাতিক মধুর আযানধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল। নুরল এস্‌লাম মনের শান্তি নিমিত্ত নামাজ পড়িতে মস্‌জিদে চলিয়া গেলেন এবং বাড়ী না আসিয়া নামাজ অন্তে তথা হইতেই বেলগাঁও কার্যস্থলে গমন করিলেন। এদিকে আনোয়ারা অশ্রুপূর্ণনেত্রে রন্ধন-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব দিনের ন্যায় কিছুক্ষণ পর সালেহা তথায় আসিল। সে আনোয়ারার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাবী, কাল আপনার মুখ ভার দেখিয়াছি, আজ আবার আপনি কাঁদিতেছেন। নিশ্চয় ভাইজান আপনাকে তিরস্কার করিয়াছেন।"

আনোয়ারা চোখের পানি মুছিয়া কহিল, "বুবু, তিনি তিরস্কার করিলে পুরস্কার ভাবিয়া মাথায় লইতাম।" সালেহা কহিল, "তবে কি হইয়াছে?"

আনো। তিনি বাড়ী আসা অবধি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না। তাঁহার মুখের ভাবে অন্তরের নিঃশ্বাসে বোঝা যায়, কি যেন অব্যক্ত দারুণ দুঃখে তিনি নিষ্পেষিত হইয়াছেন।

সরলা সালেহা কহিল, "ভাবী ভাবী এক কথা শুনিয়াছি—"কথাটি বলিয়াই বালিকা চাপিয়া গেল। আনোয়ারার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কি কথা বুবু?" সালেহা ফাঁপড়ে পড়িয়া ইতস্তত: করিতে লাগিল। আনোয়ারা শুনিবার জন্য নাছোড় হইয়া পড়িল। সালেহা অগত্যা কহিল, "কাল নবার বউ আমাদের এখানে আসিয়াছিল; সে একটা খারাপ মিথ্যা কথা কহিল, আমি শুনিয়া তাহাকে তখনই তাড়াইয়া দিয়াছি।"

পূর্বেই বলিয়াছি, নবাব আলী ওরফে নবা নুরল এসলামের খানা-বাড়ীর প্রজা। সে বেলগাঁও বন্দরে গাঁট বাঁধাই-এর কর্ম করে। রতীশ বাবুর বাসার সন্নিকটে তাহার রাত্রি যাপনের আড্ডা। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বহু টাকা ব্যয় করিয়া নবাব আলী কথিত স্ত্রীর পানিগ্রহণ করিয়াছে। স্ত্রী ভরা যৌবনা এবং রূপসী। নবা তাহার চরণে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। বৃদ্ধা মাতার বর্তমানেও স্ত্রীই তাহার সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। সেদিন রাত্রিতে রতীশ বাবুর বাসায় যে সকল লোক নুরল এসলামের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে, তাহার মধ্যে নবা ছিল, এবং সে রতীশ বাবুর মতের পোষকতা করিয়া কথা বলিয়াছিল। পাঠক, একথা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

আনোয়ারা সালেহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বুবু, আমাকে যদি কথা খুলিয়া না বল, তবে আমি এখনই গলায় ফাঁস লাগাইব।" সরলা সালেহা ভয় পাইয়া তখন কহিল, "নবার বউ চুপে চুপে আমাকে বলিল, তার সোয়ামী তার নিকট বলিয়াছে, বন্দরে সকলে গাওয়া পেটা করে,—কোম্পানীর বড়বাবু অসতী স্ত্রী লইয়া ঘর-সংসার করে। তীব্র আশীবিষ দংশনে দষ্ট ব্যক্তি যেমন দেখিতে দেখিতে মুহূর্তে ঢলিয়া পড়ে, আনোয়ারা সালেহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে সেইরূপ রন্ধন আঙ্গিনায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। সালেহা অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ফুফু-আম্মা 'কি হইয়াছে' বলিয়া নিকটে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বউয়ের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস

ফেলিতেছে; ফুফু-আম্মা দুইদিন যাবত দেখিতেছেন, বউ অনাহারে রহিয়াছে সর্বদা চোখের পানি ফেলিতেছে; ছেলের মুখও বিষাদমাখা। ঘরে বুঝি কোন অকুশল ঘটিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া তিনি সালেহাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দাসী ফুফু-আম্মার আদেশে আনোয়ারাকে বাতাস করিতে লাগিল। সালেহা তাহার চোখে-মুখে পানি দিল। অনেকক্ষণ পরে আনোয়ারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অতঃপর ধীরে ধীরে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "খোদা তুমি না দয়াময়? তুমি না সুখ-শান্তির জনক? তবে তোমার এ বিধান কেন? অন্তর্যামীন প্রভো! দাসীর যাতনা চরমে উঠিয়াছে, আর সহিতে পারিতেছি না। মঙ্গলময়! এখন মৃত্যুই দাসীর পক্ষে শ্রেয়ঃ! অতএব প্রার্থনা, আর জীবিত রাখিয়া দগ্ধিয়া মারিও না, এককালে মৃত্যুপথে শান্তিদান কর। দুনিয়া আর চাই না।"

সালেহা ও ফুফু-আম্মার যত্ন, চেষ্টা এবং প্রবোধ বাক্যে আনোয়ারা দিনমানে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল এবং সইকে দুঃখের কথা জানাইয়া জেলার ঠিকানায় পত্র লিখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নুরল এস্‌লাম অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খরিদ পাটের মূল্যের জন্য ১০।১২ জন বেপারী অফিস-বারান্দায় বসিয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে টাকা দেওয়ার জন্য পকেট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি বাহির করিলেন। ঐ সঙ্গে একখানা পত্রও বাহির হইয়া পড়িল। পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, নুরল এসলাম সিন্দুক খুলিতে ক্যাশ-কামরায় প্রবেশ করিলেন। সিন্দুকের ডালা তুলিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শিরে অশনি-সম্পাৎ বোধ করিলেন, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কারণ, সিন্দুকে ছয় পেটি টাকার মধ্যে দুই পেটি মাত্র আছে; চার পেটি টাকা নাই। প্রথমে মনে করিলেন তিনি ভুল দেখিতেছেন; এই জন্য রুমালে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সিন্দুকের তলায় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন ভুল নির্ভুল বলিয়া বুঝিলেন। সিন্দুকে চারি পেটি টাকা নাই দেখিয়া দৌড়াইয়া টেবিলের নিকট আসিলেন, ক্যাশ-বুক বাহির করিলেন, হিসাবের খাতা মিলাইয়া দেখেন, খরচ বাদে বারো হাজার টাকা তহবিলে আছে। প্রত্যেক পেটিতে দুই হাজার করিয়া টাকা থাকে, সুতরাং ১২ হাজার টাকা থাকিবার কথা; কিন্তু দুই পেটি মাত্র টাকা মজুত আছে! চারি পেটিতে আট হাজার টাকাই নাই। সিন্দুকের চাবিও বরাবর তাঁহার নিকট। খুলিবার আগে সিন্দুকও বন্ধ পাইলেন। তবে এমন হইল কেন? টাকা কোথায় গেল? কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া নুরল এসলাম ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। বেপারীগণ কহিল, "বাবু, অমন করিতেছেন কেন? আমাদিগকে টাকা দেন।" নুরল এস্‌লাম অনেক ক্ষণ কথা কহিলেন না। পরে ধীরভাবে কহিলেন, "বাপু সকল, একটু থাম।" এই বলিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ জগতে ধর্মভীরু লোক পদে পদে পাপের ভয় করিয়া চলেন। অসম্ভব অচিন্ত্য-রূপে তহবিল তছরুপাতে ধর্মভীরু নুরল এস্‌লামের তখন মনে হইল, সতী সন্দেহ পাপে বুঝি এমন হইল। মনে করার সঙ্গে সঙ্গে কথাটি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। এই সময় টেবিলের উপরিস্থিত সেই পত্রখানির প্রতি তাঁহার

দৃষ্টি পড়িল। দেখিবামাত্র তিনি তাহা সমাদরে চুম্বন করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

পাঠক, বুঝিয়াছেন কি, এ পত্র কাহার? ইহা আনোয়ারার সেই সঞ্জীবনী ব্রতের চিরবিদায় লিপি। নুরল এসলাম নীরোগ হওয়ার পর দাসী একদিন বিছানাপত্র রেদ্রে দিবার সময় এই চিঠি খাটের নীচে পাইয়া নুরল এসলামের জামার পকেটে রাখিয়া দেয়, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পত্র পাঠে নুরল এসলাম একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া পড়িলেন। সতী-অনাদর পাপের ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয় সতীকে সন্দেহ করাতেই এই ভয়ানক সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। হায়, হায়, আমি কি ভীষণ দুষ্কার্য করিয়াছি! যে নারী নিজের প্রাণের বিনিময়ে, পতির প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, সে যদি কলঙ্কিনী, তবে এ জগতে আর সতী কাহাকে বলিব? আমি মূঢ় পাপাত্মা, তাই সতিত্বের মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি। তাই সতীকে চিনিতে পারি নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পর নুরল এসলাম আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, "শুধু অনুতাপে এ মহাপাপের শাস্তি প্রচুর নহে। তাই বুঝি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় এমন ভাবে তহবিল তছরুপাত হইয়াছে, অতএব আত্মরক্ষার আর চেষ্টা করিব না। পার্থিব নিরয়-নিবাসে লইয়াই সতী-অবজ্ঞা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

এই সময় নুরল এসলামের মানসিক অবস্থা ভীষণভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মগ্লানির অনিবার্য হুতাশনে তাঁহার সুরম্য হৃদয়োপবন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে; এবং সেই দাবাগ্নির প্রবর্দ্ধিত বহ্নিমুখশিখায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; আয়ত লোচন যুগল অস্বাভাবিকরূপে প্রদীপ্ত হইতেছে!

উপস্থিত বেপারিগণ নুরল এসলামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

অনন্তর নুরল এসলাম ক্যাশ-কোঠা বন্ধ করিয়া উত্তেজিতভাবে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোয় উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার সাহেব তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'নুরল, খবর কি?' ম্যানেজার সাহেব নুরলকে আন্তরিক বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন, তাই ঐ ভাবে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। নুরল এসলাম তহবিল তছরূপাতের কথা অসঙ্কোচ খুলিয়া বলিলেন। সাহেব, "বল কি!" বলিয়া দৌড়িয়া অফিস ঘরে আসিলেন। ক্যাশের

সিন্দুক পুনরায় খোলা হইল, টাকা গণিয়া দেখা গেল, ক্যাশবুক মিলান হইল, শেষে আট হাজার টাকাই তহবিলে কম পড়িল। সাহেব নুরল এসলামকে কহিলেন, "এখন তোমার বক্তব্য কি আছে?" উপস্থিত রতীশবাবু বিনা জিজ্ঞাসায় কহিলেন, "চোরে লইলে সমস্ত টাকাই লইত।" সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তবে তোমরাই টাকা চুরি করিয়াছ।" রতীশ বাবুর মুখ কলিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "হুজুর, চাবিত বড় বাবুর কাছেই থাকে। সাহেব কহিলেন, 'হু।' অনন্তর তিনি ক্যাশ-অফিসের প্রহরী ও অন্যান্য চাকর-বাকরদিগকে টাকা চুরি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন, তৎসঙ্গে জেরা প্রভৃতি করিলেন, নানাপ্রকার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলেন। অন্যান্য প্রকারে অনেক চেষ্টা হেকমত করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা বৈকালে তিনি কলিকাতা হেড অফিসে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলেন। উত্তর আসিল অপরাধীকে ফৌজদারীতে দাও এবং তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা তহবিল পূরণ কর।"

ম্যানেজার সাহেব নুরল এসলামকে যারপরনাই বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন এজন্য তিনি তাহাকে নিজের বাংলোয় ডাকিয়া লইয়া কলিকাতার টেলিগ্রাম দেখাইলেন।

অনন্তর সাহেব নুরল এসলামকে কহিলেন, "তুমি টাকা লইয়া কি করিয়াছ?"

নুরল। এরূপ কথা না বলিয়া আমাকে বধ করুন।

সাহেব। তবে টাকা কে চুরি করিয়াছে?

নুরল। বলিতে পারি না।

সাহেব। কাহাকেও সন্দেহ কর কি না?

নুরল। সন্দেহ করিয়া কি করিব? চাবি ত আমার কাছেই ছিল।

সাহেব আশ্চর্যভাবে নুরল এসলামের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, জ্বলন্ত সত্যতা ও সরলতার মধ্যে দিয়া এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব আসিয়া তাঁহার আনন্দিত মুখমণ্ডল পরিম্লান করিয়া ফেলিয়াছে।

সাহেব। শুনিতেছি, তোমার স্ত্রী ঘটিত মোকদ্দমার পর তুমি নাকি বড়ই উন্মনা হইয়াছ? কাজ-কর্মে ভুল-ভ্রান্তি করিতেছ, সুতরাং এমনও হইতে পারে, ক্যাশ বন্ধ করিয়া অসাবধানে চাবি স্থানান্তরে রাখিয়াছিলে, সেই সময় অন্যে চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া টাকা চুরি করিয়াছে।

নুরল। কিছুই বুঝিতেছি না।

সাহেব। হুতীশ, দাশু প্রভৃতি তোমার বিরুদ্ধে হিংসা পোষে ?

সুরল। বিশেষরূপে না জানিয়া তাদের প্রতি কিরূপে সন্দেহ করিব ?

সাহেব মনে মনে তাঁহার সাধুতায় আরও সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন "তবে তুমি এখন টাকার উপায় কি করিবে ?"

সুরল। আপনি আমায় ফৌজদারীতে সোপর্দ করিয়া অতঃপর যাহা ভাল বোধ হয় করুন।

সাহেব। তোমাকে যদি ফৌজদারীতে না দেই ?

সুরল। কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘনের জন্য ও টাকার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।

সাহেব। সেইজন্য বলিতেছি টাকা সংগ্রহের উপায় দেখ।

সুরল। হুজুর, টাকা কোথায় পাইব ? ছয় মাস কাতর থাকিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছি।

সাহেব। তোমার না তালুক আছে ?

সুরল। তালুকে আমার কোন স্বত্ব নাই।

সাহেব। সে কি কথা ?

সুরল। স্ত্রী ও ভগিনীদিগকে হেবা করিয়া দিয়াছি।

সাহেব। নবীন বয়সে এরূপ করিয়াছ কেন ?

সুরল। কাতর থাকাকালে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া।

সাহেব। সমস্ত সম্পত্তি হেবা করিয়াছ ?

সুরল। সমস্তই।

সাহেব। ডেপুটি গণেশবাহন বাবুর নিকট শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী নাকি তাঁহাদের সীতা-সাবিত্রীর মত সতী। তিনি কি তোমার এ বিপদে তাঁহার সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিবেন না ?

সুরল। করিলেও দানের বস্তু প্রতিগ্রহণ করিব না।

সাহেব। তবে কি করিবে ?

সুরল। জেলে যাইব।

সাহেব। জেলে যেতে এত সাধ কেন ?

সুরল। জেলে না গেলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না ! আমি মহাপাপী।

নুরল এসলাম কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সাহেব। টাকাও চুরি কর নাই, তবে কি পাপ করিয়াছ ?

নুরল এসলাম পকেট হইতে আনোয়ারার সেই পত্র বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিলেন এবং কহিলেন, "লোকাপবাদে—এমন স্ত্রীকে ভীষণভাবে অবজ্ঞা করিয়াছি।" সাহেব জনৈক পুণ্যশীল পাদ্রী সাহেবের পুত্র। নিজেও পরম সাধু। অদৃষ্ট-ফলে পাট-অফিসের ম্যানেজার হইয়াছেন। সুন্দর বাঙ্গালা জানেন। তিনি আগ্রহের সহিত পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পাঠ করিয়া সহর্ষে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আমাদের কথা দূরে থাক তোমাদের মধ্যেও অমন মেয়ে পাওয়া কঠিন। তুমি নবীন যুবক, সংসার চিন না ; তাই অমন রত্ন লাভ করিয়াও পায়ে ঠেলিয়াছ। লোকাপবাদ ত দূরের কথা তোমার স্ত্রীর সতীত্বগৌরবে নারীজাতির মুখোজ্জ্বল হইবে। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছ।" এই বলিয়া সদাশয় ম্যানেজার সাহেব নিজ রুমাল দিয়া নুরল এসলামের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। তারপর কহিলেন, "আমি সামান্য নয়শত টাকা বেতনে চাকরী করি। ছেলের পড়ার খরচের জন্য মাসে ৫০০্ শত টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অবশিষ্ট চারিশত টাকায় আমরা উভয়ে দুঃখে-কষ্টে সংসার চালাই ; সুতরাং তোমাকে এই বিপদে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিলাম না। এই পাঁচ কিতা নোট তোমাকে দিলাম, অবশিষ্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা-সংগ্রহ করিয়া তহবিল পূরণ কর। কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, আর তোমার চাকরী যাহাতে বজায় থাকে আমি তাহা করিব।

নুরল। তহবিল পূরণ করা আমার অসাধ্য। বাঁচিবার চেষ্টাও আর করিব না। সুতরাং অনর্থক আপনার টাকা লইয়া আমি কি করিব ?

সাহেব অনন্যোপায়ে বাধ্য হইয়া তখন থানায় সংবাদ দিলেন। দারোগা আসিলেন। মৌরসীভাবে তদন্ত চলিল, কিন্তু চুরির আস্কারা হইল না। নুরল এসলাম তহবিল তছরুপাতের আসামী হইয়া জেলায় চালান হইলেন। যাইবার সময় তিনি একখানা পত্র লিখিয়া স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য একটি বিশ্বস্ত লোকের হাতে দিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলাম জেলায় চালান হইবার পূর্বদিন বৈকালে, আমজাদ হোসেন সাহেব তাঁহার নির্জন লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিলেন; এমন সময় হামিদা একখানি পত্রহস্তে মলিনমুখে তাঁহার পাশে আসিয়া দাড়াইল। আমজাদ মুখ তুলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "একি! শরৎ-চন্দ্রমা রাহু-কবলিত যে?" হামিদা সে কথায় কান না দিয়া কহিল, "আমি আর তোমাকে ভালবাসিব না।"

আমজাদ। কেন গো, কি অপরাধ করিয়াছি?

এই সময়ে পাশের ঘরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। হামিদার একটি ছেলে হইয়াছে। হামিদা হাতের চিঠি স্বামীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছেলের উদ্দেশ্যে ছুটিল। আমজাদ পত্র লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের আরম্ভ এইরূপ লেখা ছিল:—

"সই, আমার সঞ্জীবনী-লতা তোলার কথা তোমাকে লিখিয়াছি। ঐ ঘটনা হইতে আমাদের লোকাপবাদ ঘটিয়াছে এবং ঐ লোকাপবাদ হইতে এ হতভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

এই পর্যন্ত পড়া হইলে হামিদা খোকাকে কোলে করিয়া পুনরায় তথায় আসিল।

আম। তোমার সই দেখিতেছি ক্রমে সীতা দেবী হইয়া উঠিলেন।

হামি। সেইজন্যই ত বলিতেছি, আমি আর তোমাকে ভালবাসিব না। সই-এর সঞ্জীবনী-লতা তোলার কথা মনে হইলে, এখনও আমার গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বামীর জন্য অমনভাবে আত্মত্যাগের কথা কোথাও শুনি নাই। আবার তারই ফলে এখন এই কাণ্ড?

আম। কাণ্ড, বিষম কাণ্ড!

হামি। সয়া কি সইকে ত্যাগ করিয়াছেন?

আম। সয়া বোধ হয় ত্যাগ করেন নাই। সই-ই হয়ত অভিমানে হাদিস উল্টাইয়া দিয়া থাকিবেন।

হামিদা। সে কেমন কথা?

আম। হাদিস অনুসারে স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু লোকাপবাদে স্বামী সংশ্রব ত্যাগ করা তোমার সইয়ের পক্ষে বিচিত্র নহে।

হামি। যে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, সে কি স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে?

আম। তা যাক; পত্রের ভাবে বুঝিতেছি উভয়ের মধ্যে খুব একটা মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছে; আমি ভাবিতেছি দোস্ত এখন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভুল-ভ্রান্তি করিয়া সরকারী কার্যে কোন বিভ্রাট না ঘটান। হাজার হাজার টাকা তাঁহার হাতে আমদানী-রপ্তানী হয়।

এই সময় আমজাদের বালক-ভৃত্য আসিয়া কহিল, "হুজুর সদর বাড়ীতে পিয়ন দাঁড়াইয়া।"

আম। চিঠি-পত্র থাকে'ত লইয়া আইস।

ভৃত্য। মনিঅর্ডার অনেক টাকার, আর লাল চিঠি একখানা।

আমজাদ শুনিয়া বাহির বাটীতে আসিলেন। পিয়ন সেলাম করিয়া একখানি ৫০০৲ টাকার টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার ফরম ও একখানি লাল চিঠি আমজাদের হাতে দিল। তিনি ফরম সহি করিয়া টাকা লইলেন। লাল চিঠিখানা সেইখানেই খুলিয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে,—"আমাদের আট হাজার টাকার তহবিল তছরুপের জন্য কোম্পানার আদেশানুসারে নুরল এসলামকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হইল। সে আত্মরক্ষায় রাজী নহে। শুনিয়াছি, আপনি তাহার অকৃত্রিম বন্ধু। ওখান হইতে তাহার রক্ষার জন্য যাহা করিতে হয় করিবেন। মোকদ্দমার সাহায্য বাবদ আমি নিজ হইতে তাহাকে ৫০০৲ টাকা দিলাম। আশা করি, মনিঅর্ডার ও চিঠির কথা আর কাহাকেও বলিবেন না।

সি, ডব্লিউ, স্মিথ,
জুট ম্যানেজার, বেলগাঁও।

বালক-ভৃত্য টাকাগুলি তোড়া করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া চলিল। আমজাদ লাল চিঠি হাতে করিয়া স্ত্রীকে যাইয়া কহিলেন, "হামি, যে কথা সেই কাজ। তোমার সয়া ত জেলে চলিলেন।"

হামি। ওমা! সে কি কথা?

আম। এই দেখ না, তাঁহার ম্যানেজার সাহেব 'তার' করিয়াছেন।

হামি। কি লিখিয়াছেন?

আম। আট হাজার টাকার তহবিল তছরুপাতে নুরলকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হইয়াছে।

হামি। তহবিল তছরুপ হইল কিরূপে?

আম। কিছুই বুঝিতেছি না।

হামি। ও টাকা কিসের?

আম। ইংরেজ জাতির মহত্বের নমুনা। ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং বাদী হইয়াও আসামীর সাহায্যের জন্য ৫০০্ টাকা পাঠাইয়াছেন।

হামি। (কাঁদ কাঁদ মুখে) তুমি সয়াকে বাঁচাও।

আম। তিনি যদি সত্যই টাকা চুরি করিয়া থাকেন, তবে বাঁচাইব কিরূপে?

হামি। সই একদিন আমাকে বলিয়াছিল, ফেরেশতাদিগের স্বভাব বদ হইতে পারে, তথাপি তোমার সয়ার চরিত্র মন্দ হইতে পারে না।

আম। আমি ত তাহাকে দেব চরিত্র বলিয়াই জানি। তবে তিনি যুবক, যুবকের মতিগতি কখন কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় বলা যায় না।

হামি। (ভ্রূকুটি করিয়া) তুমি বুঝি এখন বুড়া হইয়াছ, না?

আম। বাকী বড় বেশী নাই।

হামি। দরবেশী কথা রাখ; আমার সয়াকে রক্ষা করিবে কি না তাহাই বল।

আম। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

হামি। শুনিয়াছি, বড় বড় সঙ্গীন মোকদ্দমায় বড় বড় আসামীকে রক্ষা করিয়াছ। তোমার পায়ে পড়ি, যেরূপে পার আমার সয়াকে বাঁচাইবে। আমি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি, এ সংবাদ পাইয়া সই আত্মঘাতিনী না হয়।

আম। তিনি যদি সংশ্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আর মরিবেন কার জন্য।

হামি। পতিব্রতার হৃদয় বুঝিতে এখনও তোমার ঢের বাকী।

নুরল এসলামের আসন্ন বিপদে আমজাদ হোসেন একান্ত দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর কথার কোন উত্তর না করিয়া বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

নুরল ইসলাম তহবিল তছরুপাতের আসামী হইয়া হাজত-ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমজাদ যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন। তিনি উদীয়মান ক্ষমতাশালী গভর্ণমেণ্ট উকিল, অল্প সময়ের মধ্যে জেলার উপর পাকা বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নুরল এসলামের জামিন মঞ্জুরে অনেক ওজর-আপত্তি করিলেন। কিন্তু আমজাদ নাছোড়বান্দা। তিনি অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া দশ হাজার টাকার জামিন মঞ্জুর করাইয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নুরল এসলাম-কে আর চেনা যায় না, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মুখে কালির ছাপ পড়িয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, শরীর কৃশ ও দুর্বল হইয়াছে, দেখিয়া আমজাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্লেশপূর্ণ স্বরে নুরল এসলামকে কহিলেন, "বাহির হইয়া আইস। তোমাকে জামিনে মুক্তি করিয়াছি।" নুরল এসলাম আমজাদকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমজাদ কহিলেন, "এখন আইস, কাঁদিয়া ফল কি?" আমজাদের চক্ষু দিয়াও অশ্রু গড়াইতে লাগিল। নুরল এসলাম কহিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, এখানে বেশ আছি, তুমি আমার জন্য এত করিতেছ কেন?"

আমজাদ। তাহা পরে হইবে, এখন ত আইস। এই বলিয়া হাত ধরিয়া হাজত গৃহ হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর গাড়ীতে তুলিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। হামিদা ছুটিয়া আসিয়া পরদার অন্তরাল হতেই সয়াকে দেখিল। দেখিয়া সেও অঁাচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

অনেক সাধাসাধি করিয়া রাত্রিতে নুরল এসলামকে আহার করান হইল। আহারান্তে আমজাদ তাঁহাকে লইয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন।

আমজাদ। তহবিল তছরুপ কিরূপে হইল?

নুরল। পাপের ফলে।

আম। কি পাপ করিয়াছ?

নুরল। সতীকে অবজ্ঞা করিয়াছি। এই বলিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন

করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত জেলে যাইব স্থির করিয়াছি।"

আম। তাহাতে কতকটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রকাশ পাইবে। আমার বিবেচনায়, প্রকৃত পাপিকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া এবং সতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা শ্রেয়ঃ।

মুরল। মহাপাপী সাধারণ পাপীকে ধরিতে সমর্থ নয়।

আম। তবে কি করিবে?

মুরল। কারাগারে যাইব।

আমজাদ দেখিলেন সতী-অবজ্ঞায় তহবিল তছরুপ হইয়াছে মনে করিয়া বন্ধুর হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়াছে; জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে। ফলতঃ ঘটনা যাহাই হউক, ফল ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখন তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে কেবল নিজ চেষ্টায় সব করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া আমজাদ কহিলেন "স্থানীয় পুলিশ কোন তদন্ত করেন নাই?"

মুরল। আমার বাসাবাড়ী, সেকেণ্ড ক্লার্ক রতীশ বাবুর ও অন্যান্য চাকর-দিগের আড্ডা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ কিছু পায় নাই।

আম। রতীশ বাবু লোক কেমন?

মুরল। তিনি বেশ্যাসক্ত, বন্দরে তাহার এক রক্ষিতা আছে। উপার্জিত সমস্ত অর্থ তাহাকেই দেন। আমার ভয়ে উৎকোচ লইতে পারেন না বলিয়া তিনি আমার পরম শত্রু। দাগু প্রভৃতি চাকরেরাও এই কারণে আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ।

শুনিয়া আমজাদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার কহিলেন, ক্যাশাদি কাহার জিম্মায় থাকিত?"

মুরল। আমার জিম্মায়।

আম। চাবি?

মুরল। আমার নিকট।

আমজাদ কি যেন ভাবিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ লইয়া, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টার সঙ্গে করিয়া আমজাদ বেলগাঁও চলিয়া গেলেন। পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। জুট-অফিসের আমলা চাকরদিগের প্রত্যেকের বাসাবাড়ী, আড্ডা

প্রভৃতি স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। অনেককে অনেক প্রকার প্রশ্ন করা হইল। এই কার্যেই দুই দিন গেল। তৃতীয় দিন অফিসের পুষ্করিণীতে জাল ফেলা হইল। ফলে কিছু মাছ পাওয়া গেল, আর কিছুই মিলিল না তৎপর পুষ্করিণীতে লোক নামাইয়া দিয়া দলামলা হইল হাঁড়ি-পাতিল কিছু উঠিল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আশাপূর্ণ অন্তরে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখিলেন কিন্তু সব শূন্য। ঐ তিন দিন গুপ্তানুসন্ধানও চলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পুলিশ হতাশ হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলাম জেলায় চালান হইবার সময় স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়া যা'ন, তাহা যথাসময়ে আনোয়ারার হস্তগত হইল। ঐ সময়ে সে জোহরের নামাজ পড়িয়া নিজের দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। স্বামীর হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র দেখিয়া তাহার হৃদয়ে তুফান ছুটিল। সে কম্পিত হস্তে পত্রখানি চুম্বন করিয়া তাজিমের সহিত মাথায় রাখিল, তাহার পরে চক্ষে স্পর্শ করাইয়া বুকে ছোঁয়াইল, তৎপরে খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায়! পাঠান্তে—'খোদা, তুমি কি করিলে? এই বলিয়া জায়নামাজের উপরই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সালেহা পূর্বে লেখা-পড়া জানিত না। আনোয়ারার শিক্ষা-দীক্ষায় সে এখন কোরান শরিফ ও বাঙ্গালা পুস্তকাদি পড়িতে পারে। তাহার দেখাদেখি, পাড়ার আরও ৫।৬টি মেয়ে আনোয়ারার কাছে পড়াশুনা করে। সালেহা পড়া বলিয়া লইতে এই সময় ঘরে আসিয়া দেখিল, আনোয়ারা জায়নামাজের উপর শুইয়া আছে। সালেহা প্রথমে 'ভাবী' বলিয়া ২।৩ বার ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না; পরে জোরে গায়ে ধাক্কা দিল, তথাপি সাড়াশব্দ নাই; পরে এপাশওপাশ করিয়া দেখিল, যেদিকে কাৎকরে সেই দিকেই থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া বালিকা সভয়ে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ফুফু-আম্মা, ভাবী মরিয়া গিয়াছে।" ফুফু-আম্মা শুনিয়া দৌড়িয়া অসিলেন। প্রতিবাসী অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিল, আনোয়ারার কয়েকটি ছাত্রীও আসিল। ফুফু বউ-এর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা ঠাণ্ডা; নাকে হাত দিলেন, নিঃশ্বাস চলে না, মুখের ভিতর হাত দিয়া দেখিলেন দাঁতে দাঁতে দৃঢ়রূপে লাগিয়া গিয়াছে। ফুফু-আম্মা'ও তখন বৌ মরিয়া গিয়াছে বলিয়া হায়, হায়, করিতে লাগিলেন। উপস্থিত একজন প্রবীণা প্রতিবাসী স্ত্রীলোক কহিলেন, "আপনারা এত অস্থির হইবেন না, দাঁত লাগিয়াছে, মাথায় পানির ধারাণী দিউন।,, তাঁহার কথামত কার্য চলিল, কিন্তু কি নিমিত্ত বৌ-এর এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। পরে সেই প্রবীণা স্ত্রীলোকটি এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, "বিবি সাহেবার পাশে চিঠির মত ওখানা কি পাড়য়া রহিয়াছে?" কুলসম নামে একটি বুদ্ধিমতী ছাত্রী চিঠিখানি

তুলিয়া লইল এবং খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল,—

"প্রাণাধিকে—

তুমি ফেরেশ্‌তাদিগের পূজনীয়। আমি নরাধম, তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই। পরন্তু লোকাপবাদে উন্মনা হইয়া তোমার পবিত্র হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়াছি, সেই মহাপাপে আজ কারাগারে চলিলাম। সরকারী তহবিল হইতে আট হাজার টাকা কিরূপে খোয়া গিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোম্পানীর আদেশে আমি দায়ী হইয়া ফৌজদারিতে সোপর্দ হইয়া জেলায় চলিলাম। হায়! তোমার স্বর্গীয় বিমল মূর্তি আর দেখিতে পাইলাম না, ইহাই দুঃখ রহিল। কারাগারে যাইয়া আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা নাই। অন্তিম অনুরোধ, শুধু শরিয়তের নহে, ধর্মবিধি—প্রাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, নরাধমের জীবিতকাল পর্যন্ত তাহাকে পতি বলিয়া মনে রাখিও। ইতি—

তোমারই হতভাগ্য
নুরল এসলাম

পত্র পাঠ করিয়া কুলসম কহিল, "অজ্ঞানই হবারই কথা।" ফুফু-আম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রে কি লেখা আছে, মা?" কুলসম কারাগারে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া কহিল, "দেওয়ান সাহেব সরকারী টাকা-পয়সার গোলমালে পড়িয়াছেন।" শুনিয়া ফুফু-আম্মা আরও উতলা হইলেন।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর আনোয়ারার চৈতন্য হইল। সে জোর করিয়া উঠিয়া বসিতেই 'উহ বলিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পুনরায় সেবা-শুশ্রূষা চলিল। ধীরে ধীরে আনোয়ারা আবার চেতনা লাভ করিল। ফুফু-আম্মা হৃদয়ের ব্যাকুল-ভাব চাপিয়া বউকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, "টাকা-পয়সার একটু গোলমাল হইয়াছে, তাহাতেই তুমি এত অস্থির হইয়াছ?" আনোয়ারা কহিল, "না, তিনি যে জেলে—বলিয়াই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ফুফু-আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আনোয়ারার বারংবার মূর্ছা ও ফুফুর-কান্না কাটিতে দিবা অবসান হইল, রাত্রি আসিল। অতিকষ্টে রাত্রিও প্রভাত হইল। আনোয়ারা বুকে গুরুতর বেদনা লইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। ফুফু টোট্‌কা ঔষধের প্রলেপ তাহার বুকে দিয়া কহিলেন, "তুমি অত উতলা না হইয়া ছেলের রক্ষার জন্য মধুপুরে ও জেলার ঠিকানায় পত্র লিখ।"

আনোয়ারা যেন কি ভাবিয়া আর সইকে পত্র লিখিল না। উপস্থিত বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া মধুপুরে তাহার দাদিমাকে পত্র লিখিল। বৃদ্ধা হামিদার পিতাকে সঙ্গে দিয়া—আনোয়ারার পিতাকে টাকাকড়িসহ রতনদিয়ায় পাঠাইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। বাদী ম্যানেজার সাহেবের কথা, আসামী চরিত্রবান বলিয়া প্রমাণিত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত ঘটনায় তিনি যে নির্দোষ তাহা সাব্যস্ত হইল না। রতীশ বাবু ও দাশু সাক্ষ্য দিল "নুরল এসলাম দীর্ঘদিন পীড়িত থাকিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; তারপর কার্যে পুনরায় উপস্থিত হন। ক্যাশ সিন্দুকের চাবি সর্বদা তাহার কাছে থাকিত।" দার-ওয়ান জগন্নাথ মিশ্র সাক্ষ্য দিল, "টাকা চুরির আগে বড়বাবু বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলিতেন আর থাকিয়া থাকিয়া রাম রাম বলিতেন।" তার কথায় আদালতের লোক হাসিয়া উঠিল। উকিল সাহেব দোস্তের দোষহীনতা প্রমাণের নিমিত্ত জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। ফলে, ম্যাজিষ্ট্রেট নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া নুরল এসলামের প্রতি ১৮ মাসের কারাদণ্ডের বিধান করিলেন। হুকুম শুনিয়া তালুকদার ও ভূঞা সাহেব পরিশুষ্ক মুখে ও উকিল সাহেব চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিলেন। বিচারের দিন তালুকদার ও ভূঞা সাহেব কোর্টে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন হামিদা অনাহারে কাটাইয়াছে। প্রাণের খোকাকে লইয়া তাহার হাসিখুশী সেদিন বন্ধ ছিল, তালুকদার সাহেব বিমর্ষ-চিত্তে অন্দরে প্রবেশ করিলে হামিদা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজান, সয়া কি মুক্তি পাইয়াছেন?"

তালু। না মা, তাহার ১৮ মাসের জেল হইয়াছে।

হামিদার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

তালু। মা, তুমি দেখছি আনোয়ারার মত হইলে।

হামিদা আরও অস্থিরচিত্তে কহিল, "বাবজান, তার কি হইয়াছে?

তালু। রতনদিয়ায় আসিয়া শুনিলাম, দুলামিঞা হাজতে আসিবার দিনই তাহাকে চিঠি লিখিয়া আসিয়াছে—আমি জেলে চলিলাম, তখন তাকে লইয়াই

কান্নাকাটি। রাত্রে ৪।৫ বার মূর্চ্ছা যায়। প্রাতে বুকে বেদনা ধরিয়া শয্যাগত হইয়াছে।

হামিদা। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! এমন গজবও কি মানুষের উপর হয়।

তালু। মা, সকলই অদৃষ্টের ফল। তবে বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করাই মনুষ্যত্ব।

হামিদা। বাবাজান, এমন বিপদেও কি ধৈর্য থাকে?

তালু। মা, কারবালার বিপদে হজরত হোসেন-পরিবার খোদাতায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্যবলে মর-মহীতে অমর হইয়া গিয়াছেন।

হামিদা পিতার উপদেশে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, তাহাদের আহারের আয়োজনে চলিয়া গেল।

পরদিন তালুকদার ও ভূঞা সাহেব তরনদিয়া হইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। ভূঞা সাহেব জামাতার সাহায্যের নিমিত্ত বাড়ী হইতে যে সাড়ে চারিশত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার মধ্য হইতে মাত্র ১০টি টাকা আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন।

তাঁহারা বাড়ী পৌঁছিলে সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে বসিলেন। এদিকে বুকের বেদনা বাড়িয়া আনোয়ারা একেবারে শয্যাশায়িনী হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

নুরল এসলাম কারাগারে যাইবার পর, কোম্পানীর টাকা আদায়ের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে একজন কর্মচারী বেলগাঁও আসিলেন। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে বলিলেন, "আসামীর সম্পত্তি যাহা ছিল, সে তাহা পূর্বেই ভগিনী ও স্ত্রীকে দান করিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার নিকট টাকা আদায় অসম্ভব। এখন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহা হয়।" কিন্তু রতীশ বাবু পূর্বকথিত নবার নিকট শুনিয়া স্থানীয় রেজেষ্টারী অফিসে খোজ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—নুরল এসলাম দানপত্র রেজেষ্টারী করিয়া দেন নাই। তিনি কলিকাতার কর্মচারীকে গোপনে বলিলেন, "আসামীর দানপত্র এ পর্যন্ত রেজেষ্টারী হয় নাই, সুতরাং এখন সে সম্পত্তি আসামীর বলিয়া নালিশ করিতে পারেন।" কর্মচারী ম্যানেজার সাহেবের নিকট, আসামীর নামে সেই সূত্রে নালিশের প্রস্তাব করেন। উকিল সাহেব তাহা অবগত হইয়া রতনদিয়ায় পত্র লেখেন।

উকিল সাহেবের পত্র পাইয়া শয্যাশায়িনী আনোয়ারা বুকের ব্যাথা বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিল। সকলে মনে করিল, বউ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

আনোয়ারা সংক্ষেপে তাহার দাদিমাকে পত্র লিখিল,—

"তোমরা সকলে আমার সালাম জানিবে। বাবাজান আমাদের বিপদে এখানে আসিয়া মাত্র দশটি টাকা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কোম্পানী আমাদের তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি নিজ হইতে তিনশত, বাবাজান তিনশত, আমার পুঁজি টাকা চারি শত এবং কয়েকখানি শাড়ী ও তোমার প্রদত্ত আমার সমস্ত গহনা বিলম্ব না করিয়া পাঠাইবে। যদি ঐ সকল পাঠাইতে ইতস্ততঃ বা বিলম্ব কর, তবে আমাকে আর জন্মের মত দেখিতে পাইবে না।" ইতি—

তোমার সোহাগের—
আনোয়ারা

স্নেহপরায়ণা বৃদ্ধা পৌত্রীর আত্মহত্যার আশঙ্কা করিয়া অগৌণে বস্ত্রালঙ্কার

ও নগদ টাকা পাঠাইলেন। মাত্র ১০টি টাকা মেয়েকে দিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিনশত টাকা লইয়া তাহাও এই সঙ্গে পাঠাইলেন। আনোয়ারা যথাসময়ে টাকা, অলঙ্কার ও বস্ত্র পাইল।

এদিকে আনোয়ারা উকিল সাহেবকে রতনদিয়ায় আসিতে সই-এর নিকট পত্র লিখিল। উকিল সাহেবও যথাসময়ে রতনদিয়ায় আসিলেন। দিনমানে তিনি দোস্তের সংসারের সিজিল মিছিল করিলেন। রাত্রিতে কোম্পানীর দেনা শোধের কথা তুলিলেন। সরলা ফুফু-আম্মা কহিলেন, "বাবা তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।" উকিল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "টাকা ২।৩ হাজার নয়, আট হাজার! তালুক বিক্রয় ছাড়া উপায় দেখিতেছি না।" আনোয়ারা ফুফু-শাশুড়ীর নিকট ঘরের ভিতরে বসিয়াছিল, সে ছোট করিয়া ফুফু-শাশুড়ীকে কহিল "তা কেন, আমার নিকট হাজার টাকা ও আমার এগার শত টাকার গহনা আছে। তাঁর (স্বামীর) পীড়ার সময় সই আমাকে একশত টাকা দিয়াছিল, তাহাও মজুত আছে। এই সব দিয়া কোম্পানীর টাকা মিটাইতে বলেন।"

ফুফু বউ-এর সমস্ত কথা উকিল সাহেবকে শুনাইলেন। উকিল সাহেব শুনিয়া বালিকার পতিপরায়ণতায় মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। মুখে কহিলেন, "আট হাজার টাকার দেনা এতে মিটিবে না।"

নুরল এসলাম কারাগারে যাইবার সময় আনোয়ারাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, "অন্তিম অনুরোধ, শুধু শরিয়তের নহে, প্রাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, নরাধমকে পতি বলিয়া মনে রাখিবে।" আনোয়ারার সেই কথা এখন হৃদয়ে উজ্জলভাবে জাগিয়া উঠিল এবং উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পতির সম্প'ত্ত রক্ষা করা সে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম মনে করিল। তাই সে বিবাহের সময় স্বামীদত্ত যে নয়শত টাকার অলঙ্কার পাইয়াছিল, তাহাও এই ঋণ শোধার্থে দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া ফুফু-শাশুড়ীকে কহিল, "আপনারা যে আমাকে নয়শত টাকার গহনা দিয়াছিলেন, তাহাও পোটম্যানে তোলা আছে। ওগুলিও সয়া সাহেবকে দেওয়া যাক।" ফুফু সে কথাও উকিল সাহেবকে জানাইলেন। উকিল সাহেব মনে করিয়াছিলেন পূর্বে যে এগার শত টাকর গহনা দেওয়ার কথা হইল, তাহাই দোস্ত সাহেবের প্রদত্ত। এক্ষণে আরও নয়শত টাকার গহনার কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ইতঃপূর্বে যে এগারশত টাকার অলঙ্কারের কথা বলিলেন

তাহা কাহার"? ফুফু-আম্মা কহিলেন, "ওগুলি বউমার দাদিমা দিয়াছিলেন।" উকিল সাহেব শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, "সতী, তুমিই ধন্য! তুমিই পতিব্রতা-দিগের আদর্শস্থানীয়া।"

উকিল সাহেব তখন হিন্দুদিগের বিশ্বামিত্র-প্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "নগদে ও গহনায় তিন হাজার এক শত হইতেছে, বাকী চারি হাজার নয়শত টাকা। তার উপায় কি?" আনোয়ারা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ফুফু-আম্মাকে কহিল, "আমার হাতে এখন ৬০ টাকার অঙ্গুরী আছে। পরিধানে ৫।৬ শত টাকার শাড়ী আছে, ইহাও দেওয়া যাক।" ফুফু-আম্মা কহিলেন "বউ মা তুমি কঁাদিও না; শাড়ী দেওয়ার আবশ্যক নাই। ছেলের শোকে আমি পাগল হইয়াছি, তাই মনে ছিল না; আমাদের বিপদের কথা শুনিয়া রশিদা নিজ হাইতে দুইশত ও তাহার সোয়ামী একশত টাকা দিয়াছিল, সেই তিনশত টাকা আমার কাছে আছে। কাল ছেলেকে শাড়ীর বদলে তাহাই দেওয়া যাইবে।" এইবার উকিল সাহেবের পরীক্ষা শেষ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনারা কান্নাকাটি করিবেন না, আপনাদের পাঁচশত টাকা আমার নিকট মজুত আছে। দোস্ত সাহেবের ম্যানেজার সাহেব তাঁহার মোকদ্দমার সাহায্যের জন্য আমার হাতে দিয়াছিলেন, তাহাও এই দেনায় শোধ দিন।" এই বলিয়া তিনি পাঁচ কিত্তা নোট ফুফু-আম্মার হাতে দিলেন।

রাত্রি প্রভাতে ফুফু-আম্মা—

নিজের নিকট মজুত	...	...	৩০০৲
উকিল সাহেবের প্রদত্ত নোট	...	...	৫০০৲
আনোয়ারার সয়ের প্রদত্ত	...	...	১০০৲
আনোয়ারার পিত্রালয় হইতে আনীত	...	...	১০০০৲
আনোয়ারার দাদিমার প্রদত্ত গহনা	...	...	১১০০৲
আনোয়ারার স্বামী প্রদত্ত গহনা	...	...	৯০০৲
আনোয়ারার আংটী	...	...	৬০৲
			মোট—৩,৯৬০৲

মোট উনচল্লিশ শত ষাইট টাকা নগদে-গহনায় দেনা শোধের জন্য উকিল সাহেবের হাতে দিলেন। তিনি ঐ সকল লইয়া যথাসময়ে বাসায় আসিলেন।

উকিল সাহেব বাসায় পৌঁছিলে হামিদা কহিল, "এত টাকা ও গহণা কোথায় পাইলে?"

উকিল। পতির ঋণ-মুক্তির জন্য তোমার সই যথাসর্বস্ব আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন।

হামিদা। তাই ত' দেখিতেছি, আমার প্রদত্ত আংটিটি পর্যন্ত দিয়াছে। ধন্য পতিব্রতা? এমন সতী সই হইয়া, নারী জন্ম সুন্দর ও সার্থক মনে হইতেছে।

উকিল। এতে সতীর উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা তাহাই ভাবিতেছি।

হামিদা। আর কত হইলে দেনা শোধ করিতে পারিবে?

উকিল। কমপক্ষে মোট সাড়ে চারিহাজার টাকা হইলে কথা বলা যায়।

হামিদা। তাহার নাজাই কত?

উকিল। আর ৫৪০ ্হইলে সাড়ে চারিহাজার হয়।

হামিদা। তুমি ৩০০ ্দেও, আমি নিজ হইতে ২৪০ ্দেই।

উকিল। তোমার নিজ তহবিলে খুব টাকা জমিয়াছে নাকি?

হামিদা। জমিয়াছে বৈকী?

উকিল। কোথায় পাইলে?

হামিদা। আমি খোকার মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে ৩০০ ্টাকা জমাইয়াছি। তোমার অনুমতি হইলে তাহা হইতে দিতে চাই।

উকিল। তোমার হৃদয়ের মহত্ব দেখিয়া সুখী হইলাম।

অতঃপর জুট ম্যানেজারের সহিত অনেক লেখালেখি হওয়ার পর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে চারিহাজার টাকায় কোম্পানীর টাকা শোধ সাব্যস্ত হইল। বন্ধুর তালুক ও বন্ধু-পত্নীর গাত্রালঙ্কার যাহাতে পরভোগ্য না হয়, তজ্জন্য উকিল সাহেব নিজ নামে হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া এবং বক্রী নাজাই নিজ হইতে দিয়া কোম্পানীর রকার টাকা শোধ করিলেন। স্ত্রীকে হ্যাণ্ডনোটের কথা জানাইয়া কহিলেন, "অলঙ্কারগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখ, সময়ে ফেরৎ দেওয়া যাইবে।" হামিদা আহ্লাদে গহনাগুলি নিজ বাক্সে পুরিল।

জুট কোম্পানীর টাকা শোধের পর, একদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া ফুফু-আম্মা আনোয়ারাকে কহিলেন, "বউ মা, এখন উপায় কি ?" আনোয়ারা শোক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কিসের উপায়ের কথা বলিতেছেন, আম্মাজান ?" ফুফু কহিলেন, "টাকা পয়সা সব গেল, আশ্বিন মাস না আসিলে তালুকের খাজনাপত্র পাওয়া যাইবে না। খুসীর কাপড় নাই। সে তাহার জন্য বায়না ধরিয়াছে। কাল বাদে হাট, তাহারই বা উপায় কি ? আনোয়ারা পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,, "সব যাইয়া যদি,—" আর বলিতে পারিল না। তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। চোখের পানিতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে আনোয়ারা ফজরের নামাজ পড়িয়া ট্রাঙ্ক হইতে নিজের একখানি এক ধোপের লালপেড়ে ধুতি খুসীকে ডাকিয়া পড়িতে দিল। খুসী কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া বউ-বিবিকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

বিকাল বেলায় নবার বৌ এই বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। এই নবার বউই প্রথমে সালেহার নিকট আনোয়ারার লোকাপবাদের কথা বলিয়া যায়। এজন্য আনোয়ারা তাহাকে দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিল, শেষে আত্মসম্বরণ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া ঘরে লইল। নবার বৌ ঘরে আসিলে আনোয়ারা পোর্টম্যান খুলিয়া একখানি রেশমের উপর পদ্মফুল তোলা নিলাম্বরী শাড়ি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "তোমার সোয়ামীকে দিয়া শাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া দিবে ?"

নবার বৌ সহৃদয়তা জানাইয়া কহিল, "আপনারা বড়লোক, শাড়ী বেচবেন ক্যান ?"

আনো। আমাদের টাকা পয়সার খুব টানাটানি হইয়াছে।

নবার বৌ। এ্যার দাম কত ?

আনো। নয় টাকা ; এখন সাত টাকা হইলেই দিব।

নবার বৌ। পোর্টম্যানের দিকে চাহিয়া কহিল, "ঐ যে হোনার ল্যাগাল জল্‌তিছে ওহান কি হাড়ী ?"

আনো। হাঁ, ওর দাম বেশী।

নবার বৌ। কত?

আনো। পনরকুড়ি টাকা।

নবার বৌ। ওহান বেচবেন না?

আনো। খরিদ্দার পাইলে বিক্রয় করিব।

নবার বৌ। দাম কত চান?

আনো। এখন অর্দ্ধেক দামে দিব।

নবার বৌ। খুইল্যা দেহান ত?

আনোয়ারা শাড়ী খুলিয়া দেখাইল। কিছু দিন ব্যবহার হইলেও বিচিত্র বেনারসী শাড়ী দেখিয়া নবার বৌ-এর চোখ ঝলসিয়া গেল। সে শাড়ীর জন্য উম্মত্তা হইয়া উঠিল। কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় কহিল, "আজ থাক, কাইল লইয়া যামু।" নবার বৌ চলিয়া গেল।

রাত্রিতে নবা বেলগাঁও হইতে বাড়ী আসিল। নবার বৌ পূর্বেই তাহাকে শাড়ীর ফরমাস দিয়াছিল। বাড়ী আসিবামাত্র বউ নবাকে কহিল, "আমার হাড়ী কই?

নবা কহিল, "রতীশ বাবু কলকাতা থাইকা আইলেই হাড়ী পাইবা।"

নবার বৌ মুখ ভার করিয়া রাত্রিতে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল না। নবা অনেক সাধ্য-সাধনা করিলে বৌ শেষে অভিমানের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমাকে বুঝি বিশ্বাস পাও না? ছোরাণী হুড্যা আমার কাছে দেওনা ক্যান?" নবপ্রেমে আত্মহারা নবা তখন বউ-এর আচলে চাবি ছুইটা বাঁধিয়া দিয়া কহিল, "এই নাও ছোরাণী। হুশিয়ার হয়া রাখবা।

প্রাতে নবা বন্দরে গেল। নবার বাক্স খুলিয়া শাড়ীর অর্দ্ধেক মূল্য সাড়ে সাতকুড়ির স্থলে আটকুড়ি আর সাত টাকা লইয়া শাড়ী কিনিতে চলিল।

আনোয়ারা তখন কোরান পাঠ করিতেছিল।

নবার বৌ টাকাগুলি তাহার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "হাড়ী দুইহান দ্যান।"

আনোয়ারা টাকা দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া কহিল, "তোমরা গরীব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাইলে?

নবার বৌ মিশিরঞ্জিত দন্ত বিকশিত করিয়া কহিল, "খোদায় দিছে।"

আনো। তা ত' সত্যি ; কিন্তু খোদা কেমন করিয়া দিল ?

নবার বৌ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনোয়ারা ভরসা দিয়া কহিল, "আমার কাছে বলিতে ভয় কি ?" নবার বৌ তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আনোয়ারা তখন কহিল, "তুমি টাকার কথা না বলিলে আমি তোমাকে শাড়ী দিব না।" নবার বৌ শাড়ীর জন্য পাগল! সে এদিক্ ওদিক চাহিয়া কহিল, "বাড়ী আলা এক ছালা ট্যাহা পৈরে পাইছে।"

আনো। কোথায় পাইয়াছে ?

নবার বৌ। সাহেবের পুষ্কন্নিতে রাতে মাছ মারতে যায়া।

আনোয়ারা শুনিয়া অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিল। পরে দশ টাকা ফেরৎ দিয়া শাড়ীর কথিত মূল্য ১৫৲ টাকা রাখিয়া শাড়ী দুইখানি নবার বউ-এর হাতে দিল। সে মহানন্দে শাড়ী—লইয়া প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আনোয়ারার শাড়ী বিক্রয়ের তিন দিন পর জেলা হইতে জনৈক নামজাদা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার রতনদিয়ায় আসিয়া হঠাৎ নবাব আলীর বাড়ী ঘেরাও করিলেন। পাঠক, নবাব আলী ওরফে নবার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছেন।

নবা বন্দরে যাইতে বাড়ীর বাহির হইতেছিল। পুলিশ দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

নবা। হুজুর, কর্তা, আমার নাম—আমার না—ন—নবা। না, আমার নাম কর্তা মহাশয় নবাব আলী শ্যাক।

ইন্‌স্পেক্টারের ইঙ্গিতে কনেষ্টবল নবাব আলীর হাত চাপিয়া ধরিল। নবার মুখ দিয়া তখন ধুলা উড়িতে লাগিল। সে মনে করিতে লাগিল, সমস্ত দুনিয়াটা বুঝি তাহার বিপদে ওলট-পালট খাইতেছে। সে এখন দিশাহারা, তথাপি বিলুপ্ত সাহসের কৃত্রিম ছায়া অবলম্বনে কনেষ্টবলকে কহিল, 'আপনে হুজুর কর্তা আমার হাত চাইপ্যা ধল্লেন্ কেন্? ছাড়েন্, না ছাড়লে আমি এহনি এই দারোগা বাবুর কাছে নালিশ কইর‍্যা দিমু।"

ইন। (স্মিত মুখে) কি বলে নালিশ কর্‌বি?

নবা। হুজুর আমার বাপ-দাদা দুই পুরুষে কেউ চোর হয় নাই। আমিও চোর না। তবে কিছু ট্যাহা পইর‍্যা পাইছি, তা চান্ ত' এহনি বার কর‍্যা দিতেছি।

ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন, "তবে বাড়ীর ভিতর চল্।" কনেষ্টবল নবার হাত ছাড়িয়া দিল, ইন্‌স্পেক্টার তাহাকে সঙ্গে করিয়া সদলে নবার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কনেষ্টবল সঙ্গে গিয়া নবার টাকার বাক্স বাহিরে আনিল। সর্বসম্মুখে খোলা হইল, বাক্সে মাত্র ২০০্ টাকা পাওয়া গেল। আর একটি ছোট রকমের টিনের বাক্স খোলা হইল, তাহা হইতে একখানি বেনারসী ও একখানি নীলাম্বরী শাড়ী আর ১৩টি টাকা বাহির হইল। এই বাক্সটি নবা তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিয়া খরিদ

করিয়া দিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টার নবাকে কহিলেন, "তোর বউ বেনারসী পরে, আর তুই বলিস আমি চোর না।" শাড়ী দেখিয়া নবার মাথা ঘুরিয়া গেল। কারণ সে এই শাড়ীর বিষয় কিছুই অবগত নয়। সে একটু সামলাইয়া কহিল, "হুজুর, আমি হাড়ীর কথা কিছুই জানি না। বউকে পুছিয়া দেহি কেমন কইরা এমন হাড়ী গরীবের বাড়ী আইল।" ইন্‌স্পেক্টার আদেশ দিলেন। সে ঘরে গিয়া বউকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহাদের মনিব-বউ তাহার স্ত্রীর নিকট দুইখানি শাড়ী বিক্রয় করিতে দিয়াছেন। বাস্তবিক তাহার স্ত্রী যে শাড়ী নিজে পরার জন্য মুনিব-বউয়ের নিকট হইতে টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছে, তাহা সে স্ত্রীর মুখে শুনিয়াও গোপন করিল।

ইন্। আচ্ছা, আর টাকা কোথায় রাখিয়াছিস বল।

নবা। আমি আর কোন হানে ট্যাহা রাখি নাই।

তখন ইন্‌স্পেক্টারের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ নবার বাড়ীঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাইল না, শেষে তাহার শয়নঘরের মেঝে খুড়িতে খুড়িতে এক পাতিল টাকা বাহির হইল। গুণিয়া দেখা গেল, সতর শত। ইন্‌স্পেক্টার ক্রোধ-ভরে নবাকে কহিলেন, "আট হাজারের মধ্যে ১,১৯৩ টাকা পাওয়া গেল। আর টাকা কোথায় আছে ভাল চাহিস ত খুলিয়া বল।"

নবা। হুজুর, এখন কাইট্যা ফেলালেও আর নবার ঘরে এক পয়সা পাইবেন না।

পুলিশ-অনুচরগণ নবার বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাস্তবিকই আর কিছু পাইল না।

ইন্। তুই এত টাকা কোথা হইতে চুরি করিয়াছিস?

নবা। হুজুর আমি চোর না। ট্যাহা পইরা পাইছি।

ইন্। কোথায় পেয়েছিস বল। ঠিক কথা বলিলে, তোকে ফাটকে দিব না।

নবা। হুজুর, বাপ মা, যদি গোলামকে বাঁচান, তবে সব খুইল্যা কই?

ইন্। বল তোর কোন ভয় নাই।

নবা। যেদিন আমার মুনিবকে জেলায় ধ'রে লিয়া যায়, হেইদিন রাতে আমি সায়েবের পুষ্কন্নিতে মাছ মারতে গেছিলাম। পশ্চিমপারে জালি দিয়া মাছ মারতেছি; দেহি তিনজন মানুষ অফিসের ঘাট দিয়া নাইমে আইসে একজন পানিতে নামল। তারপর কি যেন তুইলে উপরের দুইজনের মাথায় দিল, আর,

নিজেও একটা নিল। তারপর তিনজনাই উপরে উঠে গ্যাল। আমি পানিতে মিইশ্যা থাইক্যা দেহলাম।

ইন্। তিনজন কে কে

নবা। কাল্‌ছা অঁাধারে চেনা গেল না।

ইন্। তুই তখন কি করলি?

নবা। তারা চইল্যা গ্যালে আমি আস্তে আস্তে পূর্বপারে যাইয়া স্থাহি পানির কিনারে কি যেন উচা হ'য়া আছে। হাত দিয়া স্থাহি ট্যাহার ছালা। আমি তাই মাতায় কইর‍্যা বাড়ী আনছি।

ইন্। এই তিনটি লোককে কি একেবারেই চিনিতে পারিস নাই?

নবা। হুজুর পরে পারচি।

ইন্। (সোৎসাহে) কে কে?

নবা। রতীশ বাবু আর দাগু মামু।

ইন্। তারা যে চুরি করিয়াছে কেমন করিয়া বুঝিলি?

নবা। আমি হেই দিন ভোরে বাড়ী হইতে আইসে সায়েবের পুষ্করিতে মুখ ধুইতে গেছিলাম। স্থাহি রতীশ বাবু আরদাগু মামু পুষ্করিতে রাতে হেই জায়গায় খাড়া হ'য়া কি যেন বলা কয়া করতেছে। আর রতীশ বাবু ট্যাহার জায়গায় হাত ইশারা কইরা কি যেন স্থেহাইতেছে। ওগার উপর আমার ভারি শোবা হইল কিন্ত ভাবলাম আর একজন কে? ধরার জন্তি তাহে তাহে থাক্‌লাম।

এই পর্যন্ত বলিয়া নবা থামিয়া গেল।

ইন্। তাহারপর আর কোন খোঁজ করিতে পারিস নাই?

নবা। হুজুর, আমাকে ছ্যাইড়া দিবেন ত?

ইন্। হঁা, হঁা, তুই যদি সব কথা সত্য করে খুলে বলিস, তবে তোকে বেকসুর খালাস দিব।

নবা। তবে কই হোনেন। আমরা ৩।৪ জন গরীব মানুষ পাট বাঁধাই করি। রতীশ বাবুর বাসার নিকট আমাগোর বাসা।

ইন। রতীশ বাবু কি পরিবার লইয়া থাকেন?

নবা। না, হুজুর, তিনি ক্যাবল বাসায় পাক কইরা খান।

ইন্। রাত্রে কোথায় থাকেন?

নবা। হুজুর, অনেক রাতে থানার পশ্চিমে বৈষ্টমী পাড়া যান।

ইন্। কোন্ বৈষ্ণবীর বাড়ীতে থাকেন, জানিস?

নবা। জানি, নলিনী বৈষ্টমীর বাড়ীতে থাহেন। আমরা সেই বৈষ্টমীকে নলিনী ঠাকরাণী বলি! ঠাকরাণী না বললে বৈষ্টমী বেজার হয়, বাবুও রাগ করেন।

ইন্। থাক, আসল কথা বল।

নবা। হুজুর, আমি এ্যাক দিন বেশী রাত জাইগ্যা বাসায় বইসে আছি, পাশে রতীশ বাবুর বাসায় তেনি, দাগু মামু আর ফরমান ৩ জন মানুষের কথা শুইনা কান খাড়া কল্লাম। দাগু মামু এই কইতাছে, বাবু,যে ছালাআলাদা বালুতে গাড়া হইচিল, তা আপনি আগে চালাকী কইরা তুইল্যা আনচেন। তার অংশ আমাকে না দিলে আমি সব ফাঁসায়া দেব। রতীশ বাবু কইল, 'না দাগু ভাই, আমি কালী ঠাকুরুণের দিব্যি কইর‍্যা কইতে পারি আমি তা আনি নাই।' দাগু মামু তখন ফরমান ভাইকে কইলেন, 'একাজ তবে তুমিই কর'চ?' ফরমান ভাইও তখন রাগের মুখে কইল, 'আমাকে অত শয়তান মনে কইর না। চিনির বলদের মত বোঝা বওয়াইয়া মোটে পাঁচ গণ্ডা ট্যাহা দিতে চাও, খোদায় এ্যার বিচার করবো।, রতীশ বাবু হাইসে কইলেন, 'নেও ফরমান, তুমি আর আপত্তি কইর না, এ্যাক ঘণ্টায় এক কুড়ি, আর কত? ফরমান কইলেন—'বাবু, আপনারা যে ছালায় ছালায়। আমি যদি ফাঁসায়ে দিই? দাগু মামু কইল, 'কয়া দিয়াআর কি ঘণ্টা করবা? মোকদ্দমা ত' মিট্যা গ্যাছে। তার জন্যি বড়বাবুর ফাটক হইচে। রতীশ বাবু কইলেন, 'আমার মনে কয়—যে জলের ছালা চুরি করচে, হেই বালুতে আলাদা গাড়া ছালা নিছে।"

দূরদর্শী, শান্তশিষ্ট ইনস্পেক্টার নবাকে আর প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। যাহা শুনিলেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন। অনন্তর নবাকে সঙ্গে করিয়া সদলে বেলগাঁও উপস্থিত হইলেন। বেলা তখন ১১টা।

ইন্স্পেক্টার সাহেব নলিনী, রতীশ, দাগু ও ফরমানকে স্থানীয় পুলিশের হেফাজতে পৃথক বন্দী করিয়া রাখিয়া স্নানাহারের জন্য ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন।

আহারান্তে অপরাহ্নে ২টায় ইন্স্পেক্টার সাহেব জোহরের নামাজ পড়িয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিলেন। অগ্রে নলিনী বৈষ্ণবীর বাড়ী দেখা হইল। তাহার ঘরে নূতন লোহার সিন্দুক ও নূতন মজবুত ষ্টীলট্রাঙ্ক। সিন্দুক ও বাক্সের চাবি

নলিনীর নিকট চাওয়া হইল। নলিনী ঝাড়িয়া জবাব দিল, "চাবি নাই, কাল হারাইয়া গিয়াছে।" ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন, "শয়তানি ছাড়, চাবি দাও।" নলিনী নির্ভয়ে উত্তর করিল, "বল্‌ছি চাবি হারাইয়া গিয়াছে, কোথা হইতে দিব ?"

নবা। চাবি বুঝি রতীশ বাবুর কাছে আছে। আমি তার কোমরে অনেকবার বড় ছোড়াণী দেকচি।

তখনই রতীশ বাবুর নিকটে পুলিশ গেল। বাবু চাবি লুকাইতে সময় পাইলেন না ; অগত্যা বাহির করিয়া দিলেন। চাবি দুইটি পাইয়া ইন্‌স্পেক্টার নবার প্রতি খুসী হইলেন। অগ্রে লোহার সিন্দুক খোলা হইল। তন্মধ্যে নগদ দুই হাজর টাকা ও পাঁচ শত টাকার নোট পাওয়া গেল। ষ্টীলট্রাঙ্ক হইতে নগদ চারিশত টাকা এবং কুড়ি ভরি পাকা সোনা বাহির হইল। ইন্‌স্পেক্টার নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আড় টাকা কোথায় রাখিয়াছ ?" নলিনী নিরুত্তর। ইন্‌স্পেক্টার অন্যান্য বেশ্যাদিগের নিকট প্রমাণ লইয়া জানিতে পারিলেন, এক বৎসর হইল রতীশ বাবু নলিনীকে তাঁর দেশ হইতে এখানে আনিয়া ঘর করিয়া দিয়াছেন। নলিনী রতীশ বাবুর প্রতিবেশী জনৈক তন্তুবায়ের বালবিধবা কন্যা। প্রথম যখন এখানে আইসে তখন অবস্থা শোচনীয় ছিল। অল্পদিন হইল হঠাৎ স্বচ্ছল হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টারের আদেশে নলিনীকে হাতকড়া দিয়া থানার হাজতে পুরা হইল। রতীশ বাবুর বাসাবাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে ফরমানকে ধরা হইল।

ফরমান আমাদের পূর্বকথিত গণেশের ন্যায় সজ্ঞান বাচাল ; ছোটবেলায় সে গ্রাম্য স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিল ; কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, তাই দাগু যাচনদারের সহকারিতা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে দেখিয়াই লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর বুঝি খোদ ধর্মরাজ ! ধর্মমাহাত্ম্য দেখাইতে আসিয়াছেন ! আমি বুঝিয়াছিলাম, এই হোমরা-চোমরা সাহেব-সুবা সব আসিয়া যখন খাট্টা খাইয়া গেল, তখন ইংরাজের মুলুকে ধর্ম নাই, কিন্তু হুজুরের দাড়ির ভিতর ধর্ম আছে বলিয়া মালুম হইতেছে।" ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের সুন্দর চাপদাড়ি ছিল। তাঁহার বয়সও ৩৫।৩৬ বৎসরের বেশী নয়। তিনি হাসিয়া কহিলেন,তোমাকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হইতেছে ; মিথ্যা কথা বলিও না, ঠিক করিয়া বল, তুমি কত টাকা চুরি করিয়াছ ?

ফর। হুজুর, ভাল লোক কি চুরি করে? তা' যদি হয় তবে হুজুরকেও চোর বলা যায়।

ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পুলিশ প্রভুদিগের ন্যায় অগ্নিশর্মা না হইয়া কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন, "টাকার লোভে ভাল লোকও চোর হয়।"

ফর। তা হুজুরদিগের জেয়াদা।

ইন্। তবে তুমি টাকা চুরি কর নাই?

ফর। এক পয়সাও না।

ইন্। তবে কোম্পানীর এত টাকা কে চুরি করিয়াছে?

ফর। হুজুর, দাগু বেটাকে ধরুন। বেটা দুপুর রাতে আমাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া টাকার বোঝা বহাইয়া ৭।৮ দিন পরে মোটে কুড়িটি টাকা দিয়াছে। হুজুর, ভিজা ছালার টাকা—বালুচরে বহিয়া নিয়া আমার মাথায় বেদনা ধরিয়াছিল, এখনও সারে নাই! হুজুর আমি যেন দাগু বেটার চিনির বলদ।

ইন্। তুমি যদি চুরির সব কাণ্ডকারখানা খুলিয়া বল, তবে তোমাকে আর চালান দিব না।

ফর। হুজুর, সেই কাণ্ডকারখানা আপনি শুনিলে তাজ্জব হইবেন। আমি সত্য ছাড়া এক বিন্দুও মিথ্যা বলিব না। আহা! হুজুর যদি হোমরা-চোমরাদিকের আগে আসিতেন, তবে বড়বাবুর ফাটক হইত না। হুজুর, তাঁর মত ভাল লোক এদেশে নাই। আমার মনে হলে তাঁর জন্য কান্না আসে।

ইন্। কে কে টাকা চুরি করিয়াছে?

ফর। রতীশ বাবু আর দাগু।

ইন্। কেমন করিয়া চুরি করিল?

ফর। হুজুর, প্রথমে টের পাই নাই। শেষে আস্তে আস্তে সব মালুম হইয়াছে।

ইন্। খুলিয়া বল।

ফর। যেদিন দুষ্টেরা টাকা চুরি করে, সেই দিন শনিবার ছিল। বড় বাবুর মন আগে থাকিতেই কি কারণে যেন খারাপ হইয়াছিল। কাজ কাম উদাসভাবে করিতেন, ভুল-ভ্রান্তি খুবই হইত।

ইন্। কি কাজে ভুল করিতেন?

ফর। তাই ত' বলিতেছি, শুনেন না?

ইন্। (হাসিয়া) আচ্ছা বল।

ফর। উব্দা করে দোয়াতে কলম দিতেন।

ইন্। থাক আসল কথা বল।

ফর। বড়বাবুর ভুলের কথা বলি নাই : এখনই আসল।

ইন্। (মৃদুহাস্যে) তবে তাড়াতাড়ি বল।

ফর। একদিন বাবু আমাকে বলিলেন,—'ফরমান বাবাজি, এক বদনা পানি আন ত'।' আমি পানি আনিয়া দিলাম। বাবু চোখ বুজিয়া ফুরসী টানিতে শুরু করিলেন। অনেকক্ষণ টানিয়া টানিয়া কহিলেন, "ফরমান কি পানি দিলে হে, ধুঁয়া ত' বাহির হয় না?' আমি বললাম—'বাবু, পানি দিয়া কি ধোঁয়া বাহির হয়? তখন বাবুর চৈতন্য হইল। কহিলেন, 'আরে না, পানি নয়, আগুন দাও।'

ইন্। তুমি মদ খাও নাকি?

ফর। তওবা, তওবা। আপনার বুঝি অভ্যাস আছে?

ইন্স্পেক্টার সাহেব রাগ করিয়া কহিলেন, "বাচলামী রাখ, কেমন করিয়া কে কত টাকা চুরি করিয়াছে তাই বল।"

ফর। ভাবিয়াছিলাম আপনি বুঝি সক্রেটিস, তা এখন টের পাইলাম আপনি বাবা শা-ফরিদের দাদা।

ইন্। (ফরমানের দিক চাহিয়া) তুমি ওসকল নাম কিরূপে জান?

ফর। আপনি কি আমাকে চাষা মনে করেন?

ইন্। (হাস্য করিয়া) না, না, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ফর। তবে শুনেন,—সেই শনিবার দুপুরের পর বড় বাবু অফিস-ঘর হইতে মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। দাশু বেটা আমাকে কহিল, 'ফরমান, তুমি মসজিদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া থাক; বড়বাবু মসজিদ হইতে বাহির হইলেই আমাদিগকে সংবাদ দিবে।' রতীশ বাবু কহিল, 'প্রিয় ফরমান, তুমি জান বড়বাবু নিজে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার তামাক খান, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ২।১ বারও ঘটে না। তা' এই অবসরে প্রাণভরে তামাক খাই, তুমি খুব সাবধানে বড়বাবুর আসার পথের দিকে চাহিয়া থাক।' হুজুর রতীশ বাবু ও দাশু বেটার কল্যানে দু'পয়সা উপরি পাই, তারা না দিলে উপায় নাই তাই তাদের কথামত কাজে প্রবিত্ত হইলাম। হুজুর, যদি জানতেম বড়বাবু ভুলে টেবিলের উপর ক্যাস বাক্সের চাবি রাখিয়া নামাজ পড়িতে গিয়াছেন, আর

শালারা সেই অবসরে সিন্দুক খুলিয়া ছালা-বোঝাই টাকা পুষ্করিণীতে ডুবাইয়াছে তাহাহইলে কি আমি তাদের কথায় ভুলি? এমন বিশ্বাসঘাতক কাজের কথা আমি জন্মেও শুনি নাই, দেখা ত' দূরের কথা।

ইন্। ঐরূপভাবে যে চুরি হইয়াছে, তুমি কত দিন পরে কেমন করিয়া জানিলে?

ফর। বড়বাবুর জেল হওয়ার পর চোরদের মুখেই শুনিয়াছি।

ইন্। তোমরা পুষ্করিণী হইতে টাকা কবে তুলিয়া বালুচরে রাখিয়াছিলে?

ফর। যেদিন বড়বাবু জেলায় চালান হইয়া যান সেই রাত্রিতে।

ইন্। তোমাকে কত টাকা দিয়াছিল?

ফর। মাত্র কুড়ি টাকা।

ইন্! তোমাকে ত' খুব ঠকাইয়াছে?

ফর। হুজুর না ঠকাইলে ফরমান মিয়ার কাছে এত খবর পাইতেন কিনা, সন্দেহের কথা বলিয়া মনে করুন।

ইন্স্পেক্টার সাহেব অতঃপর দাগুকে ধরিয়া কহিলেন, 'কোম্পানীর টাকা চুরি করিয়া কোথায় রাখিয়াছ?'

দাগু। আমি কেন টাকা চুরি করিব?

ইন্স্পেক্টার সাহেবের হুকুমে তাহার অনুচরেরা দাগুর থাকিবার স্থান খুঁজিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুই পাইল না।

ইন্। তোমার বাড়ী কোথায়?

দাগু। দুধের গ্রাম।

ইন্। গ্রামের নাম?

দাগু। আজ্ঞে হাঁ।

ইন্। এখান হইতে কত দূর?

দাগু। দুই মাইল।

ইন্স্পেক্টার সাহেব ঘড়ি দেখিয়া দাগুকে কহিলেন, "চল তোমার বাড়ীতে যাইব।" দাগুর মুখ শুকাইল। অনুচরেরা দাগুকে বাঁধিয়া লইয়া ইন্স্পেক্টার সাহেবের পশ্চাদগামী হইল।

দাগুর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না; ইন্স্পেক্টার সাহেব হতাশ হইয়া ফিরিতে উদ্যত হইলেন। ফরমান সঙ্গে গিয়াছিল,

সে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে কহিল, 'হুজুর, একটা জায়গা দেখা বাকী আছে আমি গল্পে শুনিয়াছি, সেয়ানা চোরেরা চুরির মাল চুলার নিচে রাখে।' ফরমানের কথা ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের মনে ধরিল। 'তনি দাগুর রান্না ঘরের চুলা খুঁড়িতে অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে কার্য চলিল। চুলার অনেক নীচে মুখবন্ধ একটি তামার ডেকচি পাওয়া গেল। তুলিয়া দেখা গেল পুরা দুই হাজার টাকাই পাত্রে রহিয়াছে! ইন্‌স্পেক্টার সাহেব উল্লসিত হইয়া কহিলেন, "ফরমান, তুমি বাঁচিয়া গেলে।"

ফরমান। আপনার মুখে ধান-দুর্বা।

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টার সাহেব অনুমান করিলেন বালুচরে পৃথক পোতা যে এক ছালা টাকার জন্য রতীশ বাবু কালী ঠাকুরুণের শপথ করিয়াছেন,—নবা বলিয়াছে সে টাকা রতশী বাবুই চোরের উপর বাটপারী করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। কারণ, ম্যানেজার সাহেব বলিয়াছেন, চারি ছালা টাকা খোয়া গিয়াছে, প্রত্যেক ছালায় দুই হাজার করিয়া টাকা ছিল। সুতরাং রতীশ বাবু এক ছালা টাকা লইলে, তাঁহার রক্ষিতার ঘর হইতে নগদ মোট দুই হাজার নয়শত এবং পাকী সোনার ভরি ২৫্ টাকা ধরিলে ২০ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৫০০ টাকা অর্থাৎ মোট তিন হাজার দুইশত টাকা! অবশিষ্ট টাকা পাওয়া অসম্ভব। কারণ প্রমাণে নলিনীর যে অবস্থা জানা গেল, তাহাতে এক ছালা টাকা বাদে সে নিজে এক হাজার দুইশত টাকা জমাইতে পারে নাই। এখন দেখা যাইতেছে, মোট আট হাজারের মধ্যে আটশত টাকা নাই। এই টাকা হয় রতীশ না হয় নলিনীর নিকট আছে।

রতীশ বাবু যখন অবশিষ্ট টাকার কথা মোটেই স্বীকার করিলেন না, তখন ইনস্পেক্টার সাহেব স্থানীয় পোষ্ট আফিসে উপস্থিত হইয়া মাষ্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানকার পাট অফিসে কেরানী রতীশ বাবু ২।১ সপ্তাহের মধ্যে সেভিংস ব্যাঙ্কে কোন টাকা জমা দিয়াছেন কি না? অথবা মণিঅর্ডারে কোথাও পাঠাইয়াছেন কি না?" পোষ্ট মাষ্টার বাবু খাতাপত্র দেখিয়া কহিলেন, 'হাঁ, চারিশত টাকার মণিঅর্ডার করিয়াছিলেন এবং চারিশত ট কা ব্যাংকে জমা দিয়াছেন।"

ইন্। কোথায় মণিঅর্ডার করিয়াছে?

পোষ্ট। বাড়ীতে তাঁহার পিতার নিকট।

রতীশ বাবুর সহিত পোষ্ট মাষ্টারের জানাশুনা ছিল। ইন্‌স্পেক্টার সাহেব

যতীশ বাবুর পিতার নাম জানিয়া তখনি তার, করিলেন, "চারিশত টাকার মণিঅর্ডার পাঠাইয়াছি, এ পর্যন্ত প্রাপ্তি সংবাদ রসিদ না পাইয়া চিন্তিত আছি।" ইতি—

যতীশচন্দ্র—বেলগাঁও।

উত্তর আসিল, টাকা পাইয়াছি।

ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তখন আপন আনুমানিক কার্যের সত্যতা দেখিয়া খোদাতায়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ করিলেন।

এইরূপে চুরি আস্কারা করিয়া ইন্‌স্পেক্টার সাহেব ডাকবাংলায় চলিয়া গেলেন।

তিনি ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন, জুট-ম্যানেজার সাহেবও তথায় আসিলেন।

ম্যানে। কল্পনার অতীত এমন জটিল চুরি আপনি কিরূপে আস্কারা করিলেন? আপনি সত্বর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ইন্। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।

ম্যানে। তবে কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এমন ডাকাতি ধরা পড়িল?

ইন্। আপনারা যে নির্দোষ ব্যক্তিকে জেলে দিয়াছেন, তাঁহার সহধর্মিণীর সন্ধানে।

ম্যানেজার সাহেব লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। পরে কহিলেন, "তিনি অসূর্যম্পশ্যা, কিরূপে এমন সন্ধান করিয়াছেন?"

ইন্। আপনাদের তহবিল-তছরূপের টাকা শোধের জন্য সতী গাত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করতঃ শেষে উদরান্নের জন্য পরিধেয় শাড়ী বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে চোরের সন্ধান হয়।

ম্যানে। আমি নুরল এসলামের স্ত্রীর পতি-ভক্তিতে ক্রমশঃই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতেছি। পীড়িত পতির প্রাণরক্ষাই এই লোকাতীত ঘটনা! আবার এই এক আশ্চর্য ব্যপার! খুলিয়া বলুন।

ইন্। আমাদের উকিল সাহেবকে আপনি জানেন। তাঁহার নিকট আপনার মহত্বের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার স্ত্রী আপনাদের নুরল এসলাম সাহেবের স্ত্রীর সখী। নুরল এস্‌লাম সাহেবের স্ত্রী, তাঁহার সখীকে পত্র লিখেন,

"আমাদের খানাবাড়ীর প্রজা নবাব আলী শেখের স্ত্রী আমার নিকট হইতে ১৫৭ টাকা দিয়া দুইখানা শাড়ী কিনিয়া লইয়াছে। তাহার স্বামী দিন মজুরী করিয়া খায় সুতরাং এত টাকা সে কোথায় পাইল—জিজ্ঞাসা করায় ইতস্তত: করিয়া কহিল, 'আমার সোয়ামী কিছু টাকা কুড়াইয়া পাইয়াছে।' সবিশেষ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম, নবাব আলী বেলগাঁও জুট ম্যানেজার সাহেবের পুষ্করিণীতে রাত্রিতে মাছ ধরিতে যাইয়া একছালা টাকা পাইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যে টাকার নিমিত্ত তোমার সয়া"—এই পর্যন্ত লিখিয়া পতিপ্রাণা আর কিছু লিখিতে পারেন নাই। আমি উকিল সাহেবের নিকট এই চিঠি দেখিয়াছি। তিনি এই চিঠি লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখাইয়া সব খুলিয়া বলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে তদন্তের জন্য পাঠাইয়াছেন।

ম্যানেজার সাহেব শুনিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "জগতে সতী-মাহাত্ম্যের তুলনা নাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে ইন্‌স্পেক্টার জহরুল আলম সাহেব রতীশ ও নলিনী প্রভৃতি আসামীগণকে চুরির মালসহ জেলায় চালান দিলেন। মনিঅর্ডার ও সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাও সত্বর আনয়ন করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নানাবিধ বিবেচনা করিয়া। মোকদ্দমা দায়রায় দিলেন

নবা ও ফরমান বাঁচিবার আশায়, জজকোর্টে চুরির সমস্ত কথা খুলিয়া সাক্ষ্য দিল। ম্যানেজার সাহেব পুনরায় সাক্ষীর আসনে দাঁড়াইলেন। চুরির সত্যতার জন্য আসামীগণের বিরুদ্ধে যাহা নাজাই ছিল, উকিল সাহেবের জেরার কৌশলে তাহা বাহির হইয়া পড়িল। রতীশ সরকারের নিকট যে নোট পাওয়া গিয়াছিল ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের সূক্ষ্ম তদন্তের ফলে সেই নোটের নম্বরই তাহাকে প্রকৃত চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। বিচারের দিন নুরুল এসলামকে জেল হইতে জবানবন্দীর নিমিত্ত বিচারালয়ে আনা হইল। তাঁহাকে বেনারসী ও নীলাম্বরী শাড়ী দেখাইয়া জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ শাড়ী চিনেন? নুরল এসলাম শাড়ী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইলেন। উকিল সাহেবের ইঙ্গিতে জনৈক চাপরাশী তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল। জজ সাহেব এসেসারগণকে বিশেষভাবে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিলেন। পরে সকলের মত এক হইলে তিনি রায় লিখিলেন, আসামী রতীশ সরকার ও দাগুকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরির অপরাধে ১০ বৎসর, পৃষ্ঠপোষক নলিনীর প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করা হইল। ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে নবা ও ফরমান বাঁচিয়া গেল। সঙ্গীন চুরি আস্কারা করার জন্য নুরল এসলাম সাহেবের স্ত্রী গবর্ণমেন্ট হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যা, জজ সাহেব রায়ের উপসংহারে একথা উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

প্রকৃত অপরাধীগণ ধরা পড়িয়া শাস্তি পাওয়ায় আপিলে নুরল এসলাম বেকসুর খালাস পাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উকিল সাহেব বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিলেন। হামিদা উল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তখনই রতনদিয়া ও মধুপুরে তার করা হইল।

আনোয়ারা যেরূপ নিজের সর্বস্ব দিয়া কোম্পানীর দাবীর টাকা শোধ করিয়াছে; যেরূপ শাড়ী বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়া চোরের সন্ধান করিয়াছে; নুরল এসলাম বাসায় আসিয়া উকিল সাহেবের নিকট তাহার সমস্ত অবগত হইলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে উকিল সাহেব নুরল এসলামকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, "দোস্ত, বাড়ী যাইয়া আবার সই-এর মনে ব্যথা দিবে না কি ?" নুরল কহিলেন, "ব্যথা ? বাড়ী যাইয়া তাহাকে মুখ দেখাইব কিরূপে তাহাই ভাবিতেছি।" হামিদা আড়ালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ভাবিয়া কি করিবে ? পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে। ছি, ছি, পুরুষগুলো কি, হালকা, লোকাপবাদে এহেন সাধ্বী সতী পত্নীর প্রতি সন্দেহ !"

এদিকে তারের সংবাদে নুরল এসলামের বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। গৃহস্বামীর কারামুক্তিতে সকলেই সহর্ষে নিশ্বাস ত্যাগ করিল; আনোয়ারা রাত্রিতে ঘরে আসিয়া এশার নামাজ অন্তে খোদাতায়ালার শোকর গোজারীর জন্য দুই রেকাত নফল নামাজ পড়িল। শেষে উর্ধ্বহস্তে মোনাজাত করিতে লাগিল, 'দয়াময় ! তোমার অপরিসীম অনুগ্রহে আজ দাসীর নারী জন্ম ধন্য হইল। প্রভো ! যেদিন আমি পতিরমুখে প্রথম কোরান শরীফ ও মোনাজাত শুনিয়াছিলাম, সেইদিন এইরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম; যেদিন প্রথম পাতি-প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম; যেদিন প্রিয়তমের প্রাণরক্ষা হইবে মনে করিয়া নিজ প্রাণদান-সঙ্কল্পে সঞ্জীবনী লতা তুলিতে গিয়াছিলাম; সেইদিন যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, আজ প্রভো সেইরূপ"—বলিতে বলিতে সতীর চক্ষু দিয়া আনন্দের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে অপরিসীম আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "স্বামী বাড়ী আসিলে তাঁহাকে কিভাবে সম্ভাষণ করিব ? আগে কোন কথাটি বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিব ? হায় ! কারাক্লেশে

না জানি তাঁহার শরীর কত কৃশ, কত মলিন হইয়া গিয়াছে? কি কি ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব? কেমন করিয়া তাঁহার শরীর সুস্থ করিব?" সতী আবার ভাবিতে লাগিল, "আচ্ছা, এবারো যদি তিনি আমার সহিত মন খুলিয়া কথা না বলেন, তবে কি করিব? কেন? আমি কি তাঁহার ধর্মপত্নী নহি, কোন্ অপরাধে তিনি আমার প্রতি বাম হইবেন?" সহসা নবাব বৌ-এর ঘৃণিত কথা তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। সতী তখন শিহরিয়া উঠিল। তাহার পতি পরায়নতা-সুলভ সুকল্পনা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। তাহার মনে হইল, 'অহো! আমি যে পরাপহৃতা, আমি যে লোকাপবাদে কলঙ্কিনী,—আমার দোসেই ত স্বামীর কারাবাস! অতএব আমার ন্যায় হতভাগিনী কি স্বামী-সহবাস সুখের আশা করিতে পারে? হায়! এখন আমার কর্তব্য কি? খোদা তুমি এই মন্দভাগিনীর কর্তব্য বুঝাইয়া দাও! তুচ্ছ ভোগ-বাসনায় স্বামী-সহবাসে তাঁহার চির-পবিত্র জীবন চির কণ্টকময় করিব? ধিক্ দুনিয়া! শতধিক্ কামনা!"

অতঃপর যুবতী নিমিষে কর্তব্য নিরূপণ করিয়া লইল। কর্তব্য নির্ণয়ের সহিত তাহার কমনীয় মুর্তি সংযমের কঠোরতায় উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল, যেন দ্বাদশ সূর্য-কিরণে শতদল হাসিয়া লঠিল। সতীর মনের ভাব আর কেহ বুঝিল না, তাহার আকৃতির প্রতিও কেহ লক্ষ্য করিল না। কেবল নৈশ প্রকৃতি যেন সে স্বর্গাদপি গরীয়সী মুর্তি নীরিক্ষণ করিয়া নীরবে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতি যেন গৃহস্থ-গৃহে অমন অগ্রতপা, জ্যোতির্ময়ী যোগিনীমুর্তি আর কোথাও দেখে নাই। তাই সে সভয় দেখিতে লাগিল,—এ মুর্তি মৃত-সঞ্জীবনীব্রতের মুর্তি নহে। তাহাতে ও ইহাতে অনেক প্রভেদ—অনেক অন্তর। সে মুর্তি মৃতের শান্তিময় সমাধির উপর স্থাপিত ছিল, আর এ মুর্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাহনশীল, জীবন-জ্বালাময় সংযমের পাদপিঠে প্রতিষ্ঠিত। সে মুর্তি চাঁদের অমিয় কিরণে হাসিত আর এ মুর্তি প্রখর রবিকরে উদ্ভাসিত। তাহার কামনা ছিল,—পতির রোগমুক্তি, সঞ্জীবণীব্রত তাহার আরম্ভ, প্রাণদানে পর্যবসিত! আর ইহার সাধনা—পতির লোকাপবাদ মোচন, সহবাস ত্যাগ আরম্ভ, চির কঠোর সংযমে সমাপ্ত।

সতী আজ সংসারের যাবতীয় সুখ সার্থ বিসর্জন দিয়া নীরবে যোগ-সাধনায় নিজের কর্তব্য সুদৃঢ় করিয়া লইল।

প্রাতঃকালে আনোয়ারা স্বামীর শয়ন-ঘর সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল।

নুরুল এসলাম কারাগারে যাইবার পর, আনোয়ারা আর সে ঘরে প্রবেশ করে নাই। দক্ষিণদ্বারী ঘরে ফুফু-আম্মার সহিত কালযাপন করিয়াছে। সে আজ স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্বামীকে প্রাণাধিক প্রিয় সোনার জেল্‌দকরা কোরান শরীফটি বাহির করিয়া ভক্তির সহিত চুম্বন করিল; পরে নিজ অঞ্চলে ঝাড়িয়া-মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাজমহলের ফটোখানিও ঐরূপে পরিষ্কার করিল। স্বামীর পরম আদরের পরম সাধের লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি আলমারীসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। গদী, তোষক, খাট, টেবিল, চেয়ার, দর্পণ চিরুণী, প্রভৃতি আসবাবপত্র পরিপাটিরূপে মার্জিত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ব্যবহারাভাবে পতির রৌপ্যাঙ্কুরসী হুকা ও পাদুকা-যুগলে যে ময়লা ধরিয়াছিল, আনোয়ারা যত্নের সহিত তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিল। ফলতঃ স্বামী বাড়ী আসিয়া ঘর-দ্বার অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন দেখিয়া বিরক্ত না হয়, এ নিমিত্ত সে সারাদিন তাহার সুশৃঙ্খলবিধানে ব্যাপৃত রহিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এদিকে উকিল সাহেব নিজের পাল্কী করিয়া দোস্তকে বাড়ী পাঠাইলেন। পথিমধ্যে সাধ্বী পত্নীর অলৌকিক পতি ভক্তির ঘটনাবলী একে একে নুরল এসলামের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে অন্যায় প্রত্যাখ্যান নিত্তি অনুতাপের অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। নুরল এসলাম দহনজ্বালায় ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন চিরসহচর প্রেম, বন্ধুকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহার কানে কানে যেন কহিল, "চল, আমরা বাড়ী গিয়া এবার সতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব; তাহা হইলে অনুতাপের দাহিকাশক্তি হ্রাস হইয়া যাইবে।" নুরল এস্‌লাম কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অপরাহ্ণে বাড়ী পৌঁছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সরলা ফুফু-আম্মা ছেলের কাছে যাইয়া হর্ষ-বিষাদের অশ্রু উপহার দিলেন; সোহাগে ছেলের মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সালেহা সোৎসুক দৃষ্টিতে ভ্রাতাকে দেখিতে লাগিল। দাস-দাসী ও প্রতিবাসী জনমণ্ডলীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাদের যেন কতকালের অভাব অভিযোগ নিমেষে পূরণ হইয়া গেল। কিন্তু যে জন এই মুক্তিমহানন্দের মূলীভূতা, সে এ সময়ে কোথায়? যে নুরল এসলামের বৈষয়িক চিন্তা দূরীকরণমানসে ত্রি-সহস্র মুদ্রার দেনমোহর দলিল অম্লানচিত্তে ছিন্ন করিয়া তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছে, যাহার লোকাতীত সতীত্ব গুণে নুরল এসলাম দুরারোগ্য ব্যাধির করাল গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এ সময়ে সে কোথায়? যে জন পৈত্রিক-প্রাপ্ত নিজস্বধন সর্বস্ব দিয়া নুরল এসলামের বিষয় রক্ষা করিয়াছে, গাত্রালঙ্কার তাঁহাকে দায়মুক্ত ও পরিধান বস্ত্র বিক্রয়ে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আজ গৃহে আনিয়াছে, সেই সতীকুল-পাটরাণী এখন কোথায়?

নুরল এসলাম স্ত্রীর সাড়াশব্দ না পাইয়া শয়নঘরের দিকে, রন্ধনশালার দিকে পলকে পলকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু হায়! নিষ্ফল দৃষ্টি। শেষে তিনি অধীরভাবে নিজে শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন,—গৃহ শূন্য। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন,—গৃহে আছে সবই, কিন্তু কিছুই যেন নাই! আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, তথাপি গৃহ সৌন্দর্যহীন। আরও

বিষাদের অন্ধকার যেন সেই শূন্য গৃহে জমাট বাঁধিয়া হা-হুতাশ করিতেছে। নুরল এসলাম সভয়ে প্রণয়ের আবেগে ডাকিলেন, "আনোয়ারা!" প্রতিধ্বনি কহিল, "কোথায় আনোয়ারা?" নুরল এসলামের হৃদয়ে তখন বিষাদ-নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল, স্ত্রীকে না দেখিয়া তিনি দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

নুরল এস্লাম যখন পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আনোয়ারা দক্ষিণদ্বারী ঘরে একটি ক্ষুদ্র জানালা পার্শ্বে অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। কারাক্লিষ্ট পতির মলিন মূর্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। স্বামী যখন এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া শূন্যমনে শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার চরণসেবা করিতে সতী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। নিজের ঘর, নিজের স্বামী, সমস্তই সম্মুখে, সমস্তই নিকটে; অথচ সে যেন বহু যোজন দূরে অবস্থিত। সংযমের কঠোরতায় আজ সতীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নুরল এস্লাম শয়নগৃহে প্রবেশের কিয়ৎকাল পরে দাসী তামাক সাজিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দাসীকে দেখিয়া নুরল এসলামের হৃদয়ে আরও উদ্দামবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত হইল। অজ্ঞাতে আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল "আনোয়ারা!" দাসী মনে করিল, আমাকেই বুঝি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই সে কহিল, "তিনি দক্ষিণদ্বারী ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছেন।" দাসীর কথায় নুরল এসলাম হঠাৎ মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। স্ত্রীর অস্তিত্ব পরিজ্ঞাতে তাঁহার তাপ দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুফু-আম্মা কোথায়?"

দাসী। তিনি রান্নাঘরে গিয়াছেন।

নুরল অতি মাত্রায় ব্যগ্রভাবে দক্ষিণদ্বারী ঘরে প্রবেশ করিলেন। আনোয়ারা স্বামীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নুরল তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই আনোয়ারা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দাসী অস্পৃশ্যা।" গুরুতর অপরাধের নিদারুণ অনুতাপ-চিহ্ন নুরলের মুখমণ্ডলে নিমিষের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি করুণ স্বরে কহিলেন, "সতী পাপীর অস্পৃশ্যই বটে।"

আনো। আপনি চির পুণ্যবান—দাসী পরাহত্যা-অপবাদ কলঙ্কিনী, তাই আপনার ন্যায় পবিত্র মহাত্মার পক্ষে অস্পৃশ্যা।

নুরল। আমি ভ্রান্ত কল্পনার বশীভূত হইয়া তোমা হেন সতীরত্নকে অবজ্ঞা করিয়া যথেষ্ট মর্মযাতনা পাইয়াছি। সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া তোমার হৃদয়েও অনেক ব্যাথা দিয়াছি, কিন্তু প্রিয়তমে--আমার প্রতি চিরদিনই তোমার ভালবাসার সীমা নাই। আমি না বুঝিয়া তোমার পবিত্র সরলতাপূর্ণ হৃদয়ের সহিত বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছি। প্রিয়ে! যে প্রেমপূর্ণ সরলতা প্রকাশে নুরলকে কিনিয়াছ,সেই সরলতা পূর্ণ ভালবাসা দানে দয়া করিয়া আজ আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবে কি? আমি নরাধম! তোমা হেন সতীর উপর সন্দেহ করিয়া যেরূপ পাপ করিয়াছি কিছুতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। নিরপরাধ কুটিলবোধবিহীনা সাধ্বী সতীর কোমল প্রাণে যে ব্যথা দিয়াছি, ইহজন্মে আমার হৃদয় হইতে তাহা অপনীত হইবে না। এ অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনের সহিত সে নিদারুণ অনুতাপের সম্বন্ধ চিরদিনই থাকিবে, আজ আমি তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী।

বলিতে বলিতে নুরল এসলাম সাশ্রুনয়নে আনোয়ারার হাত ধরিলেন। হৃদয়ের অসীম যাতনায় ও শোকোচ্ছ্বাসে নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রুজলে প্রিয়তমার পবিত্র হস্ত প্লাবিত করিতে লাগিলেন। আনোয়ারা অতি যত্নে স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার চরণে পড়িল এবং কোকিল কণ্ঠে গভীর প্রেমের আবেগে কহিল, "আপনাকে ক্ষমা? আপনার দুর্বাক্য যাহার কর্ণে মধু বর্ষণ করে, যে আপনার চরণের ভিখারিণী,—তাহার নিকট ক্ষমা?—কিন্তু নাথ! আপনি যে ভ্রমে আমাকে চরিত্রহীনা বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, আজ দাসী সে কলঙ্কমোচনে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিবে।"

নুরল। জীবিতেশ্বরী! আমার মন ভ্রান্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু অজ্ঞানান্ধকারে দিগ-ভ্রান্ত হইয়া, আমার হৃদয় সন্দেহমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। প্রাণেশ্বরী! তুমি ভিন্ন আমার এ জগতে আর কেহ নাই; আমি তোমার পবিত্র সংসর্গে এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব। অজ্ঞানান্ধ নুরলের যত কিছু পাপ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বরী! সে সকল পাপেই সে মহাপাপী। যদি সে সকল অজ্ঞানকৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে; তবে তোমার সাক্ষাতেই জীবন ত্যাগ করিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জন দিব।"

আনো। প্রাণেশ্বর, ইচ্ছাপূর্বক আপনি আমাকে মনকষ্ট দেন নাই, এজন্য আপনাকে দোষী হইতে হইবে না। অদৃষ্টের দোষে নিজে দুঃখ পাইলাম, আপনাকেও যথেষ্ট দুঃখ দিলাম। প্রিয়তম, স্বামিন! অভিন্নহৃদয় প্রাণেশ! আপনি পবিত্র,

প্রেমময়! আপনার প্রেমের কণিকা লাভের জন্যও আমি ভিখারিণী! আপনি আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা. আপনার হৃদয়ে আমার স্থান নাই জানিয়াও এ শূন্য হৃদয়ে প্রিয়তম লাভের শেষ আশা পোষণ করিত জীবিত রহিয়াছি ; কিন্তু আপনি ভাল করিতেছেন না , এই হতভাগিনীর সহবাসে থাকিয়া আপনি আর সুখী হইতে পারিবেন না, লোকাপবাদে আপনার কর্মময় জীবনে চিরঅশান্তি আসিয়া হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে। অতএব দাসীর প্রার্থনা, আপনি পুনরায় বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা ও সংসারধর্ম পালন করুন। আপনার সুখের জন্যই আমার জীবন, আপনার সুখে আমার সুখ। এই নিমিত্ত গতরাত্রিতে আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, লোকাপবাদ মোচনের জন্য আপনার সহবাস-সুখ বিসর্জন দিব। অতএব দাসীর এই দৃঢ়ব্রত আর ভঙ্গ করিবেন না। দাসীর শেষ প্রার্থনা, খোদা তায়ালার অনুগ্রহে আপনি বিবাহ করিয়া চির সুখী হউন, কিন্তু দাসীকে চরণ-ছাড়া করিবেন না! দাসী যেন দাসীবৃত্তি অবলম্বনে আপনার পুণ্যধামে থাকিয়া প্রত্যহ আপনার পবিত্র সুন্দর মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া—জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে পারে। আমি কলঙ্কিনী হইলেও আপনার দাসী।

সতীর অশ্রুপূর্ণ নিষ্কাম প্রেমপূর্ণ বাক্যগুলি মিছরির ছুরির ন্যায় নুরল এসলামের হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি অভিমান-ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন, "অনুতাপের দাবানলে ভস্মীভূত হইয়াছি, আর দগ্ধ করিও না।"

আনো। আপনি অকারণ অনুতাপ করিবেন না। যাহা বলিলাম ভাবিয়া দেখুন তাহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

নুরল। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি—জগতের শিক্ষার্থে যাহার স্ত্রী তোমার ন্যায় ব্রতী তাহার জীবন ধন্য। তোমার মতস্ত্রী যার ঘরে তার মর্ত্যেই স্বর্গ।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে গুরুগম্ভীর স্বরে আবার কহিলেন, "আমি আর অধিক বলিতে চাই না প্রিয়তমে, তুমি শত কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইলেও আজ তাহা পবিত্র বিশ্বাস-তুলিকাতে মুছিয়া ফেলিলাম, তুমি রমণীরত্ন! তোমাকে আমি ক্লেশ দিয়াছি। সংসার যায়, যাউক ;—লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব,—হৃদয় অশান্তি-শ্মশান হয়, হউক ;—অদ্য আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আনোয়ারা! তুমি আমার পরম ধার্মিকা সতী-সাধ্বী পত্নী। ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আর তোমায় কষ্ট দিব না। তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অনাদর ভুলিয়া যাও এবং তোমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর ; নচেৎ এখনই তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হইয়া

সর্বদুঃখের অবসান করিব।" প্রেমাভিমানের কঠোরতায় দুর্বল এসলামের হৃদয় চিরিয়া, কথাটি বিদ্যুদ্বেগে সতীর প্রেমময় হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না! পতি-হত্যা মহাপাপজনিত আশঙ্কায় তাহার কঠোর সঙ্কল্প তিরোহিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ পতির চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

অতঃপর অনন্ত সুখ-শান্তির মধ্য দিয়া প্রেমশীল দম্পতির দিন যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। তারপর আর এক দুর্ঘটনায় আনোয়ারার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার সংসার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন দাদিমার উদরাময় রোগে মৃত্যু হইল। বৃদ্ধার মৃত্যুর সময় আপন গাত্রালঙ্কার যাহা এতকাল সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ও নগদ ১৫ শত টাকা এবং ১১টি আকবরী মোহর আনোয়ারাকে দিয়া গেলেন। আনোয়ারা দাদিমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিল।

নুরল এসলামের কারামুক্তির পর গবর্ণমেণ্ট জুট-কোম্পানীর অপহৃত আট-হাজার টাকা ম্যানেজার সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। ম্যানেজার সাহেব পূর্বেই উকিল সাহেবের নিকট অপহৃত চারিহাজার টাকা বুঝিয়া পাইয়া নুরলএসলামকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার মহান মহত্বের নিদর্শন-স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত আট হাজার টাকার এক হাজার মাত্র মোকদ্দমায় ব্যয়স্বরূপ রাখিয়া অবশিষ্ট সাতহাজার টাকা নুরল এসলামকে ফেরত দিলেন। নুরল এসলাম টাকাগুলি লইয়া স্ত্রীরনিকট দিয়া কহিলেন, "এই টাকা হইতে তোমার নগদ দেওয়া টাকা বুঝিয়া লও। অবশিষ্ট টাকা দোস্ত সাহেবকে দিতে হইবে। তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, এ ভবে তাহার তুলনা নাই, তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।" আনোয়ারা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, টাকা লইলাম; কিন্তু এ টাকা এক্ষণে আমি আর কাহাকেও দিব না। আমার একটা প্রার্থনা শুনিতে হইবে।" নুরল সোৎসাহে কহিলেন, "তোমার আদেশ-উপদেশ আমার শিরোধার্য।" আনোয়ারা কহিল, "আদেশ-উপদেশ নয়, বাঁদীর আরজ,—আপনাকে আর আমি কোম্পানীর চাকরি করিতে দিব না। এই টাকা আর দাদিমার দত্ত হাজার টাকা লইয়া আপনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করুন।" নুরল এসলাম স্ত্রীর বৈষয়িক যুক্তি-বুদ্ধির কথা শুনিয়া মনে মনে খোদাতোয়ালাকে অশেষ ধন্যবাদ, প্রদান করিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি যে আশা চিরদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তোমার কথাতে তাহা আজ ব্যক্ত হইল। আমি আর

কোম্পানীর চাকরী করিব না। স্বাধীনভাবে বেলগাঁয়-এ পাটের ব্যবসা অবলম্বন করিব।'

এই সময়ে একদিন নুরল এসলাম একটি ইন্‌সিওর পার্শ্বেল ডাকপিয়নের নিকট পাইলেন। খুলিয়া দেখিলেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট চোরের অনুসন্ধান করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে পুরস্কারস্বরূপ তিনশত টাকা মূল্যের এক ছড়া হার ও দুই শত টাকা মূল্যের একজোড়া বালা পাঠাইয়াছেন।

নুরল হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে বলিলেন, "ডিটেক্‌টিভ মশাই, আপনার গোয়েন্দাগিরির পুরস্কার নিন।" আনোয়ারা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "খুলিয়া বলুন না, ব্যাপারখানা কি?"

নুরল। আপনি শাড়ী বিক্রয় করিতে বসিয়া যে চুরির সন্ধান করিয়াছিলেন, সেইজন্য সরকার বাহাদুর খুশী হইয়া এইগুলি বক্‌সিস পাঠাইয়াছিলেন।

এই বলিয়া নুরল সাদরে স্ত্রীর কমনীয় কণ্ঠে হেমহার এবং হস্তে স্বর্ণবলয় পরাইয়া দিলেন। আনোয়ারা প্রফুল্ল মুখে স্বামীর পদচুম্বন করিয়া কহিল, "ইহা আপনার ব্যবসায়ের প্রাথমিক সুখলক্ষণ বলিয়া জানিবেন।"

অতঃপর ম্যানেজার সাহেব নুরল এসলামকে চাকরীতে হাজির হইতে ডাকিলেন। নুরল বিনীতভাবে ম্যানেজার সাহেবের নিকট আপাততঃ ছয় মাসের ছুটি লইয়া বেলগাঁও এ পাটের ব্যবসা খুলিয়া দিলেন।

এই সময় উকিল সাহেব, জেলার উপর বাসাবাড়ীতে পুত্রের মুখে ক্ষীর দেওয়া উপলক্ষে দোস্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং আনোয়ারাকে আনিবার জন্য পাল্কী-বেহারা প্রেরণ করিলেন।

নুরুল স্ত্রীকে কহিলেন, "সই-এর বাড়ীতে যাইবে নাকি ?

আনো। যদি অনুমতি পাই।

নুরল এসলাম ভগ্ন স্বরে স্ত্রীকে কহিলেন, "তোমার শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, কি লইয়া ক্ষীরোৎসবে যাইবে ?"

আনো। গলার স্বর ধরিয়া গেল যে! এরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কথা বলিতেছেন কেন ?

নুরল। আমার দোষে তুমি তোমার গা-ভরা গহনা খালি করিয়াছ মনে হওয়ায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

আনো। আপনি অকারণ দুঃখ করিতেছেন, আমি খালি গায়েই বেশ যাইতে পারিব।

নুরল। সেখানে গহনা পরিয়া অনেক বড় বড় ঘরের বউ-ঝি আসিবে।

আনো। গহনা পরিয়া বেড়ান আমি মোটেই পছন্দ করি না।

নুরল। তথাপি আমার অনুরোধ, গবর্ণমেণ্টের দেওয়া হার, বালা, দাদিমার শেষ-দত্ত গহনা যাহা যেখানে সাজে পরিয়া যাও।

আনো। আমার অলঙ্কারাদি লইবার ইচ্ছা আদৌ নাই! পরন্তু দাদিমার সেরবরাদ্দ ওজনের অলঙ্কারের বোঝা আমি বহন করিতে কোন মতেই পারিবনা

নুরল। আচ্ছা, তবে হার ও বালা লইয়াই যাও, আর খোকার মুখ দেখার জন্য গুটি দুই তিন আকবরী মোহর লইয়া গেলে ভাল হয়।

আনোয়ারা অতঃপর স্বামীর আদেশ লইয়া উকিল সাহেবের বাসা-মোকামে রওয়ানা হইল।

এদিকে ক্ষীরদান মহোৎসবে উকিল সাহেবের অন্দরমহল কুলকামিনী কুল-কলস্বরে কল-কলায়িত ; বালক-বালিকাগণের ধাবন-কুর্দন-হর্ষক্রন্দন-কোলাহলে

সুখ-তরঙ্গান্বিত, পাচক-পাচিকাগণের পরস্পর দ্বন্দ্বে, পরস্পর রসালাপে, পরস্পর কর্ম-প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত ও রবপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় জমিদার সাহেবের গৃহিনী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী, স্কুল ইন্স্পেক্টার সাহেবের বিবি, সেরেস্তাদার সাহেবের ভগিনী, দারোগা সাহেবের প্রথমা স্ত্রী, নাজির সাহেবের দুহিতা, মৌলভী সাহেবের কবিলা, মোক্তার সাহেবের বণিতা, শিক্ষক সাহেবের সহধর্মিনী প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রমহিলাগণের বেশ-ভূষার ঔজ্জ্বল্য ও নিক্কণে সেই ভাগ্যবান ব্যবহারজীবীর অন্তঃপুর আজ উদ্ভাসিত ও মুখরিত। আবার এই সকল ভদ্রমহিলা কেহ কুলাভিমানিনী, কেহ বড় চাকুরিয়ার ঘরণী বলিয়া গরবিনী, কোন ভামিনী আপাদবিলম্বী ঘনকৃষ্ণ চাঁচ-চিকুরাধিকারিণী বলিয়া অহঙ্কারিণী, কোন তরুণী বেশভূষায় মোহিনী সাজিয়া বাহুলতা অল্প দোলাইয়া দর্পভরে ধীরগামিনী; কোন সীমন্তিনী অতিমাত্রায় বিদুষী বলিয়া বঙ্কিমনয়নে অপরের উপরে কটাক্ষকারিণী। কেবল শিক্ষক-সহধর্মিণী বিলাস-বিরাগিণী আত্মপ্রসাদভোগিনী বিনতা বিদুষী।

আনোয়ারা যথাসময়ে উকিল সাহেবের অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করিল। হামিদা অগ্রগামিনী হইয়া পরমাদরে তাহাকে ঘরে তুলিয়া লইল। অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী মসীযোগে পত্রপৃষ্ঠে লেখনী-তুলিকায় চিত্রিত হইয়া আদান-প্রদান পর উভয়ের সন্দর্শন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সন্দর্শন-সুধা রস উপভোগ করিতে লাগিল। সঞ্জীবনী লতা তোলা ও শাড়ী বিক্রয় কাহিনী প্রভৃতি স্মরণ করিয়া হামিদা সইয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে কহিল,'তুমিই এমন কার্য করিয়াছ!' জনৈক দাসী খোকাকে কোলে করিয়া উভয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আনোয়ারা সহর্ষে পরম স্নেহে ছেলে কোলে লইয়া তার মুখ চুম্বন করিল। শিশু অনিমেষে আনোয়ারার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অতখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া সে যেন মায়ের সুন্দর মুখও ভুলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পর হামিদা আগন্তুক ভদ্রমহিলাদিগের সহিত সই-এর পরিচয় করাইয়া দিল। আনোয়ারা বিনা-অলঙ্কারে তাহাদের মধ্যে তারকারাজি বেষ্টিত শশধরসন্নিভ শোভা পাইতে লাগিল। ভদ্রমহিলাগণ বাহ্যভাবে আনোয়ারার সহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন বটে; কিন্তু তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে অনেকেই স্ত্রীস্বভাব-সুলভ হিংসার বশবর্তিনী হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে আনোয়ারা বাসায় পৌছিয়াছিল, আলাপ-পরিচয়ে সন্ধ্যা আসিল। তখন

আনোয়ারা ও অন্যান্য রমণীগণ মগরেবের নামাজ পড়িতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করি-লেন, কেবল ডেপুটি-পত্নী ও দারোগার স্ত্রী অন্তঃপুরে বাগানে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

নামাজান্তে ভদ্রমহিলাগণ প্রায় সকলে এক দুই করিয়া হামিদার দক্ষীনদ্বারী শয়ন-ঘরের বড় 'হলে' আসিয়া সমবেত হইলেন।

ভদ্রমহিলাগণের প্রায় সকলেই তরুণী, কেবল জমিদার-গৃহিণী ও স্কুল ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বিবি প্রৌঢ় বয়স্কা। জমিদার-গৃহিণী স্কুল ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বিবি ও ডেপুটি-পত্নী তিনখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সকলে ফরাশের চৌকিতে স্থান লইলেন। গল্পগুজব আরম্ভ হইল। এই সময় শিক্ষক-সহধর্মিণী নামাজ শেষ করিয়া তথায় আসিলেন। হামিদা পাকের আয়োজনে ব্যস্ত। সে কার্যবশতঃ এই সময় 'হলে' প্রবেশ করিলে ডেপুটি-পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সই কোথায়?' এখনও নামাজে আছেন নাকি?' শিক্ষক-সহধর্মিণী কহিলেন, 'জি হাঁ।' হামিদা কার্যান্তরে গেল।

দারোগার স্ত্রী। মাগরেবের নামাজে এত সময় লাগে?

মোক্তার-বণিতা। কি জানি ভাই, আমরাও নামাজ পড়ি; কিন্তু অমন লোক দেখানো নামাজ আমাদের পছন্দ হয় না।

ডেপুটি-পত্নী। নামাজ পড়া লোক দেখানো ছাড়া আর কি?

জমিদার-গৃহিণী। আপনি বলেন কি?

ডেপুটি-পত্নী। আমার ত' তাই মনে হয়। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডবল এম-এ। তিনি বলেন, নামাজ রোজা মানুষের মনের মধ্যে। খোদার প্রতি মন ঠিক রাখাই কথা। তিনি আরও বলেন, হৃদয় পবিত্র করাই নামাজ-রোজার উদ্দেশ্য, সুতরাং উচ্চশিক্ষা দ্বারা যাহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তাঁহা-দের স্বতন্ত্র নামাজের প্রয়োজন কি।

জমিদার-গৃহিণী। আজকাল ছেলেপিলেগুলি ইংরেজী শিখিয়া একেবারে অধঃপাতেঃ যাইতে বসিয়াছে।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টার বিবি। হাঁ মা, কেমন যে দিনকাল পড়িয়াছে! নামাজ পড়িতে বলিলে বলেন,—ওসব তোমাদের একটা বোকামী। মনে মনে খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে ৫ বার পশ্চিমমুখী হওয়া ও ৩০ দিন রোজা করার আবশ্যক করে না।

সেরেস্তাদার ভগিনী। ভাই সাহেব ত' আণ্ডার গ্রাজুয়েট, তিনিও নামাজ-রোজা সম্বন্ধে ঐ কথাই বলেন।

দারোগা-স্ত্রী। দারোগা সাহেব দুইবারে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, নামাজ-রোজা ইংরেজদের আইনের মত। অশিক্ষিত ছোটলোকগুলিকে দমন রাখার জন্য উহার দরকার।

এই সময় নামাজ শেষ করিয়া আনোয়ারা তথায় উপস্থিত হইল। সে নামাজ সম্বন্ধে এইরূপ উৎকট সমালোচনা শুনিয়া তথায় আর বসিল না, তওবা করিতে করিতে পাকশালের দিকে চলিয়া গেল।

ডিপুটি-পত্নী। দেখিলেন, আমাদের উকিল-বিবির সই কতদূর অহঙ্কারী, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি প্রথমে দেখিয়াই মনে করিয়াছি, রূপের অভিমানে ইনি ধরাকে সরা মনে করেন। গা-ভরা গহনা থাকিলে না জানি কি হইত!

জমিদার-গৃহিণী। উনি বোধ হয় কোন প্রয়োজনবশতঃ চলিয়া গিয়াছেন।

দারোগা-স্ত্রী। এতগুলি ভদ্রমহিলা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেও ত কতকটা ভদ্রতা রক্ষা হত—তবুও ত কেরাণীর বউ!

ডেপুটি-পত্নী। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা জানানা, শিষ্টাচার-ভদ্রতার কি বুঝিবে?

দারোগা-স্ত্রী। বোধ হয় রূপ দেখিয়াই উকিল-বিবি উহার সহিত সই পাতিয়াছেন

এইরূপে তাহারা মুচকি হাসির সহিত আনোয়ারার বিরুদ্ধে বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে আনোয়ারা পাকশালে উপস্থিত হইল। হামিদা কহিল, 'সই, ডেপুটি সাহেবের স্ত্রী আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুমি কি নামাজ বাদ 'হলে' যাও নাই?

আনো। গিয়াছিলাম, কিন্তু যেখানে নামাজ-রোজা সম্বন্ধে মন্দ আলোচনা হয়, তথায় থাকা উচিত মনে করি নাই।

হামিদা। নামাজ-রোজা মন্দ আলোচনা! কে করিয়াছে?

আনো। আমি কেবল একজনের মুখে শুনিয়াই চলিয়া আসিয়াছি।

হামিদা। প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেই হইত?

আনো। বুঝাইতে গেলে বিরোধ বাধিতে পারে।

হামিদা। বিরোধের ভয়ে চলিয়া আসা ঠিক হয় নাই। কারণ, অন্ধকে

কূপের দিকে যাইতে দেখিলে হাত ধরিয়া পথে দিতে হয়, পরন্তু ভদ্রমহিলাগণকে উপেক্ষা করিয়া আসায় লৌকিক ব্যবহারেও তুমি দোষি হইতেছ।

আনো। তা বুঝি, কিন্তু শুভ উৎসবে জেহাদ করিতে পারিব না।

হামিদা। তুমি বুঝি কেবল সয়ার প্রাণরক্ষায় যমের সহিত জেহাদ করিতে মজবুত, না?

আনো। সই, সে জেহাদ স্বতন্ত্র।

হামিদা। তা হোক, নামাজ-রোজার প্রতি যিনি অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে কিছু আক্কেল সেলামি দিতে হইবে। চল, তোমাকে জেহাদের মাঠে রাখিয়া আসি।

এদিকে শিক্ষক শহধর্মিণী কথা প্রসঙ্গে ডেপুটি-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি নামাজ পড়েন না?"

ডেপুটি-পত্নী। তিনি উচ্চশিক্ষিত।

শিঃ সঃ। রোজাও করেন না?

ডেঃ পঃ। রোজা করেন।

শিঃ সঃ। উচ্চ শিক্ষিতের রোজার প্রয়োজন কি?

ডেপুটি-পত্নী একটু ফাঁপরে পড়িয়া রুক্ষমুখে কহিলেন, "রোজা বছরে এক-বার মাত্র করিতে হয়, আর সেই সময় ছোট বড় সকলেই রোজা রাখে।"

শিক্ষক-সহধর্মিণী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই সময় আনোয়ারা ও হামিদা তথায় উপস্থিত হইল।

ডেপুটি-পত্নী শিক্ষক-সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্বামী কি কার্য করেন?" তখন ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার গর্বিত মুখমণ্ডলকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শিক্ষক-সহধর্মিণীও উত্তেজিত হইয়া উত্তর দানে উদ্যত; আনোয়ারা দেখিল, ডেপুটি-পত্নীর প্রশ্নের ভঙ্গিমায় বিবাদের সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এজন্য সে শিক্ষক-সহধর্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কোন্ কথা হইতে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হইয়াছে?"

শিঃ সঃ। নামাজ-রোজার কথা হইতে।

আনো। বড়ই আফছোছের কথা।

এই বলিয়া আনোয়ারা উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,

"নামাজ-রোজা, বেহেশতের চাবি, আপনারা তাই দিয়া দোজখের দ্বার খুলিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? আমাদের তিনি (স্বামী) নামাজ-রোজার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'মালি যেমন ফুলগাছে জড়িত লতাগুল্মের শিকড় তুলিতে বসিয়া, নির্বুদ্ধিতায় আসল গাছসুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলে আজকাল নূতন শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত অনেক যুবক-যুবতী নামাজ-রোজার মূলতত্ত্ব না জানিয়া, কুটতর্কে উহার আবশ্যকতাই অস্বীকার করিয়া ফেলেন।' আমি নামাজ-রোজা সম্বন্ধে ঐ সকল যুবক-যুবতীগণের মতামত ও নামাজ রোজার মূলতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করায়, তিনি আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার রোজানামচায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছি। আমি তাঁহার মূল্যবান উপদেশ মনে রাখার জন্য প্রায়ই রোজনামচায় লিখিয়া রাখি। আমার মনে হইতেছে আপনারা কেহ কেহ নামাজ-রোজা সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার অনেক কথার মিমাংসা তাহাতে আছে।"

শিঃ সঃ। সে রোজনামাচা কি আপনি সঙ্গে আনিয়াছেন?

আনো। হাঁ, তা সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকে।

শিঃ সঃ। দয়া করিয়া শুনাইলে সুখী হইতাম।

আনো। সকলের মতামত আবশ্যক।

মৌঃ-কবিলা। ধর্মের কথায় কাহার অমত?

জঃ গৃহিণী। আচ্ছা, আপনার স্বামীর উপদেশ আমাদিগকে পড়িয়া শুনান দেখি।

আনোয়ারা ঘরে গিয়া ট্রাঙ্ক হইতে তাহার রোজনামচা লইয়া আসিল। শিক্ষক-সহধর্মিণী সূত্রপাতেই কহিলেন, "আপনি দেখিতেছি আমাদের ন্যায় অসার স্ত্রীলোকমাত্র নহেন।" আনোয়ারা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কিছু লজ্জিত—কিছু সঙ্কুচিতভাবে রোজনামচা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা যদি আল্লা, ফেরেস্তা, কোরান, পয়গম্বর ও কেয়ামত বিশ্বাস করি অর্থাৎ ভক্তির সহিত খোদাতালার প্রতি ঈমান স্থির রাখি, তবে নামাজ-রোজা সম্বন্ধে মনগড়া ভিন্নমত ব্যক্ত করা কাহারও উচিত নহে। আল্লা কোরান মজিদে আদেশ করিয়াছেন, ৫ অক্ত নামাজ ও ৩০ দিন রোজা নর-নারীর সকলের পক্ষেই ফরজ। এ সম্বন্ধে আলেমের প্রতি যে আদেশ, জালেমের প্রতিও সেই আদেশ এ সম্বন্ধে মোল্লা-মাওলানা, এম-এ বি-এল, অলি-দরবেশ, পয়গম্বরের প্রতি যে

আদেশ, বর্বরের প্রতি ও সেই আদেশ; এ সম্বন্ধে শাহানশা বাদশার প্রতি যে আদেশ, কড়ার কাঙ্গালের প্রতিও সেই আদেশ; এ সম্বন্ধে সালঙ্কারা নব-যুবতীর প্রতি যে আদেশ, ছিন্নবসনা ও বিগত-যৌবনা কাঙ্গালিনীর প্রতিও সেই আদেশ, একই বিধি ও একই নীতি। খোদাতায়ালার এই আদেশ নর-নারীর মঙ্গলের জন্য অকাট্য, চূড়ান্ত যুক্তি প্রমাণের উপর স্থাপিত। এই যুক্তি প্রমাণের সমালোচনা করিয়া নামাজ রোজার মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বুঝিয়া লওয়া মন্দ নয়। বরং তাহাতে নামাজ রোজার প্রতি আমাদের অধিকতর ভক্তি বিশ্বাস জন্মিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু খোদাতায়ালার জ্ঞানের নিকট আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। এই তুচ্ছ জ্ঞানের বড়াই করিয়া পূর্ণ জ্ঞানময়ের আদিষ্ট ও বিধান-বিহিত নামাজ রোজা সম্বন্ধে ভিন্নমত ব্যক্ত করা এবং সেই মতের পোষকতা করিয়া নামাজ রোজা ত্যাগ করা বা অবজ্ঞা করা মানুষের কর্ম নহে। যাহারা নিজজ্ঞানে নামাজ রোজার উপকারিতা ও মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম, মহাজনগণের পথ ধরিয়া চলাই তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। হজরত রছুলে (দঃ) মত তত্ত্বজ্ঞানী এপর্যন্ত দুনিয়ায় কেহ আসেন নাই। হজরত আবুবকরের মত সত্যবাদী ও ঈমানদার, হজরত ওমরের মত ন্যায়পরায়ণ ধর্মবীর, হজরত ওসমানের মত বিনয়ী পরহেজগার, হজরত আলীর মত জ্ঞানী ও বিদ্বান, হজরত আবদুল কাদের জিলানীর মত সাধক এ পর্যন্ত সংসারে কেহ হন নাই; কিন্তু ইঁহারা সকলেই ভক্তির সহিত নামাজ রোজা করিতেন। বিবি আয়েশা, ফাতেমা জোহরা, উম্মে কুলসুম, জোবেদা খাতুন প্রভৃতি আদর্শ মাতৃগণ, নামাজ-রোজাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন।

"কেহ কেহ বলেন, নামাজ-রোজা মানুষের মনের মধ্যে। মনে মনে খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে, ৫ বার পশ্চিমমুখে ছেজদা করা, ৩০ দিন উপবাস করিবার দরকার কি? চাই মন। একটু খেয়াল করিলে, তাঁহাদের এ কথা যে ভিত্তিশূন্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, কাহারও ঘরে যদি মহামূল্য রত্ন থাকে, আর তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া, চিরকাল সিন্দুকে মাত্র তুলিয়া রাখেন, তবে সে রত্ন থাকিয়া লাভ কি? পরন্তু আমরা নিষ্পাপ, ইহা বলিয়া যদি তাঁহারা দাবী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এ কথা কতকটা সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা যে মায়ামোহে জড়িত প্রবৃত্তির বশীভূত; তাঁহারা যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাড়িত, ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত; এমতাবস্থায় নিষ্পাপ

বলিয়া দাবী করা তাঁহাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। অতএব পাপক্ষয়ের জন্য মনে, মুখে ও কার্যের দ্বারা খোদার বন্দেগী অর্থাৎ নামাজ-রোজা না করিলে যে তাঁহাদের মুক্তির আশা নাই। যে স্ত্রীলোক বলে, আমি মনে মনে আমার স্বামীকে খুব ভালবাসী ও ভক্তি করি, কিন্তু বাহিরের কার্যের দ্বারা অর্থাৎ মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা, সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা, আদেশ-উপদেশ পালন দ্বারা তাহারা কিছুই করে না, এমতাবস্থায় তাহার কি স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়? আর স্বামীই কি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? কখনই নয়? অতএব নামাজ-রোজা দ্বারা নিজের কর্তব্য পালন করিয়া জগৎ-স্বামীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা নর-নারীর সকলের পক্ষেই একান্ত কর্তব্য।

"সামান্য যুক্তিমূলে যাহা বলা হইল তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব এইরূপ— আমাদিগের মন ও হৃদয়ের সহিত শরীরের আশ্চর্য সম্বন্ধ। মনে চিন্তা প্রবেশ করিলে দেহ অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে; আবার আনন্দে হৃদয়-মন উভয়ই প্রফুল্ল হয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সুস্থ হইয়া উঠে। ইষ্টজন বিয়োগ বা অত্যানন্দে অশ্রু বিগলিত হয়; ফলতঃ ভিতরে ভাবান্তর ঘটিলে বাহিরে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আবার বাহিরের অবস্থান্তরে ভিতরের ভাবান্তর অনিবার্য। আমাদের নামাজের প্রক্রিয়া সমূহ অর্থাৎ ওজু, কেয়াম, সুরা পাঠ প্রভৃতি কার্য খোদাভক্তির বাহ্য অবস্থান্তর। যাঁহারা বলেন, মনে মনে খোদাভক্তি থাকিলে বাহিরে আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই, এখানেই তাঁহাদের কথার অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে। তবে যে অবস্থায় খোদাভক্তিতে বাহিরের ভাব একেবারে বিলুপ্তি হয়, সে অবস্থা বড়ই কঠিন। তাহাকে 'মারেফাতের' অবস্থা বলে। খয়বরের যুদ্ধে হজরত আলীর পাদমূলে-প্রবিদ্ধ তীর তাঁহার নামাজের সময় টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সেই তীর বাহির করা টের পান নাই, নামাজের সমাধি অবস্থায় ঐরূপ ঘটে।

'হৃদয়-মন পবিত্র করাই নামাজ-রোজার উদ্দেশ্য; সুতরাং সুশিক্ষা দ্বারা যাঁহাদের তাহা হইয়াছে, স্বতন্ত্র নামাজ-রোজা করা তাঁহাদের প্রয়োজন কি? এমন উৎকট ভ্রমাত্মক কথাও ২।৪ জন শিক্ষিতাভিমানী প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এমন কথা বলেন, আমার ভয় হয়, বলিবার সময় তাঁহাদের রসনা বুঝি জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। হাজার শিক্ষা লাভ করুন, তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইয়াছে একথা অপূর্ণ মানব বলিতে পারে না। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মত চরিত্রবান-

লোক জগতে আর কে আছে? কিন্তু তিনিও নামাজ-রোজা ত্যাগ করেন নাই।

"কেহ কেহ বলেন, নামাজের অর্থ খোদার বন্দেগী। সুতরাং তাহার আবার সময় অসময় কি? নির্দিষ্ট ৫ বারই বা নামাজ পড়িতে হইবে কেন? যতবার ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খোদার বন্দেগী করায় কি দোষ আছে? যাহারা এমন কথা বলেন, নামাজ পড়া বা খোদার নাম লওয়া দূরে থাক, তঁাহাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করাই ত' কঠিন ব্যাপার। কারণ, দুনিয়ার প্রত্যেক কার্যই যে নির্দিষ্ট সময়ের মুখাপেক্ষী; তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সময় মত কার্য না করিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না বলিয়াই সময় অমূল্য! যদি মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে কার্য না করিত, তাহা হইলে দুনিয়া অচল হইয়া সৃষ্টি বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা হইত। যাহা হউক, নামাজের নির্দ্ধারিত সময়টি য়্যালার্ম দেওয়া ঘড়ির মত; অর্থাৎ যে ঘড়ি যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে জাগাইয়া দেয়, নামাজের নির্দ্ধারিত সময়টি তেমনি সংসারনিরত মানবকে খোদাতায়ালার গুণগানে প্রলুব্ধ করে।

"আর এক কথা, খোদাতায়ালার সুমহান অনুগ্রহে আমরা পরম সুখে সংসারে কালযাপন করিতেছি, এ-নিমিত্ত তাঁহার নিকট অহোরাত্রি মধ্যে ৫ বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই উচিত। আবার পাঁচ অক্তের যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সহজ খেয়ালেই বুঝা যায়, তাহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত সময় বটে। দয়াময়ের অনুগ্রহে নির্বিঘ্নে সুখদ শয়নে রাত্রি যাপন করিয়া, প্রাতে তাঁহার গুণগান করা, কি সুন্দর সময়! নামাজের অন্যান্য অক্তগুলি, তাঁহার স্তবস্তুতির পক্ষে এইরূপ প্রশস্ত।"

"প্রিয়তমে, এ সম্বন্ধে আরো জানিয়া রাখ, পাঁচ এই সংখ্যাটি আমাদের শাস্ত্রকর্তারা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যার্থকবাচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ, দুনিয়া সৃষ্টির বহুকাল পূর্বেই আল্লাহতায়ালা নিজ নূরে হজরত রছুলকে সৃষ্টি করিয়া, গোপনে রাখিয়াছিলেন। সেই সময় হজরত রছুল খোদাতালাকে পাঁচবার ছেজদা করেন। পাঁচ অক্ত নামাজের ইহাই মূল।"

'খোদাতায়ালার নূরে, হজরত রছুল, আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসেন এই পাঁচজন পয়দা হন।"

'আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, এস্‌লাম, এনছান—ঈমান, শরীয়ত, মারেফত, নাছুত, মালাকুত প্রভৃতি ধর্মভাবপূর্ণ-পদগুলি আরবী পাঁচ পাঁচ অক্ষরে লিখিত হয়।

"কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, এই পাঁচটি বিষয় আমাদের ধর্মের মূল। ইহাও পাঁচ প্রকার।"

"মৃত্যুর পরে অজু, গোসল, কাএন জানাজা, কবর ইহাও পাঁচটি। আমাদের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাঁচ, আব, আতস, খাক্‌, বাত প্রভৃতি পাঁচ। ফলতঃ দুনিয়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়ের পক্ষে যাহা প্রধান, তাহা এই ৫ সংখ্যাযুক্ত। সুতরাং জগতের সর্বোত্তম বিষয় খোদাতালার বন্দেগী পঞ্চবার হওয়া স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত হইয়াছে।"

"কেহ কেহ বলেন, খোদাতায়ালার প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়াই নামাজের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু কেয়ামে-আহকামে সে উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা কেয়ামে আহকামের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাদশার দরবারে যে প্রজা অবনত মস্তকে, করযোড়ে, বিনীতভাবে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি বাদশার যেরূপ সুনজর ও দয়ার দৃষ্টি পড়ে, অবিনয়ী, উদ্ধত বা জড়স্বভাব প্রজার প্রতি সেরূপ নজর পড়ে না। পরন্তু দুনিয়ার বাদশার প্রকৃতি বিশ্ব-বাদশার প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সুতরাং তাঁহার দরবারে হাজির হইবার সময় অর্থাৎ নামাজের সময় আমাদিগকে কতদূর বিনীত হওয়া উচিত, তাহা খেয়ালের বিষয়; কিন্তু অপূর্ণ মানব পূর্ণ পরাৎপরের সন্নিধানে কিরূপভাবে বিনীত হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে কি? তাই স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল আসিয়া, বিশ্বপতির নিকট কিরূপ বিনয় ও দীনতাভাব প্রকাশ করিতে হইবে, হজরত মোহাম্মদকে হাতে ধরিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া যান। হজরতের অনুগামী দাস আমরা, সেই মহাপুরুষ হইতেই নামাজের কেয়াম অর্থাৎ বিনয়-নীতি-রত্ন লাভ করিয়াছি। নামাজের সময় দুই পা কিছু দূরে রাখিয়া কেবলামুখে দণ্ডায়মান হইয়া পার্শ্ববর্তী জনকে খোদার নামে সহমিলনে আহ্বান করা, হস্তে কর্ণস্পর্শ করিয়া সেই হস্ত বক্ষ বা নাভিমূলে স্থাপন করা; একভাবে প্রণতস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্লার নামে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করা, পরে উর্দ্ধ শরীরার্দ্ধসহ মস্তক অবনত করিয়া পুনরায় উত্থান, পরে সষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া আবার উত্থান আবার পতন, শেষে জানু পাতিয়া উপবেশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ বিনয়ভাব প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ আর কোন অবস্থায় হইতে পারে না। প্রায় আট হাজার বৎসর গত হইল, হজরত আদমবংশ দুনিয়ায় আসিয়াছে; এ সুদীর্ঘকাল মধ্যে কত জাতি কত প্রকারের উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু

মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন জাতি ধর্মানুষ্ঠান ব্যপারে খোদার সম্মুখে এমন চূড়ান্ত বিনয় ও দীনতার উচ্চতম নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হন নাই। খোদার প্রতি এই বিনয় ও দীনভাবই এস্লামের অনুপম মহত্ব এবং একেশ্বরবাদের পাদপিঠ।

এই পর্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা নীরব হইল। তাহার রোজনামচার লিখিত উপদেশ শুনিয়া উপস্থিত রমণী-মণ্ডলী তাজ্জববোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা নামাজ-রোজা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। শিক্ষক-সহধর্মিণী আনোয়ারাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনার ন্যায় ভগিনীরত্ন পাইয়া আজ আমরা বাস্তবিকই গৌরবান্বিত ও সুখী হইলাম। আপনার মুখে ধর্ম কাহিনী শ্রবন করিয়া শুনিবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব নামাজ-রোজার উপকারিতা ও মাধুর্য সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও কিছু উপদেশ দান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

আনোয়ারা বিনীতভাবে কহিল, "আমি মূঢ়মতি অবলা, নামাজ-রোজার মহদ্দেশ্য ও উপকারিতা আপনাদিগকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই; তবে তিনি এতদ্সম্বন্ধে দাসিকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং আমি রোজনামচায় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহা আরও কিছু আপনাদিগকে শুনাইতেছি। তিনি (স্বামী) বলেন, "আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমাদিগকে সর্বদা বহির্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, এজন্য আমাদিগের অনেক সময় নামাজ-রোজা কাজা হইয়া যায়, কিন্তু তোমাদের সে সকল অসুবিধা নাই। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত (এই পর্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা জিভ কাটিল) তোমরা নিশ্চিন্তে নামাজ-রোজা করিতে পার। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য। খোদার প্রতি ভক্তি থাকিলে নামাজ-রোজা করা আমাদের পক্ষেই সুবিধাজনক। তিনি বলেন, নামাজ-রোজা আমাদের ইহ-পরকালের সার-সম্বল; যে সকল স্ত্রী-পুরুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমত পড়েন, পাপের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ও ভয় থাকে। সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত সুখ-শান্তির অধিকারী হন। আবার মৃত্যুর পর যখন অন্ধকার কবরে গমন করেন, তখন নামাজ সে অন্ধকারে তাঁহাদের আলোকস্বরূপ হয়। হযরত রসুল বলিয়াছেন, "নামাজ ধর্মের শোভন স্তম্ভ। যে স্ত্রী-পুরুষ এমন নামাজকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, নামাজ গৃহদ্বার সম্মুখে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর ন্যায়। তুমি প্রত্যহ পাঁচবার সেই নদীতে

অবগাহন কর,দেখিবে তোমার দেহের পাপ-দেহের ময়লা ধৌত হইয়া গিয়াছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা কহিল, "নামাজের আর একটি অবস্থা আছে তাহা বড়ই কঠিন। আমি তাহার মুখে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি, ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" ডেপুটি-পত্নী কহিলেন, "যত কঠিন হউক না কেন আপনি বলুন ; আমরা কি এতই অশিক্ষিতা যে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিব না ?" আনোয়ারা তখন রোজনামচার পাতা উল্টাইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রকৃত নামাজি দুনিয়ার খেয়াল ভুলিয়া মিনতি ও দীনতা লইয়া নামাজে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে খোদাতায়ালার সহিত তাঁহার এক দুশ্ছেদ্য স্মরণসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। বিবি আয়েশা বলিয়াছেন,'নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, হজরত আমাকে,আমি হজরতকে চিনিতে পারিতাম না। খোদাতায়ালার ভয় ও সম্মানে আমাদের চেহারা বদলাইয়া যাইত।' নামাজের সময় হজরত ইব্রাহিম ও হজরত রসুলের পাক দেহমধ্যে এক প্রকার শন্ শন্ শব্দ উত্থিত হইত। জগতে অদ্বিতীয় বীর হজরত আলী নামাজের সময় থর থর করিয়া কাঁপিতেন। খোদাতায়ালাকে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে প্রকৃত নামাজির দেলের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। সংসারের মায়া-মোহের মলিনতা হৃদয় হইতে সহজে উঠে না, নামাজের এই অবস্থার পর, তাহা পরিষ্কার ভাবে উঠিয়া যায়। তখন তিনি দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছচিত্ত হইয়া নিজেকে ভুলিয়া নিরঞ্জন দর্শনলাভে তাহাকে অবিশ্রান্তভাবে ডাকিতে থাকেন। আমটি যখন গাছে ধীরে ধীরে পাকিয়া উঠে,তখন তাহা যেমন স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হয়, তেমনই খোদাতায়ালাকে ডাকিতে ডাকিতে নামাজীর মনে এক প্রকার অদ্ভুত রসভাবের সঞ্চার হয়। এই রসভাবের নাম প্রেম। দুনিয়ায় এই প্রেমের তুলনা নাই। জ্ঞানবলে এ প্রেমের লাভ হয় না। ঈগল পক্ষীর ন্যায় উড়িতে যাইয়া কচ্ছপ যেমন পাহাড়ে পড়িয়া চুরমার হইয়াছিল, এই স্বর্গীয় প্রেমের নিকট জ্ঞানের গর্ব সেইরূপ খর্ব হইয়া যায়। জ্ঞান বিরোধের সৃষ্টি-কর্তা, প্রেম মিলনের নেতা। জ্ঞান বাইবেল-কোরানে বিরোধ বাধাইয়া তোলে প্রেম মাতব্বরী করিয়া সকলের কলহ পানি করিয়া দেয়। বস্তুতঃ প্রেম সংসারে সমস্ত বিপরিতের সমন্বয়বিধাতা। ইহার নিকট সব সমান, কোন কিছুরই ভেদা-ভেদ নাই। প্রেম পূর্ণরূপে নির্মল, পূর্ণরূপে পবিত্র, পরিপূর্ণরূপে সরল।

'নামাজী দিন দিন নামাজরূপ হাপরে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস-বাসনা ভস্মদাৎ করিয়া তবে এ হেন প্রেমরত্ন লাভ করিতে ক্ষমতা লাভ করেন। এই অমূল্য রত্ন

লাভের প্রথমাবস্থায় নামাজীর মন দিনরাত প্রেমময় খোদাতায়ালার ধ্যানে ডুবিয়া থাকে, অন্য কোন দিকে তাঁর মন যায় না। কেবল ধ্যানই তিনি সুখকর বলিয়া বোধ করেন। এই অবস্থায় তাঁহার ধ্যানের উপর ধ্যেয় পদার্থ ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে অর্থাৎ যে খোদাকে স্মরণ করা হয়, সেই খোদাই তখন নামাজীর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। সেখানে তখন অন্য কিছুরই প্রবেশ স্থান থাকে না। প্রেমের প্রাবল্যে প্রেমিক এইরূপে আপনাকে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দেন। তাঁহার দৈহিক অনুভূতি অন্তর্হিত হয়। বিশ্ব-সংসারে অন্য সমস্ত পদার্থ তাঁহার অস্তিত্বের বাহিরে চলিয়া যায়। তখন যাঁহার জন্য এত সাধনা, এত ধ্যান-ধারণা, এত উপবাস অনিদ্রা, সেই প্রেমাধার খোদা, প্রেমিকের দর্শন-পথে প্রকট মূর্তিতে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রেমিক তখন বিশ্বময় এক খোদা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। তখন তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠেন, অহো! কি সৌভাগ্য! অহো কি আনন্দ! খোদা, তুমি ছাড়া যে আর কিছুই নাই, কিছুই দেখিতেছি না। কি শান্তি! কি সুখ!

এই পর্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা ভদ্রমহিলাগণের মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জিত হইল। সে দেখিল, তাঁহারা তাহার মুখের প্রতি নির্বাক নিস্পন্দ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের সকলেরই জজবার ভাব উপস্থিত।

এই সময় হামিদা আসিয়া কহিল, "গরীবের নিমক-পানি তৈয়ার।"

ডেপুটি-পত্নী ধ্যান ভাঙ্গিয়া কহিলেন, "আমরা শরাবন তহুরা পানে আত্মহারা।"

এই সময় ডেপুটি-পত্নী হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া সসম্মানে আনোয়ারার হস্ত-ধারণ করিলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার সম্মুখে এতক্ষণ চেয়ারে বসিয়া ছিলাম, বেয়াদবী মাফ করিবেন।" আনোয়ারা লজ্জিতভাবে কহিল, "আমি সামান্যা নারী, আমাকে ওরূপ কথা বলিয়া আপনি লজ্জা দিবেন না।" জমিদার-গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "মা আমাদের অসার বাসরে লজ্জা ব্যতীত এমন কোন সার সম্পদ নাই—যাহা দিয়া তোমার এই অমূল্য উপদেশ দানের প্রতিদান করি।

ডেপুটি-পত্নী। তাহা, যাহাই হোক, এক্ষণে আপনি রোজার সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া আমাদিগকে সুখী করুণ।

আনো। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রোজার এত মহাত্ম্য কেন? তিনি বলিলেন, মাসের নামেই রোজার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। রমজান শব্দের অর্থ দগ্ধ হওয়া অর্থাৎ মানুষের পাপরাশি এই মাসে দগ্ধ হইয়া যায়। চাতক চাতকী

যেমন বৈশাখের নূতন মেঘের পানি-পান'শায় আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, খোদাভক্ত মুসলমান নর-নারী সেইরূপ রমজান মাসের আশায় চাঁদের তারিখ গণিতে থাকেন। হজরত রসুলও রমজান মাসকে নিজস্ব মাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উপবাসে পাপ নাশ হয় কিরূপে? তিনি তখন হাদীস হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। দৃষ্টান্তটি এই :—

'আল্লাহতায়ালা নফছ-আম্মারকে সৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তুমি কে? আমি কে? সে অসঙ্কোচে উত্তর দিয়াছিল,—'আমি আমি' 'তুমি তুমি'! তখন তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হয়। বহুদিন পর তাহাকে দোজখ হইতে তুলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করা হয় 'তুমি কে? আমি কে? তখনও সে এইরূপ উত্তর দান করে। শেষে তাহাকে ক্রমান্বয়ে ক্রমাধিক ক্লেশজনক সাতটি দোজখে রাখা হয়, কিন্তু সে কিছুতেই খোদাতায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করে না। পরিশেষে তাহাকে অনাহার-ক্লেশের দোজখে আবদ্ধ করা হয়; তখন সে ক্রমশঃ হীনবল হইয়া বিনীতভাবে বলে, হে সর্বশক্তিমান খোদা। তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি রক্ষাকর্তা, তুমি পালনকর্তা। আমি তোমারই সৃষ্ট নগণ্য কীটানুকীট। 'ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, প্রবৃত্তি দমনের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে উপবাস যেমন, এমন আর একটিও নহে। এই প্রবৃত্তি দমনকারী ব্রতের নাম—রোজা। মানুষ প্রবৃত্তিবশে অদম্য পশু, নামাজ তাহাদের লাগাম, রোজা চাবুকস্বরূপ।

এক্ষণে, আমি আপনাদিগকে শেষ একটি কথা বলিতেছি, মনে রাখিবেন—আমরা অবলা, দুনিয়ায় আমাদের যদি সুখ-শান্তি থাকে, তবে তাহা নামাজ-রোজা ও পতিভক্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আপনাদের দোওয়ায় আমি নামাজের প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি।

এই সময় হামিদা পুনরায় আসিয়া কহিল, "আমার এই সই আপনাদিগকে যাদু করিয়াছে নাকি?"

ডেপুটি-পত্নী। তাহারও উপরে।

দারোগা-স্ত্রী। যাদু অস্থায়ী, কিন্তু আপনার সইয়ের যাদুপনা আমাদের দেলে বসিয়া গেল।

অতঃপর সকলে উঠিয়া আহারার্থে গমন করিলেন। রাত্রিতে শয়নকালে ডেপুটি-পত্নী তাঁহার দাসীকে কহিলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাকে জাগাইয়া দিও ফজরের নামাজ পড়িতে হইবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহবাদ আনোয়ারা রতনদিয়ায় রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইল। সে পতির ঋণশোধের জন্য যে সকল অলঙ্কার সয়ার হাতে দিয়াছিল, তাহা এবং নবার স্ত্রীর নিকট বিক্রিত, পরে ঘটনাচক্রে জজকোর্ট হইতে ফেরতপ্রাপ্ত সেই নীলাম্বরী ও বেনারসী শাড়ী হামিদা সই-এর সম্মুখে উপস্থিত করিল। আনোয়ারা দেখিয়া কহিল, "সই, একি। এ সকল যে ঋণশোধের জন্য দেওয়া হইয়াছিল?" হামিদা স্মিতমুখে বিলোল কটাক্ষে কহিল, "আমি অতশত জানি না—তোমার সয়া কহিলেন, মৃতসঞ্জীবনী বৈষ্ণবী ব্রতের সময় কোন উপঢৌকনাদি দিবার সুযোগ পাই নাই। এক্ষণে এই সকল বস্ত্রালঙ্কারগুলি উপায়নস্বরূপ তাঁহাকে দিয়া দাও।" আনোয়ারার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হামিদা নিজদিগের দেওয়া নূতন একখানি মূল্যবান শাড়ী সইকে পরিধান করিতে দিয়া,অলঙ্কারগুলি যা যেখানে সাজে নিজ হস্তে পরাইয়া দিল। অবশিষ্ট বস্ত্রালঙ্কার একটি বাক্স পুরিয়া তাহার সঙ্গে দিল। আনোয়ারা খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া তিনটি আকবরী মোহর তাহার হাতে দিল। অনন্তর সোহাগভরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া পাল্কীতে উঠিল।

আনোয়ারা রতনদিয়ায় আসিবার এক সপ্তাহ পর, ডাকপিয়ন তাহার নামে একটি বাক্স পার্শেল বিলি করিল। খুলিয়া দেখা গেল সুন্দর একটি মূল্যবান বাক্সের ভিতর সোনার জেলদ্ করা একটি কোরান শরীফ ও বিচিত্র কারুকার্যখচিত একখানি জায়নামাজ। প্রত্যেক পদার্থেরই গায়ে লেখা আছে—"প্রীতি উপহার" নুরল এসলাম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"পার্শেলের পৃষ্ঠে তোমার নাম, জিনিসের গায়ে 'প্রীতি উপহার' ব্যাপারখানা কি?"

আনোয়ারা ক্ষীরোৎসবে সমাগত ভদ্রমহিলাগণকে নামাজ-রোজা সম্বন্ধে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিল, তৎসমস্ত কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিল।

নুরল। চন্দ্রের সুধাময় কিরণে যেমন ভুবন আলোকিত হয়, তোমার গুণ ও মাহাত্ম্যে দেখিতেছি তেমনি নারীজাতির হৃদয় ধর্মালোকে আলোকিত হইতে চলিয়াছে।

আনো। চন্দ্রের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু সূর্যকিরণ সংযোগে ঐ রূপ প্রভাময় হইয়া থাকে।

নূরল। তথাপি সুধাংশুর সুধামাখা জ্যোতি—বিরহসন্তাপনাশিনী ও প্রাণতোষিণী।

আনোয়ারা প্রেমকোপে স্বামীর গা টিপিয়া দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নুরল এসলাম অনেকদিন পাট-অফিসে চাকরী করিয়া পাটের কারবারে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত ব্যবসায়ে সত্বর লাভবান হইতে লাগিলেন। উকিল সাহেব লাভ দেখিয়া এককালে সাত হাজার টাকা দোস্তের কারবারে নিয়োগ করিলেন। তাহাতে নুরল এসলামের মূলধন ১৭।৮ হাজার টাকা হইল। ব্যবসায়ে মূলধন যত বেশী হইবে, লাভও সেই অনুপাতে পড়িবে। ১৭।১৮ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতার বড় বড় মহাজনদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া নুরল এসলাম লক্ষাধিক টাকার ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। এতদ্দেশে পাট ব্যবসায়ের পূর্ণ উন্নতির সময় নুরল এস্‌লাম এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। সততায়, অভিজ্ঞতায় ও ব্যবসায়ের কল্যাণে তিনি ২।৩ বৎসরে স্বয়ং লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন।

অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে সুখ-সন্তোষ উপযাচক হইয়া অদৃষ্টবানের দ্বারস্থ হয়। এই সময় নুরল এস্‌লামের পত্নী অন্তঃসত্তা হইলেন। অনন্তর সাত মাসের সময় সে স্বামীর আদেশ লইয়া মধুপুরে গেল।

আষাঢ় মাসে নূতন পাটের মরশুম আসিল। নুরল এসলাম বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশের ভাল পাট জন্মিবার স্থানগুলি পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; যথাসময়ে ক্রেতা ও দালাল পাঠাইয়া তত্তাবৎ স্থানের পাট খরিদ করিয়া আনিলেন। শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে সাতাইশ শত মণ পাট কলিকাতায় চালান দিলেন। বিক্রয়াস্তে আড়াই হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইল। কলিকাতার মহাজন বেরামপুর আড়তে সমস্ত টাকার বরাত পাঠাইলেন। নুরল এস্‌লাম টাকার জন্য বেরামপুর কর্মচারী না পাঠাইয়া, চারদাঁড়ী পান্সী লইয়া স্বয়ং যাত্রা করিলেন। তাঁর ইচ্ছা, আসিবার সময় মধুপুরে স্ত্রীকে দেখিয়া আসিবেন বেরামপুর হইতে মধুপুর দশ মাইল মাত্র পশ্চিমে।

নুরল এস্‌লাম বেরামপুর আসিয়া বরাতি রোকা আড়তে দাখিল করিলেন। চব্বিশ হাজার চারিশত টাকার বরাতি ছিল। নুরল এস্‌লাম নগদ চৌদ্দ হাজার টাকা ও অবশিষ্ট টাকার নোট লইলেন। চৌদ্দ হাজারে চৌদ্দ তোড়া টাকা

হইল। নুরল এসলাম সন্ধ্যার পূর্বে টাকা লইয়া মধুপুরে আসিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিলে তিনি অবতরণ করিয়া বাহির বাড়ীতে কাহাকেও না দেখিয়া একছার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নুরল এসলামকে দেখিয়া দাসীরা "সন্দেশ, সন্দেশ" রবে আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। একজন বয়স্কা দাসী "চাঁদ দেখুন" বলিয়া তখনই নুরল এসলামের আচকানের প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে সূতিকাগৃহের সম্মুখে হাজির করিল। নুরল এস্লাম দেখিলেন, শিশু সূতিকাগৃহ আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছে। দেখিয়া, নুরল এস্লামের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি অতঃপর অন্তঃপুরের সকলকে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিয়া বহির্বাটিতে আসিলেন। এই সময় পকেটে হাত দিয়া নোটের তোড়া দেখিয়া, দেওয়ানের দস্তখতি প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ যাহা কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে, তাহার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি পকেট খুঁজিয়া দেখিলেন রসিদ নাই। নৌকায় উঠিয়া বাক্স প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, রসিদ আর পাওয়া গেল না। তখন মনে হইল বেরামপুরে দেওয়ান গদিতেই রসিদ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে টাকার তোড়াগুলি বাড়ীর উপর নামাইয়া রাখিয়া মাল্লাগণকে রসিদ আনিতে বেরামপুরে পাঠাইলেন।

যাইবার সময় নৌকার মাঝি কহিল, "হুজুর উজান পানি, আজ ফিরিয়া আসা যাইবে না। কাল এক প্রহরে আসিয়া পৌছিব।

নুরল এস্লাম টাকার তোড়াগুলি তাঁহার শ্বশুরের শয়নঘরে হেফাজতে রাখিতে শাশুড়ীর নিকট দিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভূঞা সাহেব কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিলেন। জামাতাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করার পর কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রিতে যথাসময়ে সকলের আহার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ভূঞা সাহেবের কৃষাণ চাকর গুলিসকলেই তাঁহার প্রতিবাসী। এজন্য সকলেই রাত্রিতে বাড়ী যায়। কেবল পালাক্রমে প্রহরীরূপে একজন চাকর তাঁহার বাহির বাড়ীর গোলা-ঘরে শয়ন করে। শ্রীশ্রাতিশয্যে নুরল এস্‌লাম বহির্বাটী বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ভূঞা সাহেব শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে সারি দেওয়া চৌদ্দটি তোড়া দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলিতে কি? কোথা হইতে আসিল?" স্ত্রী স্বামীর মুখের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া কহিল "খুলিয়া দেখ না?" ভূঞা সাহেব একটি তোড়া হাতড়াইয়া কহিলেন, "এ টাকা কে দিল?" স্ত্রী পুনরায় মর্মস্পর্শী কটাক্ষ নিক্ষেপে কহিল, "খোদায় দিয়াছে, জামাই আনিয়াছে।" ভূঞা সাহেব তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া পান চাহিয়া শয়ন খাটে উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভূঞা সাহেবের শয়ন-ঘরে বাতি জ্বলিতেছে। কৃপণের ঘরে এত রাত্রি পর্যন্ত আলো। প্রৌঢ়াতীত ভূঞা সাহেবের স্ত্রৈণ জীবনের আরাম-দায়িনী, সুখ-সন্তোষ-বিধায়িনী, ধর্মসহচারী, কর্মবিধাতৃ, আজ্ঞাপ্রদায়িনী, প্রেমময়ী প্রাণাধিকা পত্নী গোলাপজান অতি সন্তর্পণে তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকাগুলি মেঝেতে ঢালিতে লাগিল। এক দুই করিয়া পাঁচ তোড়া ঢালা হইল। এক গাদা টাকা! তদুপরি আরো দুই তোড়া ঢালিল। স্তূপাকার রজতমুদ্রার ধবল চাকচিক্য প্রদীপালোকে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হায়রে রৌপ্য চাকতি! সাধু বলেন, "তুমি হারামের হাড্ডি।" বহুদর্শী বলেন, "তুমি সর্বগুণিনাশিনী শয়তানের জননী। পৃথিবীর যাবতীয় অনিষ্টের মূলেই তুমি। কারুণ, নমরুদ, শাদ্দাদ, হামান ও ফেরাউন শ্রেণীর লোকের কার্যকলাপ ভাবিলে তোমাকে বাস্তবিক পিশাচের প্রসূতি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তোমার এত দোষ, তুমি এত নীচ, তথাপি নরনারী তোমার মায়ায় এত মুগ্ধ। তোমার মোহমদে

মানুষের হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়। ধর্মবুদ্ধি সুদূরে পলায়ন করে। হায়! মানুষ যখন তোমার মোহনরূপে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন অতি ভীষণ দুষ্কার্যও সুসঙ্গত মনে করে এবং পরিণাম চিন্তায় অন্ধ হইয়া তৎসম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হয়।'

রাশিকৃত রৌপ্যখণ্ড দীপালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। গোলাপজান একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া আছে। এত মুদ্রা এক সঙ্গে সে কখনও দেখে নাই, আজ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে! ইহা ছাড়া আরও এত টাকা পাশেই তোড়াবন্দী রহিয়াছে। সবগুলি টাকা সে নিজস্ব করিয়া লইয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিতেছে। হায়! উদ্দাম-প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সে আর সাধের সঙ্কল্প চাপিয়া রাখিতে পারিল না। প্রকাশ্যে পতিকে কহিল, "এ টাকাগুলি রাখা যায় না?" পতি চমকিয়া উঠিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি বল কি? তোমার কথা ত, বুঝিতেছি না।" গোলাপজান এবার স্ত্রৈণ পতির মুখপাখিতে ভুবন-ভুলান সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিল, কামিনী কটাক্ষ দামিনীর প্রকৃতিসম্পন্ন। তাই কবি বলিয়াছেন—

"যে বিদ্যুচ্ছটা রমে আঁখি,
মরে নর তাহার পরশে।"

স্ত্রৈণ পতির মাথা ঘুরিয়া গেল। গোলাপজান শরসন্ধান সার্থক মনে করিয়া পুনরায় কহিল, "আমি টাকাগুলি নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাই।" রৌপ্য-সুন্দরীর মোহিনী মায়ায় পতিও তখন অল্পে আল্পে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "জামাতা বিশ্বাস করিয়া যে টাকা দিয়াছে, তাহা তুমি কেমন করিয়া রাখিবে? গোলাপজান কোপ-কটাক্ষে কহিল, "তুমি নামে মরদ, কিন্তু আসলে"—স্ত্রীর তীব্র বিদ্রূপে স্ত্রীগতপ্রাণ পতির মনুষ্যত্ব দুর্বল হইয়া পাশবত্ব বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি মোহান্ধ হইয়া কহিলেন, "টাকা কি উপায়ে রাখিতে চাও?" গোলাপজান বাক্স হইতে এক সুবৃহৎ ছুরি বাহির করিয়া পতিকে দেখাইল। পতির প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু গোলাপজান অসঙ্কোচে ছুরির ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছুরির মুখে কিছু মরিচা ধরিয়াছিল। গোলাপজান খাটের নীচ হইতে একটা নূতন পাতিল বাহির করিয়া তৎপৃষ্ঠে সাবধানে মরিচা তুলিতে লাগিল। মৃৎপাত্রের হৃদয় চিরিয়া চিড়্ চিড়্ কিড়্ কিড় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সাবধান, অতি সাবধান! তথাপি মৃৎপাত্র যেন মর্মভেদী করুণ আর্তনাদে গোলাপজানকে বলিতে লাগিল, ওহে সুন্দরী, তুমি কুসুম-কোমল স্নেহ-দয়ারূপা পুণ্যের জননী, নারীর পূত নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করিওনা।"

গোলাপজান তখন রৌপ্য চাকৃতির লোভে আত্মহারা ও অভিভূতা ; সুতরাং সে আর্তনাদের ভাবে তাহার পাষাণ-প্রাণ বিচলিত হইল না ; কিন্তু বিচলিত হইল তাঁহার চিরানুগত পতির প্রাণ, আর অত্যধিক বিচলিত হইল পাশের সুতিকা-গৃহের একটি নব-প্রসূতির অন্তরাত্মা ; প্রসূতি, ছুরি ধার দেওয়ার বিকট শব্দে জাগ্রতা হইয়া পৃথক শয্যায় নিদ্রাভিভূতা ধাত্রীকে নিঃশব্দে জাগাইল এবং অবিলম্বে অবস্থা জানিতে তাহাকে পিতার ঘরের দিকে পাঠাইয়া দিল। আনোয়ারার সুতিকাগৃহ দক্ষিণদ্বারী ঘরের সম্মুখে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময় বিচলিত পতি, ভয়াতুর ভাষায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছুরি দিয়া কি করিবে ?" পিশাচী পতির পরিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাধে কি তোমায় না-মরদ বলিয়াছি, এতক্ষণ বুঝ নাই ছুরি দিয়া কি করিব ? এই ছুরির সাহায্যে তোমাকে সবগুলি টাকা নিজস্বরূপে সিন্দুকে তুলিতে হইবে।" পতি কহিলেন, "সর্বনাশ ! আমা দ্বারা কিছুতেই এ কার্য হইবে না।" স্ত্রী ক্রোধভরে কহিল, 'হইবে যে না তাহা বুঝিয়াছি। আচ্ছা আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হও।" পতি কহিলেন, "আমি তাহাও পারিব না। তোমাকে এই ভীষণ কার্য করিতে নিষেধ করিতেছি। এ দুষ্কার্য অপ্রকাশ থাকিবে না। এই খুনের বদলে আমাদের উভয়কে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।" স্ত্রী বুক ফুলাইয়া কহিল, "আমি জাফর বিশ্বাসের কন্যা। আমার কথামত কাজ করিলে, ভুতেও জানিতে পারিবে না, তোমার গায়ে কাঁটার অঁাচড়ও লাগিবেনা।"পতি কহিলেন, "মেয়েটি চিরকালের মত দুঃখিনী হইবে।" স্ত্রী কহিল, "মেয়ে ত' ভারী সুখে আছে ! তার যত পুঁজিপাটা ছিল, কোন রাজার মেয়েরও অত থাকে না। মেয়ে সর্বস্ব সোয়ামীর পায়ে দিয়াও তাহার মন পায় নাই। এই ত' ছেলে হওয়ার পূর্বে নাকি জামাই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। আরও শুনিলাম, তোমার কুলিন জামাই সাহেব টাকা চুরি করিয়া জেল খাটিয়া আসিল। বেহায়া মেয়ে আবার তাহাকেই রক্ষা করিবার জন্য নিজের টাকা-গহনা তার দাদিমার সব পুঁজিপাটা দিল। উপরন্তু তুমিও অনটন সংসার হইতে ৩০০, ৪০০ টাকা দিলে। আবার মেয়ের দাদি মরার পর দাদির এতগুলি সোনা-রূপার গহনা নগদ টাকা-পয়সা দুষ্ট জামাই মেয়েকে ফুসলাইয়া বাড়ীতে পার করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপে আস্তে আস্তে তোমার গৃহস্থালী উজার করিবে। এই গুণের জামাই-মেয়ের জন্য তোমার মায়া ধরিয়াছে, তোমাকে আর বলিব কি ?" কৃপণ

পতি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, স্ত্রী যে সকল কথা বলিল, তাহার একটি কথাও মিথ্যা নয়। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশবত্ব পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল; মনুষ্যত্ব অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িল। স্ত্রী দেখিল, পতির মন খুবই নরম হইয়া আসিয়াছে। সে আবার বলিতে লাগিল, আজ যদি ফয়েজ উল্লার (আজিম উল্লার পুত্র) সহিত মেয়ের বিবাহ হইত, তবে মেয়ের ও তাহার দাদিমার হাজার হাজার টাকার গহনা ও নগদ টাকা-পয়সা রতনদিয়ায় যাইত না; সমস্তই শেষে তোমার হাতে পড়িত। ফয়েজের পিতা যত টাকা নগদ দিতে চাহিয়াছিল তাহাও তোমার হাতে থাকিত। তাছাড়া, ভাই হামেশা টাকা-পয়সা দিয়া তোমার উপকার করিত, কিন্তু এই জামাইয়ের গুণে তোমার সব আশাতেই ছাই পড়িয়াছে।" এই পতির দুর্বল মনুষ্যত্বটুকু একেবারে লোপ পাইল। স্ত্রী পতির মনের ভাব বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল, "আমি মনে করিয়াছি এই রাত্রেই এই আপদটাকে শেষ করিয়া টাকাগুলি সিন্দুকে তুলিব। ফয়েজ উল্লার বউ মরিয়াছে, তোমার বিধবা মেয়েকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমাদের চির আশা পূর্ণ করিব। মেয়েও সুখে থাকিবে, তুমিও এই টাকায় চিরকাল সুখে শুইয়া বসিয়াই কাটাতে পারিবে। এখন বুঝিয়া দেখ, আমি কেমন ফন্দি ঠাওরাইয়াছি।" এইবার পতি কহিলেন, "তুমি যাহা করিবে তাহার সাথী আছি।"

এদিকে ধাত্রী নব-প্রসূতির উপদেশে প্রসূতির পিতার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া জানালা পথে সমস্ত দেখিল, সমস্ত শুনিল; অতঃপর আতুর ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রসূতিকে সমস্ত কহিল। শুনিয়া প্রসূতি হতবুদ্ধি হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ মাস। বর্ষা পূর্ণযৌবনা। সর্বত্র পানি থৈ থৈ করিতেছে। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর পূর্বপার্শ্বের গলি দিয়া স্রোত পূর্ণবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। সম্মুখে অমানিশীথিনী। জীব-কোলাহল মুখরিত মেদিনী সুষুপ্ত। রাত্রি নিঝুম। অনন্ত নীলাকাশের অগণিত প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি নিবিড় অন্ধকার বিশ্বগ্রাস করিতে ছাড়ে নাই। ভূঞা সাহেবের বাড়ীর উপরই যেন আজ তামসরাজের প্রকোপ বেশী। এই সময় গোলাপজান পতিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অগ্রে বদ্ধপরিকর-বাসনা আততায়িনী পাপীয়সী ;—হস্তে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল অসি, পশ্চাতে কিঙ্করসম স্ত্রৈণ পতি ;—হস্তে দড়ি, কলসী ও ছালা। যেন করাল কৃতান্তরূপিনী দানবীর পশ্চাতে মন্ত্রমুগ্ধদৈত্য।

পিশাচ-দম্পতি প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই আনোয়ারা সভয়ে সূতিকাগৃহের প্রদীপ নির্বাপণ করিয়া দিল। তখন সহসা ভীষণ অন্ধকার যেন গোলাপজানের গতিপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। আবার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বজ্রগম্ভীরে যেন শব্দ হইল—বিশ্বাসঘাতিনী, ডাকিনী, দস্যু-দুহিতে। সামান্য অর্থের লোভে, অহেতুকী হিংসার বসে, এ সময় কোথায় চলিয়াছিস ? পাপীয়সী ! ঐ দ্যাখ, তোর পাপানুষ্ঠান দর্শনে উর্ধ্বাকাশে ফেরেশ্‌তাগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনও নিরস্ত হও। এখনও পাপ আশা ত্যাগ কর। গোলাপজান ক্ষণকাল নিমিত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্তে আকাশপানে চাহিল, পরক্ষণে আবার সম্মুখদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, বাসনার বিচিত্র যবনিকা তাহার সম্মুখে প্রতিভাত। তখন সে ভবিষ্যৎ ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, বিনা চেষ্টায় চৌদ্দ তোড়া টাকা ঘরে আসিয়াছে ; সঙ্কল্প সিদ্ধির পর আবার চক্ষুঃশূল সতীন-কন্যাকে ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ করিয়া ভ্রাতার নিরাশায় আশাবারি সিঞ্চন করিতে পারিতেছি। পিত্রালয়ে যাইয়া, এ বাড়ীতে বসিয়া তখন আদেশে তিরস্কারে সতীন কন্যার রূপের বাহার খর্ব করিতে পারিতেছি। অহো ! এমন সুযোগে এত সুখ, এত সৌভাগ্য !

গোলাপজান প্রফুল্লচিত্তে পতি সঙ্গে বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল। বহির্বাটীতে আসিয়া সে সাবধানে চতুর্দিকে দেখিয়া লইল। শেষে অনুচ্চভাবে স্বামীর সহিত অনেক বাদানুবাদ করিল। পরে স্থির হইল পতি মাথার দিক্ চাপিয়া ধরিবে, সে গলা কাটিবে। তখন ধীরে নিঃশব্দে দম্পতি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। গৃহ অন্ধকার। গ্রীষ্মাতিশয্যে জামাতা প্রদীপ নির্বাণ করিয়া শয়ন করিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলাপজান থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাতের অস্ত্র হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। সে অবসন্ন-দেহে বসিয়া পড়িল।

পতি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "বসিলে কেন?"

স্ত্রী। আমার হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছে, বুকের মধ্যে ভয়ানক ব্যথা লাগিতেছে।

পতি। আমি ত' প্রথমেই নিষেধ করিয়াছিলাম, দেখ আমারও গা কাঁপিতেছে। আমি চলিলাম।

স্ত্রী। (অস্ফুটে) না, না, যাও কোথায়? এই উঠিতেছি। এই বলিয়া পাপিয়সী অদম্য বাসনাবলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরির বাঁট চাপিয়া ধরিল, পরে শয়ন-খাটের নিকট আসিয়া সম্মুখভাগ হাতড়াইয়া দেখিল কেহ নাই। শেষপ্রান্তে দেখিল, লোক আছে; পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তখন বিলম্বমাত্র না করিয়া একই সময়পতি মাথা ঠাসিয়া ধরিল,স্ত্রী সতীনকন্যা-জামাতার গলা কাটিয়া দুই ভাগ করিল। হায় ভবের লীলা! হায় দুনিয়া!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অতঃপর দ্বিখণ্ডিত লাশ ছালায় ভরিয়া কলসী সঙ্গে বাঁধিয়া স্রোতে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। গোলাপজান আলো জ্বালিয়া বৈঠকখানার রক্তাদি ধৌত করিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। স্বামী-স্ত্রী ঘরে আসিল। গোলাপজান ঘরে আসিয়া পুনরায় অবসন্নচিত্তে টাকার পার্শ্বে মেঝেতেই বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরাত্মায় ঘোর অশান্তির তুফান। ক্রমে সর্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম ছুটিল। সে নির্বাক হইয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে ক্রমশঃ ঝিমাইতে ঝিমাইতে টাকার পার্শ্বে তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল। ভূঞা সাহেব ম্রিয়মান হইয়া শয়নখাটে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু পাপের বিভীষিকা তন্দ্রাবস্থায় উভয়কে অস্থির করিয়া তুলিল।

গোলাপজান তন্দ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল,—তাহার সম্মুখে বিশাল আগ্নেয় দেশ। তাহাতে সারি সারি অত্যুচ্চ আগ্নেয়গিরি অসংখ্য আগ্নেয় গহ্বর, অসংখ্য জ্বালাময় উৎস, স্থানে স্থানে আগ্নেয় নদী। পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা যেন সহস্রগুণ তেজঃস্কর অগ্নি তাহাতে ধক্ ধক্ লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার ভীম গর্জনে ভয়াবহ হুহুঙ্কারে সেই ভয়াবহ সর্বভুক্ দেশ কম্পিত হইতেছে। আবার পাপিগণের অস্থিমজ্জা পুড়িয়া পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে তাহা হইতে অগ্নিময় ধূম্রপুঞ্জ মহাবেগে মহাগর্জনে উর্ধ্বগামী হইয়া সেই বহবায়তে অগ্নিরাজ্য সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কোন স্থানে রক্ষিগণ অসংখ্য নর-নারীর হস্তপদ বন্ধন করিয়া জ্বালাময় অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছে; আর তাহাদের পঞ্জরাস্থি-সমূহ উত্তপ্ত কটাক্ষে তপ্ত-তৈল ভর্জিত মৎস্যের ন্যায় পটপট চট পট রবে ফুটিয়া উঠিতেছে। কোন স্থানে নব-নবতিশিরা ফণিণী তীব্র হলাহল মুখে অসংখ্য নর-নারীর বক্ষঃস্থল পুনঃ পুনঃ দংশন করিতেছে। আগ্নেয় রাজ্যের এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে গোলাপজান থাকিয়া থাকিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে আরও দেখিতে লাগিল, কোন স্থানে বিশ্বদাহী হুতাশন-তেজে শত শত মানব-মানবীর দেহ হইতে সফেন ক্লেদাদি নির্গত হইতেছে; আর তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিতেছে, কি ভীষণ যাতনা! কি নিদারুণ পিপাসা! উঃ বুক ফাটিয়া গেল; এই যন্ত্রাণার উপর আবার তত্রত্য প্রহরীগণ, তাহাদের

পিপাসা শান্তির হলে উত্তপ্ত গলিত শবনির্যাস সেই হতভাগ্যদিগের মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া গোলাপজান আর স্থির থাকিতে পারিল না; চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার সে দেখিতে লাগিল, কোন স্থানে ভীমদর্শন রক্ষীগণ শত শত লোকের চক্ষুমধ্যে অগ্নিময় ত্রিধার লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া পেটের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেছে। কোন স্থানে শত শত লোকের আপাদমস্তক আগুনের বিনামা প্রহারে জর্জরিত করিতেছে। জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া জলন্ত লৌহশলাকায় প্রবিদ্ধ করিতেছে। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লোলিহান কুকুরের মুখে ফেলিয়া দিতেছে। শেষে শতকোটি মণ ভারী আগ্নেয়-প্রস্তর বুকে চাপা দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এই সকল ভয়াবহ নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া গোলাপজান একান্ত ভীত চিত্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়! আমি কোথায়? আমি এখানে কেন?" তখন জনৈক ভীমদর্শন নরকপাল, তাহার সন্নিহিত হইয়া সক্রোধে কহিল, 'পাপিয়সী! এইত' তোর উপযুক্ত স্থান। তুই অবলা হইয়া আজ যে কার্য করিলি, এমন দুষ্কার্য দুনিয়ায় কেহ করে না। হায়! তোর মহাপাপে আজ খোদাতায়ালার আরশ পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছে। তোর নারীজন্মে শতধিক্! বিশ্বাসঘাতিনী, পরানষ্টে, আত্ম-বিনাশিনী, ঐ স্থান তোর চির বাসস্থান।" গোলাপজান সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আরও শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল সর্বাপেক্ষা গভীরতম গভীর এক প্রজলিত অগ্নিকুণ্ড। উষ্ণতার আতিশয্যে তাহার অগ্নি নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং লোলশিখা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। নরক-পাল গোলাপজানের গলদেশে অগ্নিময় পাশ সংলগ্নকরত: টানিয়া লইয়া সে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। সে তখন উচ্চ চীৎকারে জাগিয়া উঠিল।

এই সময় ভূঞা সাহেবও তন্দ্রাবস্থায় ধীরে উচ্চরবে বলিতেছিলেন, "হায় কি করিলাম,—পাপী, পাপ ধনে, প্রাণে বিনষ্ট হইলাম। ডাকিনী, পিশাচী তোর রূপে পাপ! ডাকাতের মেয়ে, বিবাহ চাই না, দূরহ দূরহ! (শয়নখট্টায় পদপ্রহার।)

গোলাপজান জাগ্রত হইয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি যেরূপ ভয়ানক খোয়াব দেখিলাম; উনিও বুঝি সেইরূপ দেখিয়া বকাবকি করিতেছেন। খুন করিলে লোকে বুঝি ঐরূপ খোয়াবই প্রথম প্রথম দেখিয়া থাকে। তা' খোয়াব ত' মিছা। খোয়াবে কতদিন আকাশে উঠিয়াছি, সাগরে ডুবিয়াছি, বাঘের মুখে পড়িয়াছি, আগুনে জলিয়াছি, কিন্তু আজতক্ তার কোনটিই ফলে নাই, সব মিছা

হইয়াছে। ফলে, খোয়াব দেখা কিছুই নয়। মনের বিকারে ওসব হয়। এইরূপ বিতর্ক করিয়া সে মনে মনে সাহস সঞ্চার করিতে লাগিল। ভূঞা সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, "ওঃ কি সাংঘাতিক দুষ্কার্য! হায়, এ মহাপাপের মুক্তি নাই! ঐ যে পুলিশ—ফাঁসি—দ্বীপান্তর।" গোলাপজান তখন স্বামীর শরীরে ঠেলা দিয়া কহিল, "কি গো, ভূতে পাইয়াছে নাকি ?

ভূঞা। অ্যাঁ অ্যাঁ কি ?

গোলাপ। এতক্ষণ কি বকিতেছিলে ?

ভূঞা। কৈ ? কি ? না, না।

গোলাপজান ঘৃণার ভাবে কহিল, "তুমি পুরুষ হইয়াছিলে কেন ?" অতঃপর এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল।

ভূঞা সাহেব গ্রামের প্রধান ও পঞ্চায়েত। প্রাতঃকালে কার্যোপলক্ষে অনেক লোক ক্রমে তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিল। চৌকিদা'র ট্যাক্স আদায়ের সাড়া দেওয়ার হুকুম লইতে আসিল। ভূঞা সাহেব দারুণ অশান্তি-উৎকণ্ঠা হৃদয়ে চাপিয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। এই সময় গ্রামান্তর হইতে কতিপয় ভদ্রলোক প্রয়োজন বিশেষে নৌকাপথে তথায় উপস্থিত হইলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা কহিলেন, "আমরা আসিবার সময় আপনাদের গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটা লাশ দেখিয়া আসিলাম। একটি আমগাছের শিকড়ে আটকাইয়া আছে এবং ছালার ভিতর হইতে পা দেখা যাইতেছে। অল্প মরিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। থানায় সংবাদ দেওয়া উচিত।" শুনিয়া ভূঞা সাহেবের মুখ দিয়া ধুলা উড়িতে লাগিল। উপস্থিত গ্রামবাসীরা লাশ দেখিতে চৌকিদারসহ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

কিয়ৎকাল পর ছালায় ভরা সেই লাশ আনিয়া ভূঞা সাহেবের বাহির বাড়ীতে নামান হইল। খুলিয়া দেখা গেল, গোলাপজানের প্রাণাধিক পুত্র বাদশা। গোলাপজান যখন অন্তঃপুর হইতে শুনিল, কে যেন বাদশাকে খুন করিয়াছে; তখন সে কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ দ্রুতবেগে উন্মত্তার মত বহির্বাটিতে আসিয়া মৃত পুত্রের নিকট মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ভূঞা সাহেব কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন। শবের চতুর্দিকে সমবেত লোক সকল নীরব ওস্তম্ভিত। অনেকক্ষণ পর—ধীরে সভয়ে জনতা মধ্য হইতে শব্দ

হইল, "ওহ্! কি ভয়ানক খুন! কি নিদারুণ হত্যা! হায়! এমন সর্বনাশ কে করিল?" এমন সময় গোলাপজান চৈতন্য লাভ করিয়া উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিল, "সর্বনেশে জামাই আমার ছেলে খুন করিয়া পলাইয়াছে।" এই সময় নুরল এসলাম অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মাগো, আমি পলায়ন করি নাই, আপনার পুত্রও হত্যা করি নাই! টাকাই বুঝি এ কার্য করিয়াছে।" গোলাপজান ভীষণ বিকট কটাক্ষে নুরল এসলামের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও ভরানেশে, তুই এখনও বাঁচিয়া আসিছ? আর না, আমার সে ছুরি কৈ? তাই দিয়া তোকে এখনি ছেলের সাথী করিতেছি।"—এই বলিয়া পুত্রনাশিনী ক্ষিপ্তা রাক্ষসীর ন্যায় উন্মুক্তবেশে ছুরি আনিতে অন্দরে দিকে ছুটিল। তাহার গতিরোধে কেহই সাহসী হইল না। আলুলায়িত উন্মাদিনীর সর্বসংহারিণী মূর্তি দেখিয়া দাসীগণ অন্তঃপুরে চীৎকার করিয়া উঠিল! আনোয়ারা সূতিকাগৃহে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! পিশাচী ছুরির জন্য ঘরে উঠিতেই হামিদার পিতা পশ্চাদ্দিক হইতে যাইয়া ঝাপটিয়া ধরিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাদশা গোলাপজানের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, নবীন যুবক, স্কুলে পড়ে। এ সকল পাঠক অবগত আছেন। সে রোজ রাত্রিতে প্রতিবাসী, সমবয়সী ও সমপাঠি দানেশদিগের বড়ীতে পড়িতে যাইত, এবং রাত্রিতে সেইখানেই থাকিত। গতকল্য গিয়াছিল; কিন্তু অধিক রাত্রিতে দানেশদিগের বাড়ীতে কুটুম্ব আসার শয়নস্থানের অভাবে তাহারা রাত্রিতেই বাদশাকে রাখিয়া গিয়াছিল।

বাদশা দানেশদিগের বাড়ী হইতে অত রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া মা বাপের বিরক্তির ভয়ে নিঃশব্দে বৈঠকখানায় নুরল এসলামের অপর পাশে শয়ন করিয়াছিল।

ধাত্রী যাইয়া যখন নুরল এসলামের হত্যার আয়োজনের কথা আনোয়ারার নিকট বলিল, তখন আনোয়ারা প্রথমে ভীতচিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, শেষে ধাত্রীকোলে পুত্র রাখিয়া, অসীম সাহসে বাহির বাটীতে যাইয়া স্বামীকে নিঃশব্দে জাগরিত করিল, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আতুর ঘরে লইয়া আসিল। বাদশা যে নুরল এসলামের পাশে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল, তাহা নুরল এসলাম বা আনোয়ারা কেহই জানিতে পারে নাই। আনোয়ারা স্বামীকে সূতীকাগৃহে লইয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই গোলাপজান স্বামীসহ বহির্বাটীতে উপস্থিত হয়। যাহা হউক, অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারোগা আসিলেন, নুরল এসলামের জবানবন্দীতে সমস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল, অপ্রত্যাশিতরূপে পুত্র নিহত হওয়ায় গোলাপজান একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিত্তের সমস্ত শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় সেও সমস্ত দোষই স্বীকার করিল। লাশসহ আসামীদ্বয়কে মহকুমায় চালান দেওয়া হইল।

তথা হইতে তাহারা দায়রায় সোপর্দ হইল। জজ সাহেব বিচারান্তে হত্যাকারীদ্বয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। নুরল এসলাম যথাসময়ে টাকা ও নবপ্রসূত স্ত্রীসহ নিজালয়ে আসিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়ারিশসূত্রে অতঃপর আনোয়ারা সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। পিতার জোতের মূল্য বিশ হাজার ও অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য পাঁচ হাজার, মোট পচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি পাইয়া আনোয়ারা তাহা তাহার স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিল।

হত্যাকাণ্ডের গোলযোগে নুরল এসলামের পাটের ব্যবসায়ের অনেকটা ক্ষতি হইয়াছিল। তথাপি আশ্বিনের শেষে হিসাবান্তে ষোল হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইল। পর বৎসর তিনি মরসুমের প্রথমেই কারবার আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। লাভও আশানুরূপ হইতে লাগিল। এইরূপে নুরল ইসলাম বাণিজ্য প্রাসাদাৎ অল্প সময় মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন দ্বিতল-সৌধরাজিতে শোভিত হইল। নুরল এসলামের অর্থ-সাহায্যে ও স্বজাতিপ্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্র লোকের শিক্ষার জন্য স্বগ্রামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আলতাফ হোসেন সাহেব পুত্রের জন্য যথাসর্বস্ব হারাইয়া সপরিবারে ভগিনীর আশ্রয় গ্রহন করিয়াছেন। বহু পোষ্য লইয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় ভগিনীর তালুকটুকু অল্প অল্প করিয়া ঋণে আবদ্ধ করতঃ পোষ্যগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগ্নীর দুরবস্থা চরমে উঠিল। মাতার সহিত বিবাদ করিয়া সালেহা কিছুদিন নুরল এসলামের বাড়ীতে ছিল; কিন্তু অভিমানিনী মাতা কন্যাকে শাসন করিয়া পরে বারীতে লইয়া যান। এখন তাঁহাদের কখন অর্ধাহারে কখন বা অনাহারে দিন যাইতে লাগিল। সালেহা সময় সময় বিশুষ্ক মুখে চুপে চুপে আনোয়ারার নিকট যায়। আনোয়ারা তাহাকে আদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয়। কাছে বসাইয়া নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথা বলে। সালেহার মায়ের খাওয়া-পরার কথা জিজ্ঞাসা করে, সরলা সালেহা মাতার অনাহার ও বস্ত্রকষ্টের কথা সব খুলিয়া বলে।

একদিন আনোয়ারা স্বামীকে কহিল, "আম্মাজানদিগের দিন চলে না, আল্লার ফজলে এখন তোমার স্বচ্ছল অবস্থা, এ সময় তাঁহাদিগকে সাহায্য না করা বড়ই অন্যায় হইতেছে।"

সন্তান হওয়ার পর, আনোয়ারা স্বামীকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নুরল। তুমি কিভাবে সাহায্য করিতে বল?

আনো। তাঁহাকে পুনরায় এই সংসারে আনিতে চাই।

নুরল। তিনি মানিনীর মেয়ে; আসিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

আনো। সংসারের সর্বস্ব তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় আসিতে পারেন।

নুরল। তুমি তাহাতে রাজী আছ?

আনো। একশ বার, হাজার হইলেও তিনি আমাদের পূজনীয়া। তাঁহার অন্নবস্ত্রে কষ্টের কথা শুনিয়া আমার বরদাস্ত হইতেছে না। আমি তাহার হাতে সংসার ছাড়িয়া দিয়া সর্বদা তাঁহার খেদমত করিব।

নুরল। আমি তোমার প্রস্তাবে সুখী ও সম্মত হইলাম।

অতঃপর আনোয়ারা একদিন রাত্রিকালে খোকাকে কোলে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে সালেহাদিগের আঙ্গনায় উপস্থিত হইল; সালেহার মা আনোয়ারাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কারণ, আনোয়ারা একজন রাজরাণীতুল্য। আর রাজরাণী না হইলেও ভিন্ন স্থানে পদার্পন তাহার পক্ষে অসম্ভব। সালেহা আনোয়ারাকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে লইয়া সোহাগ করিতে লাগিল। আনোয়ারার নিরভিমান সারল্যে সালেহা-জননীর বিজাতীয় কৌলিন্যাভিমান খর্ব হইয়া আসিতে লাগিল। আনোয়ারা শাশুড়ীর পদচুম্বন করিয়া কহিল, "আম্মাজান, আমার খোকাকে দোয়া করুন।" উন্নতশিরা ফনিনী যেমন ঔষধের গন্ধে নতমস্তক ও দুর্বল হইয়া পরে, আনোয়ারার অনুপম শিষ্টাচারে সালেহা-জননীর অন্তর সেইরূপ কোমল হইয়া আসিল। সালেহা তাহার মায়ের কোলে ছেলে দিল. মা সাগ্রহে ছেলেকে চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আনোয়ারা কহিল, "আম্মাজান, খোকা আপনাকে লইতে আসিয়াছে, আপনী আপনার বাড়ীতে চলুন।" অগ্নির উত্তাপে যেমন লৌহ দ্রবীভূত হয় এবার সালেহার মা সেইরূপ বিগলিত হইলেন। তিনি ভগ্নকণ্ঠে গদ্‌গদ্‌ভাবে

কহিলেন, "খোকার বাপ আমায় পৃথক করিয়া দিয়াছে।" আনোয়ারা দুঃখের স্বরে কহিল, "আম্মাজান, অমন কথা বলিবেন না। সংসার জুড়িয়াই এমন কিছু হয়; আপনি বাঁদীকে ফিরাইয়া দিবেন না।" অনুতাপে তখন সালেহা জননীর বিগলিত হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কি যেন ভাবিয়া কহিলেন' "আগামীকল্য খোকা আসিলেই আমি যাইব।"

পরদিন পুনরায় আনোয়ারা পুত্র কোলে করিয়া আসিয়া সালেহাসহ তাহার মাতাকে বাড়ীতে লইয়া গেল। অতঃপর আনোয়ারার স্বর্গীয় ব্যবহারে তাহার সৎ-শাশুড়ী আপন মায়ের অধিক হইয়া উঠিলেন। সুখ-শান্তিতে নুরল এসলামের সংসার আনন্দময় হইয়া উঠিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শীতকাল। দিবাকর দক্ষিণায়ণে দাঁড়াইয়া সহস্ররশ্মি-প্রভায় ভুবন আলোকিত করিয়াছে। রতনদিয়া গ্রামের একটি দ্বিতল অট্টালিকার নির্জন চত্বরে একজন যুবতী প্রাতঃস্নানান্তে সুমসৃণ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছে; একটি শিশু তাহার সম্মুখে সৌধদ্বারে দাঁড়াইয়া তুর্কী অশ্বে আরোহণ নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়াও চেষ্টায় বিরত হইতেছে না, যুবতী একদৃষ্টে শিশুর অশ্বক্রীড়া দেখিতেছে। এই সময় একখানি পত্র হস্তে একজন যুবক নীচের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই, যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া থামিয়া গেলেন এবং ঈষৎ অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর স্থলস্থিত ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি সোনার আলনায় সুধীর প্রভাত সমীরণে ইতস্ততঃ মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছিল। মেঘের কোলে ক্ষণপ্রভার অপরূপ শোভা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রামধনু কোলে স্থিরা সৌদামিনীর মোহন মাধুরী কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? যুবক অতৃপ্ত নয়নে যুবতীর এই অদৃষ্টপূর্ব ভুবন ভুলান রূপলাবণ্য দেখিতে লাগিলেন; হঠাৎ যুবতীর দৃষ্টি যুবকের উপর পতিত হইবামাত্র যুবতী সলাজ-সঙ্কোচে হাসিমুখে মাথায় ঘোমটা টানিয়া আসন হইতে উত্থিত হইল এবং কহিল, "এখন না আসিলে কি চলিত না?" যুবক অগ্রসর হইয়া সাহাস্যে কহিলেন, "এত সত্বর খোকাকে সব ভালোবাসা বিলাইয়া দিয়াছ?" খোকা যুবকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, "ছব বালা বিলাই দেছে।" যুবক-যুবতী হাসিতে লাগিলেন। শিশু তখন অশ্ব ত্যাগ করিয়া অস্ফুটন্ত কুসুমাননে পিতার কোলে উঠিতে ক্ষুদ্র বাহু দুইটি বিস্তার করিল, যুবক কহিলেন, "এস বাবা, আজ আমারও ভালবাসা সবটুকু তোমাকে দান করিয়া ফেলি।" এই বলিয়া তিনি শিশুকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

যুবতী। তোমার দান দেখিতেছি হজরত আবুবকরের দানের চেয়েও বড়; তিনি সর্বস্ব দান করিয়া একখানি কম্বল সম্বল রাখিয়াছিলেন; তুমি যে কিছুই রাখিতেছ না।

যুবক। তুমিও ত' কিছুই রাখ নাই।

যুবতী। কে বলিল রাখি নাই? আমার বাকী জেন্দেগীর নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, সমস্ত মজুত রাখিয়া বাকীটুকু বিলাইতেছি।

যুবক। মওজুতের প্রয়োজন?

যুবতী। নারীজন্মের কর্তব্যহেতু ও পরলোকের সম্বলার্থে।

যুবতী। কর্তব্য কিছুই বাকী রাখিয়াছ কি?

যুবতী। সমস্তই বাকী, দাসীর ওয়াশীলের ঘর শূন্য! বাকী পর্বত প্রমাণ অনন্তকালেও তাহার আদায় অসম্ভব।

যুবতীর চক্ষু ভক্তি-প্রেমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যুবক খোকাকে কোলে রাখিয়াই ঘর হইতে একখানি কুরসী টানিয়া আনিয়া যুবতীর সম্মুখে রৌদ্রে বসিলেন এবং তাহাকে তাহার আসনে বসিতে আদর করিলেন। ইত্যবসরে খোকা পিতার হস্ত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া আজরাইলের হাতে দিতে উদ্যত হইল।

যুবতী। খোকা যে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল দেখিতেছি, ওখানা চিঠি নাকি?

যুবতী। হাঁ, ঐ চিঠির কথাই ত তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

যুবতী। বল না।

যুবতী। বড় খুকীরা মসজিদ-মিলাদে আসিবে। কল্য ষ্টীমার-ঘাটে পাল্‌কী বেহারা রাখিতে বলিয়াছে, ছুটি পাইলে ডেপুটি সাহেবও আসিবেন।

যুবতী। শুনিয়া সুখী হইলাম। এখন স্ব-পতি ছোট খুকী আসিলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।

যুবক। ছোট খুকী বোধ হয় আসিতে পারিবে না। তাহার স্বামী জ্বরে কাতর হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

যুবতী। তিনি না এবার বি-এ পরীক্ষা দিবেন? তবে বুঝি পরীক্ষা দেওয়া ঘটে না।

যুবতী। তাই ত বোধ হইতেছে।

যুবতী। পরীক্ষা না দিতে পারুন—খোদার ফজলে সত্বর তিনি আরোগ্য-লাভ করিলে হয়। যেমন মেয়ে তেমনি জামাইটি হইয়াছে। মামুজান বাছিয়া বাছিয়া সৎপাত্রে ভাগ্নী দুইটি সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জামাই দুইটি যেন সাক্ষাৎ ফেরেশ্‌তা।

যুবক। ননদদের সতীন হইতে সাধ যায় নাকি?

যুবতী। (সহাস্যে) দুই ননদ দুইখানে,—যাইয়া সতীন হওয়া কঠিন; বরং তুমি সম্মত হইলে, তাহাদিগকে এখানে আনিয়া সতীন করিয়া লইতে পারি।

যুবক। তুমি এত মুখরা দুষ্ট হইলে কবে?

যুবতী। এ ত দুষ্টামির কথা নয়। ঢিলটি ছুঁড়িল পাটকেলটি খাইতে হয়।

যুবক। রক্ষা কর আর পাটকেল-টাটকেল ছুঁড়িও না। একটু অবজ্ঞার টিপা দিয়া জেলের গুতানি খাইয়া আসিয়াছি।

যুবতী। থাক, তোমার মিলাদের আয়োজন কতদূর?

যুবক। উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে নাকি?

যুবতী। সে কি কথা?

যুবক। মিলাদ আমার না তোমার?

যুবতী। যারই হোক, আয়োজন কতদূর?

যুবক। এত' শুধু মিলাদ নয়, রাজস্য় উৎসব; এ উৎসবের বিধিবন্দোবস্ত করা ক্ষুদ্র মাথায় কুলাইতেছে না।

যুবতী। মাথা খাটাইয়া ফর্দ করিয়াছ। এখন তদৃষ্টে বন্দোবস্ত করা বেশী কঠিন কি!

যুবক। এত মওলানা, মৌলবী সাহেবানের আনা-নেওয়া, দেশসুদ্ধ লোকের আহারাদির বন্দোবস্ত করা কি সহজ ব্যাপার?

যুবতী। আমার দাদিমা বলিয়াছিলেন, দাদা মিঞা মক্কা শরীফ যাইবার পূর্বে এক মণ হরিদ্রার আয়োজনে গরীব ভোজনের মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে হদ্দ ১০।১২ সের হরিদ্রা ব্যয় হইবে, এর বন্দোবস্তে অক্ষম হইতেছ? দাদিমার মুখে আরও শুনিয়াছি, ঈমানের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, দয়াময় আল্লাহতালা নিশ্চয় লোকের মকছেদ পুরা করিয়া থাকেন। আমি জানি সৎকার্যে খোদা সহায়।

যুবক। তোমাদের দাদি-নাতিনীর কথা অভ্রান্ত ও শিরোধার্য; দয়াময় খোদা এ পর্যন্ত আমার সব মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, তবে সে বাসনা ভিন্নরূপ।

যুবতী। ভিন্নরূপ কিরূপ?

যুবক। প্রথমে তোমাকে পাইবার বাসনা। দ্বিতীয় স্বাধীন-ব্যবসায়ে

জীবিকা-নির্বাহ করা, তৃতীয় তোমার চুল শুকানোর নিমিত্ত সোনার আলনা ও চাঁদীর কুর্সি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া।

যুবতী। চাঁদীর কুর্সি ত, পাই নাই?

যুবক। ফরমাইশ দিয়াছি।

যুবতী। কবে পাইব?

যুবক। মিলাদের দিন।

যুবক। চাঁদীর কুসির কথায় আমার একটি স্বপ্নের কথা মনে পড়িল।

যুবক। শুনিতে পাই না?

যুবক। মিলাদের দিন।

যুবতী। যেদিন রূপার কুর্সিতে বসিব সেইদিন বলিব।

যুবক। আমারও একটি কথা স্মরণ হইল।

যুবতী। (অধরে হাসি লইয়া) বলিবে না?

যুবক। (স্মিতমুখে) যেদিন তুমি স্বপ্নের কথা বলিবে সেদিন আমার কথাও শুনিতে পাইবে।

এই সময় খোকা পিতার কোলে থাকিয়া 'মা যাই, মা যাই' বলিয়া আবদার ধরিল। যুবতী চুল গোছাইয়া পুত্র কোলে লইল। যুবক পুত্রকে চুম্বনে পরিতুষ্ট করিয়া আগমনপথে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পর পুণ্যবতী আনোয়ারার কামনায় তাহাদের বহির্বাটীতে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক পরম রমণীয় প্রকাণ্ড মসজিদ নির্মিত হইল এবং সর্বসাধারণের পানির ক্লেশ নিবারণের জন্য মসজিদ সম্মুখে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হইল। আনোয়ারা গ্রামের মেয়েদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত অন্তঃপুর পার্শ্বে এক সুন্দর অট্টালিকায় বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ং তাহাতে শিক্ষা দিতে লাগিল।

মসজিদ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনোয়ারা সেই পুণ্যকার্যের স্মরণার্থে স্বামীর নিকট মিলাদ উৎসবের প্রস্তাব করিয়াছিল, নুরল এসলাম আহলাদসহকারে স্ত্রীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বোধ হয় তাহা পূর্ব-পরিচ্ছেদে যুবক-যুবতীর কথোপকথন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যথা সময়ে নুরল এসলামের বাড়ীতে মসজিদ মিলাদের ধুম পড়িয়া গেল। সে রাজসূয় উৎসবের বিবরণ লিখিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে আর বিরক্ত করিতে চাই না। তবে আপনারা জানিয়া রাখুন, আনোয়ারা এই ব্যাপারে ১০।১২ সের হরিদ্রা ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিল, তাহার স্থলে অর্ধমণ হরিদ্রা খরচ হইল। মিলাদ উৎসবে নুরল এসলাম ও আনোয়ারার যাবতীয় আত্মীয়স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। কেবল স্বামী কাতর থাকাবশতঃ নুরল এসলামের ছোট ভগিনী মজিদা আসিতে পারে নাই। এই উৎসবে পুরুষ মহলে উকিল সাহেব অন্দর মহলে হামিদা, সবব্যাপারের পরিপাটি বন্দোবস্ত করিতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রতনদিয়ার চতুষ্পার্শ্ব দশ বারো গ্রামের লোক, বেলগাঁও বন্দরের যাবতীয় হিন্দু-মুসলমান স্বয়ং জুটের ম্যানেজার সাহেব এই মহা মিলাদে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তদ্ব্যতীত রবাহুত, অনাহুত অগণিত লোক এই মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই চতুর্বিধ রসপূরিত ভোজ্য তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। দীনহীন কাঙ্গালদিগকে যথাযোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করা হইল। দান প্রাপ্ত ভোক্ত হর্ষবিহ্বলচিত্তে দলে দলে, 'ধন্য আনোয়ারা বিবি' 'ধন্য দেওয়ান সাহেব' রবে প্রতিধ্বনি তুলিয়া রতনদিয়া মুখরিত করিয়া তুলিল। মলয়ানিল-সংযোগে পুষ্পসৌরভের ন্যায় প্রেমশীল দম্পতির পুণ্যকাহিনী দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

মিলাদের দিন আনোয়ারা রজতাসন পাইয়াছে। মিলাদ শরিফ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায়, সে পরদিন স্নানান্তে দ্বিতল বাসগৃহের সেই নির্জন চত্বরে পরমানন্দে সেই রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় পূর্ববৎ চুল শুকাইতেছে। এমন সময় নুরল এসলাম তথায় আসিয়া কহিলেন, "রূপার খাটে ত' বসিয়াছ, এখন তোমার স্বপ্নের কথাটি শুনা যাক " আনোয়ারা সহাস্যে কহিল, "যদি নাছোড় হও তবে শুন।" নুরল একখানি আসন টানিয়া স্ত্রীর সম্মুখে বসিলেন।

আনোয়ারা বলিতে লাগিল, "অনেক দিনের কথা, ভালরূপে মনে নাই তবে যাহা মনে আছে তাহাই বলিতেছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি ক্ষুদ্র নদীরতীরে বসিয়া আছি। নদীর পরপারে নীলাকাশে চাঁদ উঠিয়া ক্রমে যেন আমারদিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছি, সহসা অদুরে বুলবুলের প্রাণ মাতানো সঙ্গীতের ন্যায় এক সুমধুর রব আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। স্থিরচিত্তে শুনিয়া বুঝিলাম কে যেন অদৃশ্যে থাকিয়া কোর-আন পাঠ করিতেছে। শেষে সেই স্বরে আবার এক বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, ইতিপূর্বে ওরূপ ভক্তিভাবপূর্ণ মোনাজাত ও কোর-আন পাঠ কোথাও কখনও শুনি নাই। তাই আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলাম "

স্ত্রীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া নৌকার সেই কোর-আন পাঠ ও মোনাজাতের কথা নুরল এসলামের স্মৃতিপথ রূঢ় হইল। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "কোরান পাঠ ও মোনাজাত যত সুন্দর না হউক, তোমার বর্ণনাটি কিন্তু পরম সুন্দর। উহা লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।"

আনো। তুমি যদি ঠাট্টা কর, তবে স্বপ্নের কথা আর বলব না।

নুরল। না, না, ঠাট্টা নয়, সত্য কথাই বলিতেছি।

নুরল প্রশান্ত সরল মুখে এই কথা কহিলেন। আনোয়ারা তখন বলিতে লাগিল, "কিয়ৎকাল পর আবার স্বপ্নাবেশেই দেখিলাম, একজন সুন্দর যুবক করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জিত হইয়া

উঠিয়া যেন পলায়ন করিলাম। অল্পকাল পরে দেখিলাম, কে যেন আমার হাত-পা বাঁধিয়া দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে; এই সময় আবার আকাশের গায়ে মেঘ সাজিল, ঝড়-তুফানে ক্রমে প্রলয়কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। মেঘের গর্জনে বিজুলীর চমকে জীবজন্তু সব অস্থির হইয়া উঠিল। সর্বত্র দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আবার সব থামিয়া গেল। শেষে দেখিলাম, এই,—' এই বলিয়া আনোয়ারা থামিয়া গেল।

নুরল। এই কি ?

আনো। (ভ্রূকুটি সহকারে) আরও ভাবিয়া বলিতে হইবে ?

নুরল। এমন স্বপ্ন কি আর ইশারা করিয়া বলিলে চলে ?

আনো। আমি দো-মহলা দালানে রূপার কুর্সিতে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছি। আর পূর্বে যে যুবককে দেখিয়া লজ্জায় পালাইতেছিলাম, তিনি আমাকে যেন কি বলিতেছেন।

এই পর্যন্ত বলিতেই আনোয়ারার রক্তিমাভ মুখমণ্ডল তাহার সুখতরঙ্গায়িত হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। নুরল এসলাম পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, "যুবক তোমাকে কি বলিয়াছিলেন ?" আনোয়ারা বিলোল কটাক্ষে কহিলো, "অত দিনের কথা মনে নাই ।"

নুরল। আমি বলিতে পারি।

আনো। বল দেখি ?

নুরল। যুবক বলিয়াছিলেন,—

প্রেমময়ী প্রেমের ছলে,
রেখো দাসে চরণ তলে।

আনোয়ারা আসন হইতে উঠিয়া নুরল এসলামের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'তোমার পায়ে পড়ি, অমন মনগড়া কথা বলিলে আমি আর তোমাকে কোন কথাই বলিব না।' নুরল স্ত্রীকে বাহুবাশে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা আমি আর কিছু বলিব না। তোমার মনগড়া স্বপ্নের কথাই শুনা যাউক !'

আনো। আমার মাথার কছম, মনগড়া কথা নয়, এমন সফল স্বপ্ন কেহ কখন দেখে না। সেইদিন রূপার খাটের কথায় স্বপ্নের কথা মনে হওয়ায় খেয়াল করিয়া দেখিতেছি, স্বপ্ন আমার ষোল আনা রকমে ফলিয়াছে।

নুরল। এত বড় স্বপ্নের কথা এত দিন আমাকে বল নাই কেন?

আনো। তোমার ঐকদম শরিফের গুণে উহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

নুরল। (হাসিয়া) আমি ত' তোমার স্বপ্ন সফলতার কিছুই দেখিতেছি না।

আনো। আরও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব?

নুরল। তাহাই হউক।

আনোয়ারা। তবে শুন। যে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার পরদিন ভোরবেলাতে খিড়কীর দ্বারে ওজু করিতে যাইয়া সত্যই নৌকার উপর কোর-আন পাঠ ও মোনাজাত শুনিলাম; তারপর দেখিলাম সত্যই সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবক পেট কাটা ছৈ-এর মধ্যে দাঁড়াইয়া বেগানা কুলবালার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া আনোয়ারা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লগিল।

নুরল এসলাম মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তারপর?"

আনো। কিছুদিন পরে বাবাজান দুর্গন্ধিকুপে নিক্ষেপের ন্যায় নীচবংশে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিবাহের লগ্নদিনে সত্যই ঝড়-তুফান হইল, বাজ পড়িয়া আমাদের গোশালায় আগুণ লাগিল। স্বপ্নের শেষ ফল এই দেখ, রূপার খাটে বসিয়া সোনার আল্‌নায় চুল শুকাইতেছি, আর সেই দু—"

নুরল। (হাসিয়া) আচ্ছা, নৌকার উপরে সেই দুষ্ট যুবককে দেখিয়া সেই সাধ্বী কুলবালার মনে কিছু উদয় হইয়াছিল না?

আনো। (স্মিতমুখে) কি আর মনে হইবে? দেখিয়া তাজ্জব হইয়াছিল।

নুরল। আর কিছু নয়?

আনোয়ারা ফাঁপরে পড়িয়া স্বামীর মুখে প্রেম-তীব্র কটাক্ষ হানিল।

নুরল। সত্য কথা না বলিলে ছাড়িব না। মেয়ে লোকে পুরুষের দোষই বেশী দেখে।

আনোয়ারা চুল গোছাইয়া পলায়নে উদ্যত হইল; নুরল খা করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

আনো। ছাড়—সই আড়ি পাতিয়া দেখিবে!

নুরল। তিনি ওজিফা পড়িতেছেন।

আনো। খোকা আসিবে।

নুরল। সে মরিয়মকে (উকিল সাহেবের কন্যার নাম)সঙ্গে করিয়া বাগানে খেলা করিতেছে।

আনো। উভয়ের ভাব দেখিয়া সই আমাকে এক-কথা বলিয়াছে।

নুরল। এ-কথা সেকথা থাক; মনের কথাটি আগে হোক।

আনো। আচ্ছা, চোখে দেখা আর ভাবা কি এক?

নুরল। সে বিচার পরে হইবে।

আনো। তুমি ত' বলিয়াছিলে আমার একটি কথা স্মরণ হইতেছে।

নুরল। তাই আগে শুনিতে চাও?

আনো। হাঁ।

নুরল। তুমি ফিরাণীতে মধুপুরে গিয়া একমাস নফল রোজা করিয়াছিলে কেন?

আনোয়ারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নুরল। হাসিতেছ কেন?

আনো। তুমি নজুম হইলে কবে?

নুরল। নজুম হইলাম কেমন করিয়া?

আনো। পেটের কথা টানিয়া বাহির করিতে জান।

নুরল। কোন কথা?

আনো। যে কথা এতক্ষণ চাপিয়া আসিতেছিলাম, তোমার প্রশ্নের উত্তরেই তাহা বলিতে হইতেছ।

নুরল। বেশ, তবে বল।

আনো। আচ্ছা, তবে শুন,—সেই প্রথম দিন তোমাকে নৌকার উপরে দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশকালে অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের সহিত বলিয়াছিলাম,—মা, তোমার কথা যেন সত্যে পরিণত হয়। আমি একমাস নফল রোজা করিব। ফল লাভ করিয়া ফিরাণীতে মধুপুর গিয়া সেই মানত শোধ করিয়াছি।

নুরল। (মৃদুহাস্যে) কি ফল লাভ করিয়াছিলে?

আনোয়ারা প্রেমকোপে চোখ রাঙাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

নুরল। আচ্ছা, মা তোমাকে কি কথা বলিয়াছিলেন?

আনো। মা বলিয়াছিলেন, শেষ রাত্রির স্বপ্ন বিফল হয় না। আমি শেষ রাত্রে ঐ খোয়াব দেখিয়াছিলাম।

সুরল। আর একটি কথা, তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া সেদিন অত কাতর হইয়া-ছিলে কেন ?

আনো। কেন যে কাতর হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না—তবে সেদিন মায়ের (বিমাতার) অকারণ তিরস্কারে মন যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই তিরস্কারের দারুণ যাতনায়, ঘৃণা আসিয়া ব্যথিত করিল, রাত্রিতে অনাহারে থাকিলাম এবং শেষ রাত্রিতে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। ভোরে আবার তোমার উজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিয়া স্বপ্ন সফলতায় মনের আনন্দের সঞ্চার হইল ; কিন্তু পরক্ষণে আবার সই-এর মুখে চোরের ঘরে বিবাহের সংবাদ পাইয়া, সংসার আমার পক্ষে জ্বলন্ত শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিল। মন আবার নিরাশা সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। দুঃখে, হতাশায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ফলে, এরূপ হর্ষ-বিষাদের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে মনের যে শোচনীয় অবস্থা হইল, তুমি সে সময় চিকিৎসা না করিলে, ঐ অবস্থায়ই আমার মৃত্যু ঘটিত। অতএব, আমি যে কেন কাতর হইয়াছিলাম তাহা মনে ভাবিয়া দেখ।

সুরল। তাহা ত' দেখিয়াছি ; কিন্তু লক্ষ টাকার জান বাঁচাইয়া তাহার পুরস্কার ত' পাই নাই।

আনো। কেন ? যাহা যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছ, তাহা সমস্তই তোমাকে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুরল। সে ত মূলধন ; কিছু উপরি লাভ কই ?

আনোয়ারা কি যেন মনে করিয়া "আজ দিব" বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

"তবে এখনই দাও" বলিয়া সুরল সোৎসাহে মস্তক অবনত করিলেন ; আনোয়ারা বিদ্যুদ্বেগে নিজ উত্তোলন করিয়া "তবে এই নাও" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সাদরে স্বামীর মুখ-চুম্বন করিয়া মধুরে উপরি লাভ প্রদান করিল।